গুরু-প্রদীপ

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী
প্রণীত

সৌম্যানন্দ নাথ সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ ডি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পূজ্যপাদ পরমহংস স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজ ।

সূচীপত্র।

প্রথম উল্লাস।

দীক্ষা—১ হইতে ২৯।

দ্বিতীয় উল্লাস।

সাধারণ অভিষেক ক্রিয়া ও তাহার বিধান ২৯ হইতে ৮৬

তৃতীয় উল্লাস।

ক্রমদিক্ষাভিষেক—৮৬ হইতে ১৩১

চতুর্থ উল্লাস।

সাম্রাজ্য দীক্ষাভিষেক—১৩১ হইতে ১৫২

পঞ্চম উল্লাস।

মহাসাম্রাজ্যাভিষেক—১৫৩ হইতে ১৬২।

ষষ্ঠ উল্লাস।

যোগদিক্ষাভিষেক—১৬২ হইতে ৩৫৭।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা,	পংক্তি,	অশুদ্ধ,	শুদ্ধ।
৪০	৪	সর্ব্বৌষধিজলে	সর্ব্বৌষধি * জলে

* (পাদটীকা) সর্ব্বৌষধী :—মুরা, জটামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, কুঙ্কুম বা জাফরাণ, শটী, চম্পক ও মুথা। মহৌষধী :—পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া, শ্যামালতা, ভৃঙ্গরাজ, শতাবরী, গুলঞ্চ ও সহদেবী।

শ্রীশ্রী৺তারা দেবী।

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্গুরবে নমঃ।

সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম উল্লাস।

দীক্ষা।

"গুরোশ্চ তাশ্চ মন্ত্রাশ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা।"

"গুরু ত্বমসি দেবেশি মন্ত্রোঽপি গুরুরুচ্যতে।

অতো মন্ত্রে গুরৌ দেবে নভেদশ্চ প্রজায়তে।"

গুরুপ্রদীপ বা (২য় খণ্ড) তন্ত্র-রহস্য প্রচারের আদেশ ও প্রয়োজন ঃ—

সাধনপ্রদীপ বা (সনাতন সাধনতত্ত্ব) তন্ত্র-রহস্যের প্রথম খণ্ডের মধ্যে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে তন্ত্র, তাহার আবশ্যকতা এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, এই সকল বিষয় পাঁচটী বিভিন্ন স্তবকে বিবৃত হইয়াছে। সনাতন-ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা হইতে প্রকৃত সাধনার জটিল প্রাথমিক স্তর বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বোধ হয় সাধনাকাঙ্ক্ষী পাঠকের স্মরণ আছে যে, "ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং" এই প্রসিদ্ধ শিব-বাক্যটী যে সেই অনাদি ও অনন্ত নির্গুণ শাশ্বত শিব পরব্রহ্মের তুরীয়-শক্তির অব্যবহিত পরবর্ত্তী অবস্থাজ্ঞাপক, এবং সেই শক্তিত্রয় যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি

ও জ্ঞানশক্তি-রূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, তথা এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ সাধকশরীরে হৃদয়মধ্যে কমলাসনে বিরাজিতা, যদিও ব্রাহ্মণ্যভাবে গায়ত্রী বা প্রণবরূপে সেই ত্রি-শক্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী-স্বরূপা, তাহা তন্ত্র-রহস্যের প্রথমখণ্ডে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি সাধনা-পথে শিববাক্যে পুনরুক্ত হইয়াছে যে, "ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং" এই ত্রিধাশক্তি সাধনায় প্রত্যেক সাধককেই "আদৌ কালী ততস্তারা সুন্দরী তদনন্তরং" যথাবিধি সাধনা করিতে হয়। বাস্তবিক সেইরূপ সাধনা ব্যতীত সাধনার উচ্চ সোপানোপরি উন্নীত হইবার উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে সেই ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ হইয়াছে। সেই আদ্যা কালিকাশক্তির আদি-রহস্য যাহা কিয়ৎ পরিমাণে তাহাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধনাকাঙ্ক্ষীর ইচ্ছাশক্তি অঙ্কুরিত হইয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার পরবর্ত্তী গভীরতর তন্ত্র-রহস্য জানিবার ও প্রকৃত ক্রিয়া পাইবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়াছেন। এই হেতু গুরুপরম্পরাদিষ্ট প্রথম খণ্ড তন্ত্র-রহস্য এক্ষণে ইচ্ছাতন্ত্র বা 'সাধনপ্রদীপ' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় খণ্ড তন্ত্ররহস্যে পূজ্যপাদ গুরুমণ্ডলীর আদেশক্রমে সেই কথাই লিপিবদ্ধ হইতেছে, তবে ইহার অন্তর্গত আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই সেই অদ্বৈতভাবে উপনীত হইবার বা সেই ভাবের উপলব্ধির জন্য দ্বৈতভাবের অবতারণা করা হইতেছে। নিগমাগম বা দ্বৈতাদ্বৈত এই ভাবচক্রের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা না থাকিলেও, বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে ভাবাতীত হইতে না পারিলে, তাহা সাধারণ সাধকের সম্পূর্ণই অনহুভবনীয় থাকিবে। অতএব সেই অদ্বৈত-

সিদ্ধির জন্যও সর্ব্বপ্রথমে দ্বৈত-সাধনার অবতারণা করিতে হইবে।

আদি ব্রহ্মানন্দদেব ও শঙ্করাচার্য্য সম্মিলনঃ—মহাকৌল প্রচ্ছন্নাবধূত শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যদেব, * যিনি বেদান্ত-দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মীমাংসায় বিশ্ববিজয়ী ও অদ্বৈতভাবের সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, যিনি গিরিরাজ হিমাচল হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধমতকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও তাহার মূলোৎপাটন বা এককালীন বিলয় সাধনোদ্দেশ্যে, ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে বিজয়পতাকা-স্বরূপ তাঁহার নিজ আসন ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন; তিনি যখন উত্তর-পশ্চিম

* আদিগুরু বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেবের শিষ্যপরম্পরায় (১৩৯ পর্য্যায়ের) মঠাধীশ শ্রীমৎ বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী মহারাজ পরম গুরুদেবের নিকট মঠের একখানি প্রাচীন গুরুপত্রিকায় দেখা গিয়াছে যে, "ভগবান শঙ্করাচার্য্যদেব ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমীতে জন্মগ্রহণ করেন। (৬০০ কলের্গতাব্দে অর্থাৎ কলির ছয়শত বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হয়। এক্ষণে কলির ৫০২৭ গতাব্দ = ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ। কল্যাব্দ ৫০২৭ হইতে ৬০০ বৎসর বাদ দিলে এক্ষণে ৪৪২৭ যুধিষ্ঠিরাব্দ হয়। এই যুধিষ্ঠিরাব্দ ৪৪২৭ হইতে উক্ত ২৬৩১ বৎসর বাদ দিলে ১৭৯৬ বৎসর হয়। এক্ষণে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৬ বৎসর বাদ দিলে ১৩০ খৃষ্টাব্দ হয়। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দ ও ১৩০ খৃষ্টাব্দ সমবর্ষ।) সুতরাং ভগবান শঙ্করাচার্য্যদেব ১৩০ খৃষ্টাব্দেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৬৩৬ চৈত্রী শুক্লানবমীতে তাঁহার উপনয়ন হয়। ২৬৩৯ অব্দে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন এবং ২৬৪০ অব্দে শ্রীমদ্ গোবিন্দপাদাচার্য্যের নিকট ব্রহ্মোপদেশ দীক্ষা গ্রহণ করেন। ২৬৪৬ অব্দে শারীরক ভাষ্য প্রণয়ন ও জ্যোতির্ম্মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৬৪৭ অব্দে বারাণসীতে ষোড়শ বৎসর বয়সে বারাণসী ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করেন। এই সময় পবিত্র জ্ঞানব্যাপীর

আর্য্যাবর্ত্ত হইয়া তন্ত্রের এই আদিম স্থান বঙ্গভূমি অতিক্রম করত দাক্ষিণাত্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় সেই পরাপর পরমগুরু, তদানীন্তন সাধনমার্গের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা আদি ব্রহ্মানন্দদেবের আনন্দমঠদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত অদ্বৈতমতের বিচার-প্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান হইলেন ও বলিলেন,—"মহাত্মন্! আমি আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চম প্রদেশে অদ্বৈত-মতের বিচারে বিজয়লাভ করিয়াছি, এক্ষণে দাক্ষিণাত্যে যাইবার ইচ্ছা, মধ্যে আপনার বিশ্ববিশ্রুত নাম অবগত হইয়া আপনার সহিতও বিচার করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়াছি।"

পরমযোগী অতিবৃদ্ধ ঠাকুর ব্রহ্মানন্দদেব, যোগবলে পূর্ব্ব হইতেই তাহা অবগত ছিলেন, তথাপি সস্নেহে বলিলেন—"বৎস! তুমি কোন্ বিষয়ে বিচারাভিলাষী হইয়াছ?" শঙ্করাচার্য্যপ্রভু, একটু গর্ব্বাভিমানিত আস্যে বলিলেন,—"অদ্বৈতবাদ।" তখন সেই মহাপূর্ণজ্ঞানী শিবস্বরূপ পরমহংসদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বৎস, তোমার যথার্থ অদ্বৈতবাদ-

নিকট অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভগবান ব্রহ্মমহর্ষি ব্যাসদেবের সহিত তাঁহার বেদান্তালোচনা ও আশীর্ব্বাদ লাভ হয়। ২৬৪৭ অব্দে মণ্ডনসহ শাস্ত্রবাদ ও বিচার। ২৬৪৮ অব্দে প্রথমে দ্বারকায় সারদামঠ ও পরে দক্ষিণে শৃঙ্গেরীমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৬৪৯ অব্দে সুধন্বা রাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ। ২৬৫০ হইতে দিগ্বিজয় করিতে আরম্ভ করেন। ২৬৫৩ অব্দে গঙ্গাসাগর সঙ্গম সমীপে বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তদীয় উপদেশ গ্রহণ। ২৬৫৪ অব্দে পুরী পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২৬৬৩ অব্দে তিনি মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সেই কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে অন্তিম কৈলাস যাত্রা করেন। এই বৎসরে এই পবিত্র দিবসেই তদীয় শিষ্য রাজা সুধন্বা সার্ব্বভৌম পূজ্যপাদ জগদ্গুরুর অন্তর্দ্ধানের সহিত তাম্র তাম্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

জ্ঞানলাভের এখনও যে, অনেক বিলম্ব আছে! প্রকৃত অদ্বৈত-ভাবের ভাবুক হইতে পারিলে, তোমারও আমার মধ্যে এ মিথ্যা দ্বৈতজ্ঞান ত আর থাকিবে না, বাবা! তখন তোমাকে বিচার-প্রার্থীরূপে অন্যব্যক্তি জ্ঞানে আর কাহারই সম্মুখীন হইতে হইবে না, তখন তোমাতে আমাতে, সর্ব্বভূতে, চরাচর সকল বস্তুর মধ্যে সেই অদ্বৈতব্রহ্মলীলা সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দে ব্রহ্মরসে অভিভূত হইয়া যাইবে!"

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যদেব এই ইঙ্গিতমাত্র কয়েকটী কথা শুনিয়াই যেন সহসা অবাক্ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার জ্ঞানগর্ব্বিত মস্তক অবনত হইল, তিনি তাঁহারই পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার বিবিধ প্রত্যক্ষ উপদেশ গ্রহণ করিয়া পুরী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে অকপট-হৃদয়ে বলিয়া যাইলেন, "প্রভো, বঙ্গে আর নূতন মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই পবিত্র আদি 'আনন্দ-মঠের' অবমাননা করিব না। বঙ্গে সনাতন সাধনমার্গ-সংস্কারের কিছুই নাই, ঠাকুরের কৃপায় এখানে সমস্তই যেন নিত্যভাবে বিরাজিত রহিয়াছে; তবে আদেশ করুন প্রভো, বৌদ্ধ-আচারে-পরিপুষ্ট উৎকল প্রদেশান্তর্গত প্রধান স্থান পুণ্যতীর্থ পুরীধামে যাইয়া ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তীয় নূতন মঠ প্রতিষ্ঠা করি।" বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব, "তথাস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হরিহর মিলনের ন্যায় এক অভিনব দৈবীলীলার সংঘটন হইয়া গেল।*

অদ্বৈতবাদ চরম লক্ষ্য হইলেও দ্বৈতবাদরূপ গুরুকরণ সর্ব্বপ্রথম অবলম্বনীয়—যাহা হউক, অদ্বৈতবাদ সাধকের চরম

* 'জ্ঞানপ্রদীপ' (২য় ভাগে) ৭৮ পৃষ্ঠায় 'শ্রীমদ্ বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব' দেখ।

লক্ষ্য হইলেও, দ্বৈতবাদপথে, গুরু-শিষ্যমধ্যে, গুরুকরণ ও দীক্ষাভিষেকই আমাদের প্রধান অবলম্বনীয়। জগদম্বার পুত্ররূপে মাতৃসাধনায় উপাস্য-উপাসক মধ্যে এইরূপ প্রত্যক্ষ দ্বৈতবাদের অবতারণা ব্যতীত অন্য উপায় আর নাই।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের তুল্য মহাপুরুষ জগতে নিতান্তই বিরল, তাই তিনি শঙ্করাবতাররূপে জগদ্‌গুরুর সুপবিত্র আসনে চিরদিন সমাসীন রহিয়াছেন। তিনিও গুরুকরণের বিরোধী ছিলেন না। তিনি স্বীয় আসন, 'গুরুর আসন' বলিয়াই স্থির করিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতমতের সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠাতা হইয়াও পরম পূজ্যপাদ আচার্য্য গোবিন্দপাদও মহাকৌল শিবস্বরূপ বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

এক সময় মণিকর্ণিকার পার্শ্বে কাশীর মহাশ্মশানমধ্যে চারিটী সারমেয়-পরিবৃত জনৈক চণ্ডালকে স্পর্শ করিয়া শঙ্করাচার্য্যদেব চণ্ডাল-স্পর্শহেতু আপনাকে অশুচি মনে করিয়াছিলেন, তখন সেই চণ্ডালরূপী স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের কৃপায় যথাবিধি দীক্ষোপদেশ ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আবার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানেই নিস্তার নাই। কঠোর ব্রহ্মবাদী, কিন্তু তখনও ব্রহ্ম-শক্তিজ্ঞানকৃশ শঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভু একদা বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়া মণিকর্ণিকা-গঙ্গাতটে শয়িত—উত্থানশক্তি রহিত—পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ—প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে, এইরূপ মৃত্যু-যাতনা অনুভব করিতেছেন—মুখে একবিন্দু বারি দিবারও কেহ নিকটে নাই, এমন সময় একটী বৃদ্ধাকে জলপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে ঘাটে উঠিতে

দেখিয়া, শঙ্করাচার্য্যদেব বলিলেন, "মা, পিপাসায় আমার প্রাণ যায়, একটু জল দাও।" বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা, এ জল যে আমি আমার স্বামীর জন্য লইয়া যাইতেছি, ইহা ত দিতে পারিব না! আর তুমি ত গঙ্গার এমন কিনারায় শুইয়া রহিয়াছ যে, একটু পাশ ফিরিলেই যত ইচ্ছা জলপান করিতে পার!" শঙ্করাচার্য্য তখন আরও কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আমার পাশ ফিরিবার মত শক্তিও যে নাই মা!" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আনন্দোদ্ভাসিত বদনে বলিলেন, "বাপ্ শঙ্কর, তুই যে 'শক্তি' মানিস্ না!" বৃদ্ধার এই স্নেহ-কোমল তিরস্কার শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যদেবের চমক ভাঙ্গিল, মুহূর্ত্তে তাঁহার দিব্যজ্ঞান বিকশিত হইল, তিনি করযোড়ে আনন্দোল্লাসে বলিলেন—"মা, এখন মানি।" এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার নয়ন, অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। ইত্যবসরে সেই বৃদ্ধাও কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন। কিন্তু তিনি সেই অশ্রুপূর্ণ-নয়ন নিমীলিত করিবামাত্র ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে জগজ্জননী মহামায়ার কি এক অপূর্ব্ব রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! তাঁহার চিত্ত অসীম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মুখে "আনন্দলহরী" মহাস্তোত্র অনর্গল উচ্চারিত হইতে লাগিল! এ সকল কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু এইরূপ অসাধারণ ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন পুরুষ কয়জনই বা জন্মগ্রহণ করেন, বা কত লক্ষ লক্ষ জন্মের সাধনায় এমন কয়জন সাধক সিদ্ধি লাভ করিয়া শিবত্বলাভ করিতে পারেন? যখন শঙ্কর ও তাঁহার সমকক্ষ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী সকল সিদ্ধ-পুরুষই গুরূপদেশ ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারেন নাই—যখন সেই অদ্বৈতবাদসিদ্ধি ও নির্ব্বিকল্প সমাধির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত,

সাধ্য-সাধকের পার্থক্য বর্ত্তমান, তখন স্বতঃই যে চিত্ত সুস্পষ্ট দ্বৈতভাবে নিহিত রহিয়াছে! ফলতঃ বেদান্ত দর্শনের মধ্যে যে অদ্বৈত-তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তন্ত্রের ক্রিয়াসিদ্ধাংশরূপ দ্বৈত-তত্ত্বের মধ্য দিয়া তাহারই অতি সুন্দর সমন্বয় দর্শন করিতে হইবে। বাস্তবিক 'দর্শন' অর্থে পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও কণ্ঠস্থকরণ নহে, 'দর্শন' অর্থে দর্শন করা বা দেখা, সাধনাদ্বারাই তাহা বা সেই অদ্বৈত বস্তুকে দেখিতে অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে হইবে। পূজ্যপাদ গুরুমণ্ডলীও জগদম্বার কৃপায় তন্ত্ররহস্যের তৃতীয় খণ্ডে 'জ্ঞানপ্রদীপে' পরস্পর ঘোর অনৈক্য বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন ষড়্দর্শন বা সপ্তদর্শনের* মধ্যে যে কি অদ্ভুত সমতা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র সাধনার অভাবে শুধু দ্বৈতাদ্বৈতের মহাসমরে পড়িয়া কত মহাত্মাও যে নিত্য কিরূপ সাধনবিধ্বস্ত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিগমাগমে সাক্ষাৎ শিবশক্তি এই মহা সংশয়জাল অতি সুন্দর ও সরলভাবে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা কেবলই তর্কপরায়ণ ও একদেশদর্শী অথবা যাঁহারা মাত্র আদর্শই লক্ষ্য করিতেছেন, কিন্তু তাহার সমীপবর্ত্তী হইবার পথের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, তাঁহারাই অদ্বৈতবাদ-সিদ্ধির পথে দ্বৈতবাদরূপ ভ্রান্ত কণ্টকরাশি আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু জগদম্বার কৃপায়

* প্রাচীনকালে আর্য্য-দর্শনশাস্ত্র সপ্তভাগে বিভক্ত ছিল, পরবর্ত্তী সময়ে মহা-মহোপাধ্যায় জৈনাচার্য্যগণ তাহা হইতে ষড়্দর্শন নাম দিয়া নূতনভাবে জৈন-দর্শন-ষট্‌কের অভিনব ভাষ্য প্রচার করেন। বিজ্ঞান-ভিক্ষু প্রভৃতির বিরচিত সাংখ্যভাষ্য তাহারই পরিচয় স্থল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'জ্ঞানপ্রদীপে' প্রদত্ত হইয়াছে।

যাঁহাদের সেই সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা দর্শনের সেই বিশ্ব-বিস্ফারিত নয়ন, মণিকর্ণিকার ঘাটে রোগ-শয্যায় শয়িত শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় নিমীলিত করিয়া সেই অদ্বৈত শক্তিতত্ত্বের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হন—ছায়ার অনুবর্ত্তী হইয়াই আলোকের সমীপ-বর্ত্তী হইতে থাকেন, অথবা ধ্বনি ধরিয়াই ঘণ্টা বা বংশীবাদ-কের সম্মুখে উপস্থিত হন। সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মূলাধার গুরুকরণ ও প্রাথমিক-দীক্ষা-গ্রহণ সহযোগে প্রত্যেক সাধককেই সাধনপথে সেই অদ্বৈত সিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। এই দীক্ষাই সেই সাধনক্রিয়াশক্তির সর্ব্বপ্রধান আধার বলিয়া গুরুপরম্পরায় পরিজ্ঞাত। ইচ্ছাশক্তিতে যাহা বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধারূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে ক্রিয়াশক্তির মধ্য দিয়া প্রকৃত মাতৃরূপা ব্রহ্মশক্তির উৎকট সাধনায় নিয়োজিত করত পরবর্ত্তী জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন কার্য্যে সহায়তা করিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই দীক্ষাক্রিয়া হইতেই ক্রিয়াশক্তির প্রথম সূত্রপাত হয়। এক্ষণে সেই দীক্ষা কি, এবং কিরূপ বিধানে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, গুরুমণ্ডলীর আদেশ-ক্রমে তাহাই যথাক্রমে বর্ণনা করিব।

অধুনা বিবিধ সুলভ শাস্ত্র-গ্রন্থাদির যেরূপ বহুল প্রচার হইতেছে, তাহাতে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ অনায়াসে সেই সকল পাঠ করিয়া বহু শাস্ত্রকথা অবগত হইতেছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইতে প্রকৃত সাধন-তত্ত্ব বা তাহার রহস্য উপলব্ধি করিবার কোনও উপায় নাই, ইহাই পরিতাপের বিষয়! তন্ত্র-রহস্যের প্রথম খণ্ডে সে সকল কথা বলা হইয়াছে। যাহা হউক, উক্ত সুলভ শাস্ত্রপাঠে কাহারও কাহারও ধারণা হইয়াছে যে, পূজা,

অর্চ্চনা, জপ ও অভিষেকাদি সকল কথাই ত শাস্ত্রে অতি বিষদ ভাবে লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই সমস্ত সম্পন্ন করা যাইতে পারে, সুতরাং দীক্ষার আর আবশ্যকতা কি? ইহার জন্য অন্যের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের হীনতা প্রদর্শন করিয়াই বা লাভ কি? প্রকৃত কথা! এমন না হইলে কলির পূর্ণ-প্রভাব প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? ইহাই ত কলিযুগের স্বভাবসিদ্ধ ভাব! শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মশক্তিতত্ত্ববিষয়ক সাধনক্রিয়া জানিতে হইলে, শ্রীগুরুদেবের চরণ প্রান্তে প্রণিপাত ছলে নিজের জ্ঞান-গর্ব্ব-অভিমান বা আত্মপ্রাধান্য, নিজের অজ্ঞানতাপুষ্ট বুদ্ধি ও বিচারশক্তি সমুদায় ত্যাগ করিয়া তাঁহাতে আত্মনিবেদন কর, নিজের ভাবিবার জন্য আর কিছু না রাখিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় রত হও, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার অবসর মত তোমার সাধনানুকূল কর্ত্তব্য ও মনের সন্দেহ সমুদায় শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া লও। তাহা হইলেই সেই তত্ত্বদর্শী ক্রিয়াবান মহাপুরুষ তোমাকে যথার্থ সাধনোপদেশ প্রদান করিবেন।* ত্রিকালদর্শী মহাকাল, মুক্তিকামার্থী সাধকের সাধনার্থ আগমে খুলিয়া বলিয়াছেন:—

"অদীক্ষিতা! যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্ত বীজবৎ॥"

হে প্রিয়ে যে ব্যক্তি গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া

* 'গীতাপ্রদীপে' (ভক্তিতত্ত্ব) দেখ।

নিজেই জপ, পূজাদি সাধনক্রিয়া করে, তাহার সেই সকল কর্ম্ম পাষাণোপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফলা হইয়া থাকে।

অন্যত্র নবরত্নেশ্বরে লিখিত আছে :—

"কল্পেদৃষ্ট্বাতু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্নাতি নরাধমঃ।
মন্বন্তর সহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে॥
নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়ম ব্রতৈঃ।
ন তীর্থগমনেনাপি নচ শরীর যন্ত্রণৈঃ॥"

যে ব্যক্তি দীক্ষিত না হইয়া কল্পগ্রন্থে মন্ত্রদর্শনপূর্ব্বক গ্রহণ করে, সেই নরাধম ব্যক্তি সহস্র মন্বন্তর অতীত হইলেও সংসার-যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সেই অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত ও তীর্থদর্শনাদি শারীরিক কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন ;—

"অদীক্ষিতানং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতং॥
তৎ কৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতিহ্যধোগতিং।
(অতঃ) সদ্‌গুরোর্বাহিতা দীক্ষা সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥"

অর্থাৎ হে বরাননে অদীক্ষিত মানবের দোষ কি তাহা শ্রবণ কর—তাহার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য এবং জল মূত্রসম জানিবে, তাহার কৃত শ্রাদ্ধ বা তৎপ্রতি অন্যকৃত শ্রাদ্ধ অধঃকৃত হয়। অতএব সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াই সকল কর্ম্ম করা অর্থাৎ সাধন ভজন করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা গুরুকরণ বা দীক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন, অথচ সাধনার সকল বিধিনিয়মে যাঁহাদের অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের বিচার ও বিবেচনা করা আবশ্যক যে, বিধি-বিষ্ণু-

শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রের কোন একটী বিধান মানিতে হইলে, তাহার আমস্ত সকল বিধানই মান্য করা বিধেয়। মন্ত্র, জপ ও পূজার্চ্চ-নাদি যে শাস্ত্রের আদেশ, গুরুকরণ ও দীক্ষাগ্রহণও যে সেই শাস্ত্রেরই বিধান! সুতরাং মূলটীকে ত্যাগ করিয়া নিজ সুবিধা ও মনোমত-শাস্ত্রের শাখাপ্রশাখামাত্র গ্রহণ করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অনেকের শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র-জপাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলেও কেবলমাত্র আত্ম-প্রাধান্য বুদ্ধির দোষেই অন্যের নিকট হীনতা স্বীকার পূর্ব্বক শিষ্যত্ব বা দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন না। যাঁহাদের মূলেই এত অভিমান, তাঁহারা বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত হইলেও সামান্য নিরক্ষর সাধকের পদরেণু হইবারও যোগ্য নহেন। বাস্তবিক নত হওয়াই সিদ্ধিলাভের প্রধান সোপান। ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, সিদ্ধ হইলে কি হয়?" শ্রীনাথ গুরুদেব স্নেহ-তিরস্কার স্বরে বলিলেন "দূর ব্যাটা, তাও জানিস না? সিদ্ধ হ'লে নরম হয় রে নরম হয়! চাল সিদ্ধ ভাত একটা টীপে দেখনা!" সিদ্ধ হইলে ত নরম হইবেই, সিদ্ধ হইবার জন্যও ক্রমে নরম বা নত হইতে হয়। সুতরাং প্রথমেই নিজের হীনতা ও দীনতা শিক্ষার জন্যও শিষ্যকে গুরুর নিকট প্রপন্ন বা শরণাগত হইয়া তাহার দীক্ষার আবশ্যকতা আছে। অর্জ্জুন তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অতি কাতর হইয়া বলিতেছেন— "শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" ইত্যাদি অর্থাৎ ভগবন, আমি আপনার শিষ্য সুতরাং শাসনীয় বা শাসনযোগ্য ও আপনার প্রপন্ন বা আপনার শরণাগত ও একান্ত আশ্রিত হইলাম, আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। ব্রহ্মচর্য্য হইতে দণ্ডী, সন্ন্যাসী পরমহংস পর্য্যন্ত ক্রমোন্নত সকল আশ্রমের পক্ষেই যথাযথ দীক্ষা

প্রয়োজন। দীক্ষায় জীবের দিব্যজ্ঞানলাভের সামর্থ্য আইসে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পাপ ক্ষয় হয়। সেই কারণে শাস্ত্রে এই অনুষ্ঠান "দীক্ষা" বলিয়া খ্যাত। লঘুকল্পসূত্রে সূত্রাকারে তাই বলিয়াছেন ;—

"দীয়তে পরমং জ্ঞানং ক্ষীয়তে পাপ পদ্ধতিং।
তেন দীক্ষোচ্যতে মন্ত্রেস্বাগমার্থং বলবলাৎ ॥"

যোগিনীতন্ত্রে উক্ত আছে ;—

"দীয়তে জ্ঞান মত্যর্থং ক্ষীয়তে পাপবন্ধনং।
অতো দীক্ষেতি দেবেশি কথিতা তত্ত্ব চিন্তকৈঃ ॥"

এইভাবে বিশ্বসার তন্ত্রেও দীক্ষা শব্দের উদ্দেশ্য ও ব্যুৎপত্তি বর্ণিত আছে ;—

"দিব্য জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং যতঃ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সাপ্রোক্তা সর্ব্ব মন্ত্রস্য সম্মতা ॥"

দিব্য জ্ঞানোপদেশসহ শিষ্যের জ্ঞাতাজ্ঞাত সকল পাপের ক্ষয় বিধান করাই 'দীক্ষা' শব্দের তাৎপর্য্য।

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যথোক্ত ফল না পাইবার কারণ—শিববাক্য নিষ্ফল হইবার নহে, তবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও যথোক্ত ফল না পাইবার দুইটী কারণ আছে। একটী যথাশাস্ত্র গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই অভাব—দ্বিতীয়টী সকলেরই সমান অন্নচিন্তা ও আলস্য! মূলেই যখন এমন বিষম দুইটী অভাব বা গলদ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন সহসা শাস্ত্রাদিষ্ট সম্পূর্ণ ফলের আশা করা সম্ভবপর হইতে পারে কি? সাধনাকাঙ্ক্ষী অধিকাংশ ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন—"সদ্গুরু না পাইলে কাহার নিকট হইতে মন্ত্র লইব?" যথার্থ

কথা, শিষ্যের ইহা ভাবিবার বিষয় বটে! গুরু কৈ? "সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ। কয়লা কি ময়লা ছোড়ে যব আগ করে পরবেশ," এই ত কৃতকর্ম্মা সাধকের কথা—যথার্থই সদ্‌গুরুর সিদ্ধ উপদেশ ব্যতীত শিষ্যের সেই পাপমলিন অপবিত্র হৃদয় আর কোনরূপেই পবিত্র বা পরিশুদ্ধ হইতে পারে না। অনেকেই এই চিন্তায় যেন পাগল, মর্ম্মাহত—বোধ হয় তাঁহারা যাজ্ঞবল্ক্য বা বশিষ্ঠসম গুরু কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু রাজর্ষি জনক বা শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় শিষ্যের তুলনায় তাঁহারাই বা কতদূর উপযুক্ত, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর হয় ত, তাঁহাদের নাই। অধুনা সংসারে যেমন বিজ্ঞ গুরুর সংখ্যা অতি বিরল, সেই অনুপাতে উপযুক্ত শিষ্যও বোধ হয় জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ নহি মিলে এক।" বস্তুতঃ একাগ্র ভাবে গুরু অন্বেষণ করিলে অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সাধনাকাঙ্ক্ষী দৃঢ়ব্রত শিষ্য আদৌ মেলাই দুর্ঘট। শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা—পরিশ্রম করিব না, সাধন ভজন কিছুই করিব না, গুরুর কৃপায় ঝাঁ ঝাঁ করিয়া গোটাকতক অধিকার লইব, আর দু দিনের মধ্যে কৃষ্ণ বিষ্ণু যাহা হয় একটা হইয়া বসিব, একটা বড় রকম সিদ্ধি হস্তগত করিয়া লইব—কেবল প্রাণভরা সাধ, বিনা আয়াসে অলৌকিক সাধনবিভূতি লাভ করিয়া লোকসমাজে একটা ভক্ত বা ক্রিয়াবান সাধক বলিয়া পরিচিত হইব, সকলের সেবা ও পূজা পাইব, আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা শিষ্য 'চেলাচামুণ্ডা' তৈয়ার করিব! এতদ্ব্যতীত আর একটা কথা—নিজে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই যেন ঠিক, তাহাই যেন অভ্রান্ত, প্রকৃত সাধনরত উন্নত অন্য যে

কোন ব্যক্তির কোন কথা বা উপদেশ শুনিব না, তাহাতে বিশ্বাসও করিব না। সকল কথাই ঐ ইংরাজী 'লজিকের' বাঁধা তর্কের তুফানে ফেলিয়া ভাসাইয়া দিব। কোন তত্ত্বই আলোচনা করিব না, আলোচনার অভিনয়ে কেবল আত্মসমর্থন জন্য বৃথা তর্ক-বিতণ্ডায় সমস্তই পর্য্যবসিত করিব। এইভাবে গুরুর সহিতও যেন তাহাদের ক্রমাগত একটা 'পাইতারা' চলিতে থাকে—গুরুকে কেবল পরীক্ষা করিবার জন্যই চিত্ত যেন সতত ব্যাকুল; যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহা যেন ফাঁকি দিয়াই তাঁহার নিকট হইতে উড়াইয়া লইব। মোটের উপর শিষ্যের আদৌ একাগ্রতা নাই। উপযুক্ত গুরুর অভাব সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তন্ত্ররহস্যের প্রথম খণ্ডে তাহা বলা হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক তন্ত্রোপদেষ্টা সাধনপরায়ণ কুলগুরু বর্ত্তমান থাকিলে, তিনি সিদ্ধ না হইলেও তাঁহার আদেশ বা তাঁহার নিকট হইতে সাধারণ দীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার অভাবে বা উন্নতির আশায় নিজের উপযুক্ততা অনুভব করিয়া যে কোনও নিষ্ঠাবান সদাচারসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত উন্নত—সাধকের নিকট হইতেই উচ্চ অধিকারের দীক্ষাগ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে সদ্‌গুরুরও কর্ত্তব্য যে, নিজ আশ্রিত শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানের পূর্ব্বে তাহার চরিত্র, তাহার আকাজ্ক্ষা ও উদ্দোশ্যাদি বুঝিবার জন্য অন্ততঃ একবৎসর কাল পরীক্ষা করিবেন; আবশ্যক বোধ করিলে অথবা যথাক্রমে হীনবর্ণজ শিষ্যের জন্য আরও অধিক-কাল পরীক্ষা করিবেন, কিন্তু একাগ্রচিত্ত দৃঢ় ভক্তিমান উপযুক্ত শিষ্য বিবেচিত হইলে, দিন কাল বিচার না করিয়াও দীক্ষা দিতে পারেন।

Uttarpara Jaykrishna Public Library

দীক্ষাগুরু ও ক্রিয়াগুরু—নিজ কুলগুরু বা অন্য যে কোন গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত ব্যক্তি যে আর কাহারও নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লইতে পারিবে না, শাস্ত্রে এমন কিছু বিধি নিষেধ নাই, বরং আবশ্যক অনুসারে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বা উচ্চতম গুরুর নিকট যথাশাস্ত্র দীক্ষা ও অভিষেকাদি গ্রহণ করিবারই শাস্ত্রাদেশ আছে। পিচ্ছিলাতন্ত্রে স্বয়ং সদাশিব শঙ্কর তাই বলিয়াছেন—

"গুরুস্তু দ্বিবিধা প্রোক্ত দীক্ষা শিক্ষা প্রভেদতঃ।
আদৌ দীক্ষাগুরু প্রোক্তস্ততঃ শিক্ষাগুরুর্মতঃ॥"

দীক্ষা ও শিক্ষাভেদে শাস্ত্রোক্ত গুরু দ্বিবিধ কথিত হইতেছে: প্রথমে দীক্ষাগুরু, যিনি মন্ত্রের প্রাথমিক দীক্ষামাত্রই প্রদান করেন; পরে শিক্ষাগুরু, অর্থাৎ যাঁহার নিকট সাধনার অর্থাৎ সাধনতত্ত্ব, অভিষেক ও পুরশ্চরণাদি যোগপ্রক্রিয়া যথাক্রমে শিক্ষা করা যায়। বুদ্ধিমান সাধক অভাব ও আবশ্যক বিবেচনা করিলে, যথাক্রমে যে অষ্টাভিষেক ও সাধনরহস্যের জ্ঞানলাভার্থ অসংখ্য উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে কোনও অপরাধ হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে;—

"গুরুত্যাগাদ ভবেন্মৃত্যু- র্মন্ত্রত্যাগাদ্ দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ গুরুত্যাগ করিলে মৃত্যু এবং মন্ত্রত্যাগ করিলে দারিদ্র্য হয়, গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে রৌরব নামক নরক ভোগ করিতে হয়। এই শাস্ত্রবাণীর উপর নির্ভর করিয়াই স্বার্থপর ব্যবসায়ী গুরুদিগের প্ররোচনায় ধর্মভীরু গৃহস্থ সাধকদিগের মধ্যে ভীষণ আশঙ্কার উদ্ভব হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য বিষয়ে কুলাব-

ধৃত তন্ত্রাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ বলিয়াছেন, “যিনি শাক্তা-ভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষাভিষেক, সাম্রাজ্যাভিষেক, মহা-সাম্রাজ্যাভিষেক, যোগদীক্ষাভিষেক, পূর্ণদীক্ষাভিষেক বা মহা-পূর্ণাভিষেকের যে কোনও সংস্কারের অভিলাষী সাধক নিজ উপযুক্ত ও ক্রিয়াবান বা অভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় ব্যতীত অর্থাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল খেয়ালবশে অন্য কোন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তিনিই গুরু ও মন্ত্রত্যাগজনিত মহাপাতকে লিপ্ত হইবেন। অন্যথা বাস্তবিক গুরুদেব যদি সাধনাভিলাষী শিষ্যের অভিলষিত সংস্কার ও দীক্ষা প্রদানে অধিকারী না হন, তাহা হইলেই শিষ্য সেই সংস্কারে সংস্কৃত অন্য ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিতে পারিবেন তাহাতে, তাহার গুরুত্যাগ-জনিত দোষ হইবে না।

বাস্তবিক আজকাল ‘গুরুত্যাগ’, বিশেষ ‘কুলগুরুত্যাগ’ ব্যাপার লইয়া গৃহস্থদিগের মধ্যে যেরূপ ভয়ের কারণ হইয়াছে, তাহার সুমীমাংসা না জানিয়া অনেক ব্যক্তি আমরণ দীক্ষাই গ্রহণ করিতে সাহস করে না। কুলগুরু অর্থে যে, বংশপরম্পরার গুরু নহে, তাহা অনেক স্থলে অন্যান্য প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। ‘কুল’ অর্থে এক্ষেত্রে ‘বংশ’ নহে, ‘কুল’ অর্থে ‘ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি’। কুলদীক্ষা, কুলপদ্ধতি, কুলকুণ্ডলিনী, কৌল ও কুলীন আদি শব্দ একমাত্র ব্রহ্মশক্তির জ্ঞানের সম্বন্ধযুক্ত। অতএব কুলগুরু অর্থে বংশগত গুরু নহে, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মশক্তিজ্ঞানপুষ্ট গুরুদেবকেই বুঝায়। এক্ষণে শিষ্যের বিত্তলোভী গুরুর বিকৃত ব্যাখ্যায় সে অর্থ আর কেহই জানিতে বা বুঝিতে পারে না। যদি বংশ পরম্পরার নির্দ্দিষ্ট গুরু হওয়াই শাস্ত্রোপদেশ হইত, তাহা হইলে

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভু আদি গৌড়সমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুরু পদে বরেণ্য হইতে পারিতেন না, শঙ্করাচার্য্যদেব জগৎগুরুর সুপবিত্র আসনে অমর হইয়া বসিতে পারিতেন না, তাহা হইলে এই বঙ্গদেশে কনৌজ হইতে আনীত ব্রাহ্মণপঞ্চক সাধারণের গুরুস্থানীয় হইতে পারিতেন না, তাহা হইলে বিভিন্ন সময়ে সমাগত রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য, দাক্ষিণাত্য, উৎকল, গৌড় ও শ্রীহট্ট আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর গুরুশিষ্য সম্বন্ধ কিছুতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। ধর্ম্মপিপাসু মুমুক্ষুগণ কুলজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তি পাইলেই চিরকাল তাঁহার চরণতলে আশ্রয় লইবার জন্য শাস্ত্রবিধি অনুসারেই অবনত মস্তকে তাঁহাকে গুরুতে বরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাই ত 'গুরু-বরণ-কার্য্য' সম্বন্ধে শাস্ত্রে এত প্রশস্ত ব্যবস্থা। যাহা বংশানুগত তাহা আবার বরণ করিতে হয় কি? বংশপরম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত পুত্র কন্যা পিতা মাতা পিতৃব্য প্রভৃতির কে কবে বরণ করিয়া লয়? যাহা হউক কুলগুরু অর্থে যে বংশগত গুরু নহে, তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন গুরুকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তাহাই সনাতন শাস্ত্রাদেশ। সেকালে পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মকর্ম্মের নিয়মিত অনুষ্ঠান ও বিধি ব্যবস্থা ছিল সে কারণ কোন বংশে কোন শক্তিশালী কুলজ্ঞ পুরুষের উদ্ভব হইলে, তাহার পরেও কয়েক পুরুষ ব্যাপি তাঁহাদের নিষ্ঠা ও অনন্যসাধারণ সাধনানুষ্ঠান বিদ্যমান থাকিত, তাহাতেই অনেকে সেই বংশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া তখন মনে করিতেন। সুতরাং সহসা স্বতন্ত্র গুরুর অন্বেষণ করিবার আর প্রয়োজন হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে, এখন সেই সকল ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর বংশে

প্রায় সে সৎ-সাধনানুষ্ঠান নাই, সে ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভাব নাই, কেবল ব্যবসাদারী ভাবে কতকগুলা শব্দ কণ্ঠস্থ করা ব্যতীত তাহাদের মধ্যে আর কিছুই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব সাধকগণের এইরূপ অবস্থায় গুরুত্যাগজনিত কিছুমাত্র আশঙ্কার কারণ নাই। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধ স্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বান্তরং ব্রজেৎ॥
অতএব মহেশানি লক্ষমেকং গুরুং ত্যজেৎ।"

মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধুপান করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও সেইরূপ জ্ঞানপিপাসু হইয়া নিজগুরুর নিকট না পাইলে, অন্য সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইতে পারিবে। হে মাহেশ্বরি এরূপ অবস্থায় ক্রমে এক লক্ষ গুরুও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, ইহাতে গুরুত্যাগজনিত কোনরূপ দোষ হইবে না। বাস্তবিক এই মধুকর-বৃত্তিই সাধকের মাধুকরী-সাধনা। সাধু সন্ন্যাসীরা যে 'মাধুকরী' করিয়া জীবন ধারণ করে তাহা তাহাদের স্থূল বা বাহ্য-ক্রিয়ানুষ্ঠান, প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বভূতের মধ্যে সেই পরম বস্তুর মধুর রসাস্বাদন করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং মুমুক্ষু সাধক সেই দিব্য রসলাভের জন্য গুরু-চরণ-কমলসমূহে সতত পরিভ্রমণ করিবে। তবে কোন কুলাবধূত বা ব্রহ্মশক্তির জ্ঞানপুষ্ট মহাপূর্ণ-দীক্ষিত গুরুর কৃপা লাভ হইলে আর অন্য কাহারই আশ্রয় লইতে হইবে না। সেই এক কমল মধুতেই তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া যাইবে। ফলে সেইরূপ মহাত্মা সকল সাধকেরই সমান পূজার্হ ও একমাত্র আশ্রয়স্থল। পিচ্ছিলা-তন্ত্রে তাই ভগবান বলিয়াছেন—

"গুরুমূলমিদং শাস্ত্রং মন্ত্রশিবস্তথঃ প্রভুঃ।
অতএব মহেশানি যত্নতো গুরুমাশ্রয়েৎ ॥"

এই সমস্ত শাস্ত্রই গুরুমূলক, গুরু ব্যতীত মন্ত্রপ্রদ প্রভু আর কেহই নাই, অতএব হে মহেশানি, সাধকমাত্রেরই উচিত যত্নপূর্ব্বক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাধনমার্গে গুরূপদেশ ব্যতীত একপদও অগ্রসর হওয়া বিধেয় নহে। এ সকল কথা 'সাধনপ্রদীপে' বা তন্ত্ররহস্যের প্রথম খণ্ডেও বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। *

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিতে নাই, তিনি শিবস্বরূপ, অথবা শিবই গুরুরূপে সাধকের মন্ত্রোপদেষ্টা বলিয়া পরিচিত। আবার মন্ত্রও শিবস্বরূপ, সুতরাং গুরু, মন্ত্র ও শিব বা অভিষ্ট দেবতা তিনই এক বা একেই তিন, সেই কারণ গুরুকে কখন শূন্যাত্মক শিবরূপে সহস্রারে, কখন জিহ্বাগ্রে মন্ত্ররূপে, কখন হৃদপদ্মে ইষ্টদেবতারূপে এবং কখন বা তাঁহার পার্থিব পঞ্চভূতাত্মক সাক্ষাৎ গুরুরূপে অভেদ ধ্যান করিবে। মুণ্ডমালাতন্ত্রে তাই ভগবান স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, এই গুরু হইতে মন্ত্র, মন্ত্র হইতে দেবতা এবং দেবতা হইতে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। "গুরো-র্জাতশ্চ মন্ত্রশ্চ মন্ত্রাজ্জাতাতু দেবতা।" সাধনার এইরূপ ধারাবাহিক বিধান ব্যতীত সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। সুতরাং সর্ব্ব প্রথমেই গুরু-করণ বা দীক্ষার প্রয়োজন। সাধনতত্ত্বের প্রথম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, উপনয়ন সময়ে ব্রাহ্মণের মন্ত্র শ্রেষ্ঠ বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্রের দীক্ষা হইয়া থাকে সুতরাং ব্রাহ্মণের আর স্বতন্ত্র সাধারণ কর্ণশুদ্ধিপ্রদ দীক্ষায় আবশ্যক করে না।

* 'পূজা প্রদীপে' (গুরু-পূজাদি) ও পরিশিষ্টে (মন্ত্র-তন্ত্র) দেখ।

একেবারেই তাহাদের শাক্তাভিষেক হইতে কার্য্য আরম্ভ হইবে। তবে শূদ্রাদির প্রথম হরিনাম মন্ত্রে কর্ণশুদ্ধি হওয়া বিধেয়। রাধা-স্বাধোক্ত হরিনাম-রহস্যও তাঁহাদের বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক ক্রিয়া প্রয়োজন ;—এইরূপ দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শাক্তাভিষেকাদি সাধনার প্রাথমিক অভিষেকগুলি গ্রহণ করা উচিত। নিতান্তই পরিতাপের বিষয় ব্যবসায়ী বা কাণ্ফুকা-গুরুগণ তাহা আদৌ অবগত নহেন। 'নিরুত্তর তন্ত্র' ও 'বামকেশ্বর তন্ত্র' প্রভৃতিতে অভিষেকের আবশ্যকতা বিষয়ে বর্ণিত আছে—

"অভিষেকং বিনা দেবি কুলকর্ম্ম করোতি যঃ।
তস্য পূজাদিকং কর্ম্ম অভিচারায় কল্পতে॥
অভিষেকম্বিনা দেবি সিদ্ধবিদ্যাং দদাতি যঃ।
তাবৎ কালং বসেদ্ ঘোরে যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥"

অর্থাৎ অভিষিক্ত না হইয়া যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই কুলকর্ম বা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পূজার্চ্চনাদি করিতে আরম্ভ করেন এবং অভিষেক ব্যতীত সিদ্ধবিদ্যা সকলের কোনও মন্ত্রের দীক্ষা প্রদান করেন, তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অভিষিক্ত না হওয়া ব্যতীত সাধনার কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব কুলগুরু স্বয়ং অভিষিক্ত হইয়া নিজ নিজ শিষ্যকে অভিষেক প্রদান করিবেন। সাধারণ অনভিষিক্ত কুলগুরুগণ এখন যেরূপভাবে শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, যদি তাঁহারা পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত অভিষেকাদির শিক্ষা, অনুষ্ঠান ও আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ও তদীয় শিষ্যবর্গের যথেষ্ট মঙ্গল

সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে গুরুকে আর শিষ্যের দ্বারে সর্ব্বদা নিতান্ত হেয় হইয়া থাকিতে হয় না, ফলে কুলাচার্য্যরূপে তাঁহারাও একদিন জগতের পূজনীয় হইতে পারেন। এই প্রাথমিক অভিষেকবিধান সম্বন্ধে 'বামকেশ্বর তন্ত্রের' পঞ্চাশত পটলে বর্ণিত আছে :—

"অভিষেকস্তু দ্বিবিধঃ শাক্তশ্চ পূর্ণ এব চ।
অবধূতেন গুরুণা শাক্তাভিষেকমাচরেৎ ॥"

প্রাথমিক অভিষেক দুই প্রকার, যথা—প্রথম, শাক্তাভিষেক ; দ্বিতীয়, পূর্ণাভিষেক। এই শাক্তাভিষেকও কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কুলগুরুগণ প্রথমে স্বয়ং অভিষিক্ত হইয়া পরে শিষ্যকেও অভিষিক্ত করিতে পারেন, তবে কেবল শাক্তাভিষিক্ত হইয়াই ইঁহাদের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত নহে। অন্ততঃ দ্বিতীয় অধিকার অর্থাৎ পূর্ণাভিষেক লইয়া শাক্তাভিষেকের উপদেশ দেওয়া উচিত। ইহার পর ক্রমদীক্ষাদি অভিষেকগুলি যথাক্রমে গ্রহণ করিতে হয়, সে সকল বিষয় যথাসময়ে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে শাক্ত ও পূর্ণাভিষেক-বিধানই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় গুরুমণ্ডলী কর্ত্তৃক শিষ্য উপযুক্ত বিবেচিত হইলে অথবা গুরুদেবের সুবিধা বোধ হইলে এক সঙ্গেই শাক্ত ও পূর্ণাভিষেকের অধিকার প্রদত্ত হইয়া থাকে। বোধ হয় সাধনাকাঙ্ক্ষীর স্মরণ আছে, 'সাধন-প্রদীপে' এই শাক্তাভিষেক-সাধনাকেই সর্ব্বপ্রথম অধিকার বলা হইয়াছে, সুতরাং পূর্ণাভিষেকের পূর্ব্বে শাক্তাভিষেক-প্রথা, যাহা গুরুপরম্পরার আদেশক্রমে যে ভাবে সকল মঠে আচরিত হইয়া থাকে, শ্রীনাথ গুরুদেবের আদেশে তাহা প্রথমেই বর্ণিত হইবে।

বলিয়া রাখা আবশ্যক, পূর্ব্বোক্ত আদি বা অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর, যাঁহার নিকট শঙ্করাচার্য্যদেব অদ্বৈতবাদের বিচার প্রার্থনা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রাচীন মঠ বঙ্গের কোনও নিভৃত স্থানে গঙ্গাসাগরসমীপে এখনও অতি যত্নে অতি সংগোপনে রক্ষিত আছে। গুরু-পরম্পরায় ক্রমে ইহাও শ্রুত হইয়া আসিতেছে যে, সেই আদি ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর এখনও সেই আনন্দমঠে লিঙ্গ-শরীরে বিরাজিত রহিয়াছেন। যাঁহারা মহাপূর্ণ দীক্ষাভিষেক ও বিরজা সম্পন্ন করিয়া উচ্চতম সাধনায় অদ্বৈততত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হন, কেবল তাঁহাদিগকেই তিনি শেষ নির্ব্বাণ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধারণ সাধকের ভাগ্যে তাঁহার দর্শনলাভ দুরূহ। অধিকন্তু কলির পঞ্চসহস্র বিগতাব্দার মধ্যে যাঁহারা গুপ্তভাবে থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, শিবের আদেশে তাঁহাদের আর কেহ দর্শন করিতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন কোনও মঠের কথাও কোন সাধক যোগী সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না। সেই সকল মঠেই হস্তলিখিত বিবিধ তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র সকল লুক্কায়িত আছে। তাহা পূর্ব্বে যেমন গুপ্ত ছিল এখন তদপেক্ষাও গুপ্তভাবে রক্ষিত থাকিবে। ইহাও শিবপ্রতিম সেই মুক্ত সাধকদিগেরই আদেশ। সুতরাং সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্ত্বে আমিও তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কলির পঞ্চসহস্র গতাব্দের পর হইতে যে সকল নূতন মঠ পূর্ব্বাচার্য্যদিগের আদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল নূতন আচার্য্য বৃত হইয়াছেন ও হইবেন, তাঁহাদের দ্বারাই সেই গুপ্ত-তন্ত্র ও গূঢ় যোগ শাস্ত্রাদি কলির প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক মত উপদিষ্ট হইবে।

ইহাও শিবের আদেশ। আমরা সেই পূজ্যপাদ গুরুমণ্ডলীর আদিষ্ট বা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকা মাত্র।

অনভিষিক্ত কুলগুরু অর্থাৎ যাঁহারা বংশ-পরম্পরায় অসংখ্য শিষ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের কুল-গৌরব-স্বরূপ তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের মধ্যে এক বা ততোধিক মহাত্মা যাঁহারা উৎকট সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধির ফলস্বরূপ সনাতন ধর্ম্মপিপাসু এতাধিক আর্য্য-পরিবার এখনও সেই বংশের কৃপাভিখারী হইয়া রহিয়াছেন, সেই সিদ্ধ মহাপুরুষগণের সাধন-সামর্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই সেই বংশের বংশধরগণকে এখনও গুরুরূপে গ্রহণ ও পূজা করিয়া আসিতেছেন, সেই সকল গুরুকুলের যথেষ্টরূপ অবনতি হইলেও তাঁহাদিগের সেই সিদ্ধ বংশমাহাত্ম্য এখনও বহুস্থলে তিরোহিত হয় নাই। 'কালী' 'তারাদি' সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞ দিব্য বা সাত্ত্বিক কৌল-সাধকের অন্ততঃ পঞ্চাশ পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাধনায় শক্তি বিদ্যমান থাকে, ঐরূপ বীর সাধকদিগের পঁচিশ পুরুষ এবং তামসিক সাধকদিগের দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সাধনসামর্থ্য কোন কোনও বংশে এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই কারণ সাধনাভেদে কুলগুরুগণের সহিত যথাক্রমে পঞ্চাশ, পঁচিশ ও দশ পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের শিষ্যবংশের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের কথা 'গুরুতন্ত্র' ও 'কামাখ্যা তন্ত্রের' মধ্যে বিশদভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু শিষ্য উভয়েরই এই শাস্ত্রাদেশ অবহিতচিত্তে চিন্তা করিবার বিষয়ীভূত।

বর্ত্তমান সময়ে সদ্গুরু অন্বেষণ করিয়া সহসা তাঁহাদের বাছিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে, কারণ, সাধক না হইলে প্রকৃত

সাধক চিনিতে পারা যায় না। সেই জন্যই বাহ্যাড়ম্বরে ভ্রান্ত হইয়া অনেকেই ভণ্ডকে গুরুরূপে সম্মান করেন, অথচ আড়ম্বরবিহীন প্রকৃত সাধককে উপেক্ষা করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক বা অধুনা কথিত কুলগুরুকেও পরিত্যাগ করিয়া, সেই সকল ভণ্ডের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। বলিতে কি, তাহাতেও তাঁহাদের অভাব পূর্ণ হয় না, তাঁহারা সাধনার কোন পন্থাই দেখিতে পান না। ফলে, কেবল স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ প্রচলিত কুলগুরু ত্যাগ হেতু সামাজিক ভাবেই এক মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া থাকেন। অনভিষিক্ত গুরুগণ যাহাতে তন্ত্র বা সাধনার যথার্থ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা নিজে নিজেই যথাবিধি অনুষ্ঠানযোগে অভিষিক্ত হইয়া স্ব স্ব শিষ্যদিগকে প্রকৃত সাধনার উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, শ্রীনাথ গুরুমণ্ডলীর আদেশে সে কথারও সঙ্কেত ইহাতে প্রদত্ত হইবে।

কেবলমাত্র গুরু বংশ বা কুল-মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যাহাতে প্রকৃত পক্ষে সেই পূজ্যপাদ সিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষগণের বংশের মর্য্যাদা ও আদর্শ তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারাও স্ব স্ব বংশের উজ্জ্বল প্রদীপরূপে নিজকুল আলোকিত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অনভিষিক্ত গুরুকুলের কায়মনে চেষ্টা করা বিধেয়। তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক—ফল্গুনদীর ন্যায় সাধনার অন্তঃসলিল-প্রবাহ তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই গুপ্ত-ভাবে বিদ্যমান আছে; কেবল একটু পরিশ্রম করিয়া বালুকা-রাশিসম তাঁহাদের হৃদয়গর্ভের অজ্ঞানতাসমূহ বিদূরিত করিতে পারিলেই, অতি স্নিগ্ধ ও সুনির্ম্মল সাধন-সলিল আবার তাঁহারা উপভোগ করিতে পারিবেন।

যথাশাস্ত্র মন্ত্র ও অভিষেক-বিধি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলেও, কোনও উচ্চাধিকারী সাধকের নিকট হইতেই তাহা গ্রহণ করা উচিত। পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশই তান্ত্রিক সাধনা-শিক্ষার মূল-পীঠ বা কেন্দ্রস্থান: সুতরাং ইহার অন্তর্গত আনন্দমঠ ও তৎপরিচালিত প্রান্তীয় কৈন্দ্রিকমঠ বা তাহার অসংখ্য শাখা মঠ, যাহা ভারতের উত্তর-প্রান্তস্থিত সেই হিমানী-মণ্ডিত গিরিগুহাসমূহ হইতে ক্রমে দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তের নানাস্থানে এখনও অতি গুপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে ও কলির পঞ্চসহস্র গতাব্দা হইতে ক্রমে প্রকাশ্যভাবেও স্থানে স্থানে নূতন মঠ স্থাপিত হইয়াছে ও হইবে, তাহার যে কোন একটীর অন্তর্গত কোন একজন সাধকের সহিত পরামর্শ করিলে, নিশ্চয়ই কোন না কোনও সাত্ত্বিক সাধকের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে ভক্তি বিশ্বাসপুষ্টঅন্তরে বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের আবশ্যক আছে। সাধ্যানুসারে অনুসন্ধান করিয়া এরূপ কোনও ক্রিয়াভিজ্ঞ সাধকের * নিকট হইতে অভিষিক্ত হইলেই ভাল হয়, অন্যথা তাহার সম্পূর্ণ অভাব বোধ করিলে, অর্থাৎ এমন কোন

* মূলে বলা হইয়াছে, সাধক না হইলে সাধক চেনা যায় না, সুতরাং সাধারণ সাধু সন্ন্যাসীদিগের বচন-চাতুর্য্যে সহসা মুগ্ধ হইয়া যোগ ও প্রাণায়ামাদির উপদেশ লওয়া উচিত নহে। সেই কারণ প্রকৃত যোগ-পরায়ণ সাধক চিনিবার দুই একটী সহজ সঙ্কেত এই স্থলে বলিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ স্নিগ্ধ কোমল অথচ জ্ঞানোজ্জ্বল প্রফুল্ল নয়নই যোগীর পরিচায়ক। পরিচ্ছদ-পারিপাট্যবিহীন সেই আনন্দময়মূর্ত্তি দেখিবামাত্র হৃদয় অভিনব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়। হিন্দুস্থানী সাধকগণের মধ্যে দুই একটী প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে,—

"যোগীকো পরছান্ আঁখ,
ঔর জ্ঞানীকো পরছান্ বাক্।"

দুর্গমস্থলে, সাত্ত্বিক-সাধন শক্তিবিহীন বা শূদ্র-প্রধান স্থানে থাকিয়া অভিষিক্ত হইবার ইচ্ছা করিলে, যে বিধি অবলম্বন করিতে হইবে, সংক্ষেপে তাহাও বর্ণিত হইতেছে। অনভিষিক্ত নামধারী কুলগুরুগণের পক্ষেও তাহা যে, বিশেষ সহায়তা প্রদান করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাথমিক ও পরবর্ত্তী অভিষেকবিধি-সম্বন্ধে গুরুপরম্পরাদেশে যাহা বর্ণিত হইবে, অভিষেকাভিলাষী ব্রাহ্মণ-সাধক যথাবিধানে তাহা সম্পন্ন করিয়া লইবেন। পুনরায় বলিতেছি,—সাধনাকাঙ্ক্ষীর যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে, অধিকারপ্রাপ্ত সাধকের নিতান্ত অভাব হইলেই, "আদিআনন্দ-মঠাধিশ অতিবৃদ্ধ শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ-গুরু-পরম্পরাকে উদ্দেশ্যে" গুরুপদে বরণ করিয়া, সেই সকল অনুষ্ঠান-বিধি অতি সাবধানে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূত চিত্তে অবলম্বন করিবেন; অন্যথা কদাপি স্বয়ং অভিষিক্ত হইবার কল্পনাও করিবেন না। যদি শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকে, যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তবে এই শিবস্বরূপ সর্ব্বদর্শী তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর আদেশ শিববাক্য বলিয়াই মনে রাখিবেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই যথা সময়ে তাঁহাদের কৃপালাভ করিয়া পরম সুখী হইতে পারিবেন।

> "যোগীকো, ভোগীকো, রোগীকো জান্,
> আঁখসে নিসান্ ঔর আঁখসে পয়ছান্।"

সামান্য একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত তন্ত্র-শাস্ত্রাদির মধ্যেও গুরুলক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই সকল মিলাইয়া সাধক-গুরু নির্ণয় করা কঠিন। তবে যাঁহারা গুরু-মণ্ডলী ও আনন্দমঠসমূহের সংবাদ জানেন, যাঁহারা ত্রিতীর্থ, নবচক্র, ত্রিলোক্য, ব্যোমপঞ্চক ও কলাধারাদি গুপ্ত যোগাত্মক বিষয়সমূহে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই যোগোপদেষ্টা-সাধক বলিয়া জানিবে।

গ্রন্থ কখনও গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে না ;—আধুনিক অনেক ব্যবসায়ী গ্রন্থকার "বিনা গুরূপদেশে যোগাদি সকল সাধন প্রণালীই শিক্ষা হইবে" বলিয়া নিজ নিজ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত, তাঁহারা নিতান্তই শঠ, তাঁহারা সাধনার কোন ধারই ধারেন না, কেবল স্বার্থের জন্য নানা গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর নিজ মনোমত টীকা ও টিপ্পনিসহ গ্রন্থ-রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। সুতরাং সেরূপ সাধনগ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ যেন ভ্রমজালে না পড়েন। অধুনা অনেকেই সেইরূপ গ্রন্থ পড়িয়া যোগাদি অনুষ্ঠান করিবার ফলেই নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত * হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা কেবল সাধনা-দ্বারা অনুভাব্য বা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষদৃষ্টি-সাপেক্ষ বিষয়, তাহা যে সহস্র সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে প্রকাশ করা প্রকৃতই দুঃসাধ্য, ইহা সহজেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যেমন ইক্ষু-গুড় ও খর্জ্জুর-গুড়, উভয়েরই স্বাদ মিষ্ট হইলেও, যদি কেহ ইক্ষু বা খর্জ্জুর গুড় কখনও না খাইয়া থাকেন, আর সেই ব্যক্তিকে যদি উভয়ের মধ্যে স্বাদের পার্থক্য যে কি, তাহা বিবৃত করিয়া বুঝাইয়া বলা হয়, কিংবা শত-সহস্রপৃষ্ঠা-গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে সেই স্বাদের বিচিত্র পার্থক্য কিছুতেই বুঝাইতে পারা যাইবে না, কিন্তু এক এক বিন্দু উভয় প্রকার গুড় তাহার জিহ্বার উপর প্রদান করিলে অতি সহজে তৎক্ষণাৎ তাহার বোধগম্য হইবে, আর বৃথা অজস্র বাক্যব্যয় করিতে

* যোগব্যাধি-নিবারক ক্রিয়া-বিধি ও ঔষধাদি "পুরশ্চরণপ্রদীপের" পরিশিষ্ট-অংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

হইবে না। সাধন-রস আস্বাদন করিতে হইলেও সেইরূপ উপযুক্ত সিদ্ধ-গুরুর প্রত্যক্ষ-উপদেশ ও আদর্শ ব্যতীত তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না। তবে গুরু-পরম্পরাদিষ্ট সাধনশাস্ত্রসমূহ ও ক্রিয়াভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রণীত উপাদেয় সাধনগ্রন্থাবলী তাহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে মাত্র।

ওঁ সদাশিব ওঁ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

সাধারন অভিষেক-ক্রিয়া ও তাহার বিধান।

"অভিষেকং বিনা দেবি কুলকর্ম্ম করোতি যঃ।
তস্যপূজাদিকং কর্ম্ম অভিচারায় কল্পতে॥" ইত্যাদি

এ সকল কথা প্রথম উল্লাসেই বলা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত আরও উক্ত হইয়াছে যে, প্রাথমিক অভিষেক দ্বিবিধ, যথা শাক্তাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। ইহার মধ্যে 'শাক্তাভিষেকই' মূল বা আদ্যাভিষেক বলিয়া শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং সাধনাকাঙ্ক্ষীর তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। পূর্ণাভিষেক ও অন্যান্য অভিষেকগুলি যথাক্রমে পরে গ্রহণীয়। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন:—

"বিধান মেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদযুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তোনরামোক্ষং যযুঃ পুরা॥"

সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই অভিষেকবিধান অতিশয় গুপ্ত ছিল, তৎকালে অতি গুপ্তভাবেই ইহার অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তিমান্ সাধকগণ মোক্ষলাভ করিয়াছেন। দেবাদিদেব শ্রীভগবান্ ইহার পরই আবার বলিয়াছেন :—

"প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্তিনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্ ॥"

প্রবল কলির আবির্ভাব হইলে, তখন কুলাচারী মহাত্মগণ রাত্রিকালে অথবা দিবসেই প্রকাশ্যভাবে অভিষেকের ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীসদাশিব আরও বলিয়াছেন :—

"গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্তকৌলেন সংস্কারং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥"

অর্থাৎ হে প্রিয়ে, যদি গুরু (প্রাথমিক মন্ত্রদাতাগুরু) শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হয়েন, তাহা হইলে কোনও অভিষিক্ত কৌল-ধর্ম্মাশ্রয়ী সাধকের দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে। অভিষেকের পূর্ব্বদিবসে সায়ংকালে কোনও অভিষিক্ত-গুরু কর্ত্তব্য-কর্ম্মের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজ গণপত্যাদি দেবতার পূজা ও অভিষেকার্থী শিষ্যের অধিবাস ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দিবেন। কোন কোনও সাধক অভিষেক-দিবসেই গণপতির পূজা ও শিষ্যের অধিবাসাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অধিকাংশ মঠে এইরূপ বিবিধই অধুনা প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিবাসান্তে শিষ্য উপস্থিত কুলসাধক-গণের যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবেন। এইস্থানে সাধনাকাঙ্ক্ষীর অবগতির জন্য আগমোক্ত অধিবাসাদির সংক্ষিপ্ত বিধান লিপিবদ্ধ হইতেছে।

অধিবাস-উপলক্ষে গণেশাদি

পূজা ৪—প্রথমে গুরুদেব অভিষেক বা পূজাগৃহে আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথারীতি আচমনাদি * সম্পন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া জগন্মাতার চরণচিন্তা করিবেন। 'পূজাপ্রদীপে' দেবীর চরণচিন্তাদি মন্ত্র লিখিত আছে। এস্থলেও সংক্ষেপে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"ওঁ তৎসৎ। হ্রীঁ দেবি, তৎপ্রাকৃতং চিত্তংপাপাক্রান্তমভূন্মম। তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হূঁ ফট্ চ তে নমঃ॥ ওঁ হ্রী সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥" চ।

পূর্ব্বদিবসে দীক্ষাভিলাষী শিষ্য নিরামিষী বা হবিষ্যান্নভোজী হইয়া সম্পূর্ণ সংযমী থাকিবে। শিষ্য পূজাদি কর্ম্মে অভিজ্ঞ হইলে, স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি কার্য্য সমাপণান্তে সংক্ষেপে 'পঞ্চদেবতা' ও 'নবগ্রহ' আদির পূজা করিয়া পরে স্বস্তিবাচন করিবে।

অথ স্বস্তিবাচন—(কুশীতে আতপ চাউল লইয়া)"ওঁ হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য (শিষ্যের গোত্র ও নাম বলিয়া) শ্ব কর্ত্তব্য * শুভ শাক্তাভিষেক কর্ম্মাঙ্গীভূত গণপত্যাদি দেবতাপূজাশুভাধিবাসনকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু হ্রীঁ পুণ্যাহং। হ্রীঁ পুণ্যাহং হ্রী পুণ্যাহং হ্রী পুণ্যাহং। (কুশত্রাক্ষণৈঃ সহ উক্ত্বা নারাচমুদ্রয়া ত্রিস্তণ্ডুলান্ বিকীরেৎ। অর্থাৎ 'নারাচমুদ্রায়' তিনবার সেই চাউল ছড়াইবে। এইভাবে পুনরায় বলিবে। "হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য (শ্বঃকর্ত্তব্য) শুভ শাক্তা-

* 'পূজাপ্রদীপের'—১৮৪ পৃষ্ঠা হইতে "শ্রীশ্রীমদ্ দক্ষিণ কালিকার পূজাবিধি" দেখা দেখ।

ভিষেক কর্ম্মাঙ্গীভূত গণপত্যাদি দেবতাপূজা-শুভাধিবাসনকর্ম্মণি ঋদ্ধিংভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। হ্রীঁ ঋদ্ধ্যতাং। হ্রীঁ ঋদ্ধ্যতাং। হ্রীঁ ঋদ্ধ্যতাং।" (এইভাবে) "হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য (শ্বঃকর্ত্তব্য) শুভ শাক্তাভিষেক কর্ম্মাঙ্গীভূত গণপত্যাদি পূজা-শুভাধিবাসনকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। হ্রীঁ স্বস্তি। হ্রীঁ স্বস্তি। হ্রীঁ স্বস্তি। তাহার পর—"হ্রীঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।" "ওঁ হ্রীঁ হঁ স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণশ্রবাঃ হ্রূঁ স্বস্তি নঃ কালী হ্রেঁ মেধামৃতময়ীং হ্রৈঁ স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু শ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্ স্বাহা! হ্রীঁ স্বস্তি। হ্রীঁ স্বস্তি। হ্রীঁ স্বস্তি। (কুশ-ব্রাহ্মণৈঃ সহ ত্রিস্তণ্ডুলান্ বিকীরেৎ।) পূর্ব্ববৎ তিনবার সেই চাউল ছড়াইবে।

অথ সঙ্কল্প মন্ত্র—ওঁ তৎসৎ। হ্রীঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুকস্য (শিষ্যের গোত্র ও নাম বলিয়া) শুভ শাক্ত † তথা পূর্ণাভিষেক কর্ম্মাঙ্গীভূত গণপত্যাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বক শুভ-অধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" অনন্তর স্ব-শাখোক্ত 'সঙ্কল্পসূক্ত' জানা থাকিলে পাঠ করিবেন। ইহার পর পূজার অন্যান্য সাধারণ আনুষ্ঠানিকক্রিয়া-কলাপ ব্রাহ্মণমাত্রেই বিশেষভাবে অবগত আছেন, সেই কারণ কেবল বিশেষ মন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য অনুষ্ঠানের

* 'শ্বঃ' অর্থে পরদিন বা আগামী কল্য। যখন 'আনন্দমঠের' নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে, তখন 'শ্বঃকর্ত্তব্য' এই শব্দ ব্যবহৃত হইবে না, কারণ সে নিয়মে 'সদ্য' সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হয়।

† 'শাক্তাভিষেক' বা 'পূর্ণাভিষেক' যখন যেরূপ আবশ্যক সেইরূপ মন্ত্র বলিবেন।

বিষদভাবে আলোচনা করিলাম না। 'পূজাপ্রদীপ' দেখিয়া পূজার্চ্চনার অন্যান্য সকল কার্য্যই করিতে পারিবেন।

'পূজাপ্রদীপে' বর্ণিত বিধি অনুসারে সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্য স্বতন্ত্র ভাবে যথারীতি স্থাপিত হইলে, 'মাষভক্তবলি' প্রদান করিবে। ইহার পর 'ভূতশুদ্ধি'। ভূতশুদ্ধি কঠিন ব্যাপার, তাহা সাধক গুরূপদেশ ব্যতীত করিতে সমর্থ নহেন। সেই কারণ তন্ত্রোক্ত সামান্য-ভূতশুদ্ধি অর্থাৎ জ্যোতির্মন্ত্র (ওঁ হ্রৌ) ১০৮ বার জপ করিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। যিনি প্রকৃত ভূত-শুদ্ধিতে* অভিজ্ঞ, তিনি সেইরূপই কার্য্য করিবেন। তাহার পর 'মাতৃকান্যাস', 'করাঙ্গন্যাস', 'অন্তর্মাতৃকান্যাস', 'বাহ্যমাতৃকান্যাস,' সম্পন্ন করিয়া 'আদিত্যাদি নবগ্রহ', 'ইন্দ্রাদি দশদিকপাল', 'গণেশাদি পঞ্চদেবতা', 'সর্ব্বদেবতা', 'সর্ব্বদেবী', 'অকারাদি পঞ্চা-শদ্বর্ণ' 'প্রতিপদাদি তিথি,' 'কৃষ্ণপক্ষ', 'শুক্লপক্ষ', 'অমাবস্যা', 'পূর্ণিমা,' 'গুরু' ও উপস্থিত 'দেবদেবীর' গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে 'পীঠন্যাস' করিবে। এই সকল ন্যাসাদি, 'পূজাপ্রদী-পের' মধ্যে বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

বিঘ্নরাজ গণপতি পূজা ঃ—প্রথমে নিম্ন-লিখিতরূপে বিঘ্নরাজ গণপতির ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হইবে। যথা :—"অস্য গণপতি বীজমন্ত্রস্য গণকঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নরাজদেবতা (শ্বঃকর্ত্তব্য †) শুভ শাক্ত তথা পূর্ণাভিষেক কর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকঋষয়ে নমঃ, মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে বিঘ্নরাজায় দেবতায়ৈ নমঃ।"

* প্রকৃত ভূতশুদ্ধি বিধি পরে এই গ্রন্থে ও 'পূজাপ্রদীপে' অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

† অভিষেকের দিবসেই এই 'ন্যাস' করিতে হইলে, 'শ্বঃ কর্ত্তব্য' বলিবে না।

অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি করাঙ্গন্যাস, যথা:—"গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, গৈং অনামিকাভ্যাং হূং, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, গঃ করপৃষ্ঠতলাভ্যাং অস্ত্রায় ফট, ॥" হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস, যথা:—"গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গূং শিখায়ৈ বষট্, গৈং কবচায় হূং, গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গঃ করপৃষ্ঠতলাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥" 'গং' এই বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে হইবে। ('পূজাপ্রদীপে' অন্যান্য অনুষ্ঠান-বিধি দেখ) ইহা সম্পন্ন হইলে, নিম্নলিখিতরূপ গণপতির ধ্যান করিতে হইবে।

"সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্ত-পদ্মৈর্দ্দধানং।
শঙ্খং (দণ্ডং) পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্ ॥
বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলিং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডম্।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজতগণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং ॥"

ভাবার্থ।—যাঁহার দেহ সিন্দূরের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, যাঁহার তিনটী নয়ন, যাঁহার জঠর স্থূলতর, বাহুচতুষ্টয় দ্বারা যিনি শঙ্খ(দণ্ড), পাশ, অঙ্কুশ ও বর এবং বিশাল শুণ্ড দ্বারা বারুণীপূর্ণ কুম্ভ ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার মৌলি নব-শশিকলা দ্বারা উদ্দীপ্ত, যাঁহার গজরাজসদৃশ বদন এবং সেই গণ্ড সর্ব্বদা মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত এবং যিনি রক্তবস্ত্র পরিধান ও রক্তবর্ণ-অঙ্গরাগ দ্বারা চর্চ্চিত, এইরূপ বিঘ্নরাজ গণপতির ধ্যান করিবে। অনন্তর মানসোপচারে পূজা করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত গণপতি-ঘটের চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে পূর্ব্ব হইতে পীঠশক্তিদিগকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। যথা:— (পূর্ব্বদিকে) "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ", (অগ্নিকোণে)"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ", এইভাবে প্রত্যেকবারে "এতে গন্ধ-

পুষ্প" বলিয়া (দক্ষিণদিকে) "ওঁ নন্দায়ৈঃ নমঃ", (নৈঋতে) "ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ", (পশ্চিমদিকে) "ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ", (বায়ুকোণে) "ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ", (উত্তরদিকে) "ওঁ তেজস্বত্যৈ নমঃ", (ঈশানকোণে) "ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ", (মধ্যে) "ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ"।

অনন্তর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কমলাসনায় নমঃ" বলিয়া কমলাসনের পূজা করিয়া, বিঘ্নরাজের পূর্ব্বোক্তরূপ পুনরায় ধ্যান ও যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। (বীরভাবানুকূল যাঁহারা বাহ্য-পঞ্চমকার ব্যবহার করেন, তাঁহারা তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র-শোধিত পঞ্চতত্ত্বরূপ উপচার-সহযোগেও পূজা করিতে পারেন। তবে শিবস্বরূপ আদিগুরু বৃদ্ধ-ব্রহ্মানন্দদেবের দিব্যাচারী ও দাক্ষিণাচারী শিষ্য-পরম্পরামধ্যে বাহ্য-পঞ্চমকারের আদৌ ব্যবহার নাই।) যাহা হউক পরে (প্রত্যেকবার "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ" বলিয়া) "গণেশায় নমঃ, ওঁ গণনায়কায় নমঃ, (এইরূপে) গণনাথায়, গণক্রীড়ায়, একদন্তায়, লম্বোদরায়, গজাননায়, মহোদরায়, বিকটায়, ধূম্রাভায় ও বিঘ্ননাশন-দেবতায়" বলিয়া সকলের পূজা করিবে। এইবার 'ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট-শক্তি' ও 'ইন্দ্রাদি দশদিক-পালের' পূর্ব্ববৎ গন্ধপুষ্পসহ পূজা করিবে। দিক্‌পালদিগের 'অস্ত্রসমূহের'ও পূজা করিবে। অনন্তর গণেশঘটেই ষষ্ঠিমার্কণ্ডেরও আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে। এই সকল দেবতাসহ বিঘ্নরাজের যথাশক্তি পূজা সম্পন্ন হইলে, অধিবাস-কার্য্য সম্পন্ন করিবে ও পরে উপস্থিত সাধকদিগকে সাধ্যমত তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইবারও বিধি আছে।

অধিবাস :—তান্ত্রিক দশবিধ সংস্কার-বিধানানুসারে * 'অধিবাসক্রিয়া' সম্পন্ন করিবে। (এ স্থলে অধিবাস-ক্রিয়ার সংক্ষেপে বিধিই বর্ণিত হইতেছে।) শিষ্যের এই অধিবাস-সংস্কারের জন্য গুরু স্বয়ং উত্তরমুখে বসিয়া শিষ্যকে পূর্ব্বমুখে নিজের বামদিকে বসাইবে। প্রথমে একটু হরিদ্রা (বাটা হলুদ) লইয়া গণেশঘটে স্পর্শ করাইয়া তাহাতে নিজ দিব্য-দৃষ্টি প্রয়োগপূর্ব্বক শিষ্যের কপালে ছুঁয়াইতে ছুঁয়াইতে বলিবেন--"ওঁ হ্রীঁ অনয়া হরিদ্রয়া অস্তু (স্ত্রীলোক হইলে 'অস্যাঃ' বলিবে) শুভাধিবাসনমস্তু।" এই ভাবে একটু চন্দন লইয়া পূর্ব্ববৎ গণেশঘটে স্পর্শ করাইয়া তাহাতে নিজ দিব্যদৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক শিষ্যের কপালে ছুঁয়াইতে ছুঁয়াইতে বলিবে-"ওঁ হ্রীঁ অনেন গন্ধেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু।" অনন্তর 'মহী' আদি † বরণডালার এক একটী বস্তু লইয়া পূর্ব্ববৎ ঘটে স্পর্শ করাইয়া ও নিজ দৃষ্টিস্থাপন দ্বারা শক্তিযুক্ত করিয়া তন্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে বা কেবল 'গায়ত্রী' পাঠপূর্ব্বক ১। 'মহী', অর্থাৎ গঙ্গামৃত্তিকা "ওঁ হ্রীঁ অনয়া মহ্যা অস্য শুভাধিবাসনমস্তু।" এই ভাবে ২। 'চন্দন' লইয়া পূর্ব্ববৎ বিধিতে শক্তিযুক্ত করিবে ও 'গায়ত্রী' পাঠসহ শিষ্যের কপালে স্পর্শ করাইতে করাইতে বলিবে—"ওঁ হ্রীঁ অনেন গন্ধেন অস্য শুভাধিবাসনমস্তু"। ৩। 'শিলা' (নুড়ী) লইয়া "ওঁ হ্রীঁ অনয়া শিলয়া অস্য শুভাধিবাসনমস্তু।" ৪। 'ধান্য' লইয়া পূর্ব্ববৎ বিধিতে

* 'মহানির্ব্বাণ' তন্ত্রের নবমোল্লাস দেখ।

† মহী-গন্ধ-শিলা-ধান্য-দূর্ব্বা-পুষ্প-ফলং-দধি। ঘৃত-স্বস্তিক-সিন্দুর-শঙ্খ-কজ্জল-রোচনাঃ। সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং-রৌপ্যং-তাম্র-চামর-দর্পণম্। দীপং-প্রশস্তি-পাত্রঞ্চ বদন্ত্যেষ্টু ভকর্ম্মসু।"

"ওঁ হ্রীঁ অনেন ধান্যেন অস্য........."। ৫। 'দূর্ব্বা' লইয়া "ওঁ হ্রীঁ অনয়া দূর্ব্বয়া........."। ৬। 'পুষ্প'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন পুষ্পেন........."। ৭। 'ফল' (কদলী বা হরিতকী আদি) লইয়া—"ওঁ হ্রীঁ অনেন ফলেন......"। ৮। 'দধি'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন দধ্না......"। ৯। 'ঘৃত'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন ঘৃতেন........."। ১০। 'স্বস্তিক' (পিষ্টতণ্ডুল বা পিটুলির দ্বারা গঠিত ত্রিকোণাকার যন্ত্র স্বস্তিক)—"ওঁ হ্রীঁ অনেন স্বস্তিকেন......"। ১১। সিন্দূর—"ওঁ হ্রীঁ অনেন সিন্দূরেন......"। ১২। শঙ্খ—'ওঁ হ্রীঁ অনেন শঙ্খেন........."। ১৩। 'কজ্জল'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন কজ্জলেন........."। ১৪। 'রোচনা' (গোরোচনা অভাবে হরিদ্রা)—"ওঁ হ্রীঁ অনয়া রোচনয়া........."। ১৫। 'সিদ্ধার্থ' (শ্বেতশর্ষপ)—"ওঁ হ্রীঁ অনেন সিদ্ধার্থেন........."। ১৬। 'কাঞ্চন'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন কাঞ্চনেন........."। ১৭। 'রৌপ্য'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন রৌপ্যেন........."। ১৮। 'তাম্র'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন তাম্রেন........."। ১৯। 'চামর'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন চামরেন......"। ২০। 'দর্পন'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন দর্পনেন........."। ২১। 'দীপ'—"ওঁ হ্রীঁ অনেন দীপেন........."। ২২। 'প্রশস্তিপাত্র' (বরণডালা অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত দ্রব্যগুলি যে থালা বা যে পাত্রে রক্ষিত থাকে) —"ওঁ হ্রীঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেন........."। সকল দ্রব্যই পূর্ব্ব-বর্ণিত বিধিমত ঘটে স্পর্শ করাইয়া শক্তিযুক্ত করণান্তর গায়ত্রী-পাঠসহ শিষ্যের কপালে বা যথাস্থানে স্পর্শ বা প্রদান করিবে।

এতদ্ব্যতীত হরিদ্রারঞ্জিত কাঁচসূতায় ৫টী বা ৭টী দূর্ব্বা বাঁধিয়া 'মাঙ্গল্যসূত্র' প্রস্তুত করিবে ও তাহাও পূর্ব্ববর্ণিত বিধি অনুসারে ঘটে স্পর্শ ও শক্তিযুক্ত করিয়া গায়ত্রী পাঠসহ—"ওঁ হ্রীঁ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেন........." বলিয়া শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে (শিষ্যার বাম হস্তে) বাঁধিয়া দিবে।

ইহার পর 'শ্রী' আদি থাকিলে পূর্ব্ববৎ বিধিতে—"ওঁ হ্রীঁ অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেন........"। বলিয়া কপালে স্পর্শ করাইবে।

এই সকল দ্রব্যের অভাবে কেবল চন্দন, সিন্দুর ও দূর্ব্বা বা কেবল জল চাউল দিয়াই সংক্ষিপ্ত ভাবে হইতে পারিবে।

বসুধারা ঃ—দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে বা দক্ষিণ প্রাচীর-গাত্রে নাভির সমসূত্রপাতে ঊর্দ্ধে একটা সিন্দূরের বিন্দু তাহার নিম্নে হরিদ্রা বা হলুদ বাটা দিয়া একটী অর্দ্ধচন্দ্রের আকার বিশিষ্ট রেখা অঙ্কন করিবে এবং উহার নিম্নে ৭টী বা ৫টী সিন্দূরের বিন্দু দিবে ও সেই বিন্দু হইতে এক একটী ঘৃত ধারা নিম্নে ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিবে এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকবার নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

"ওঁ যদ্‌বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্ বা বর্চ্চো গবামুত।
সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চ স্তেনমা সং সৃজামসি॥"

অনন্তর উক্ত ধারার নিম্নে ভিত্তিমূলে চেদিরাজ বসুর আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প-সহযোগে 'ওঁ চেদিরাজ বসবে নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে ও নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে।
ক্ষুৎপিপাসাহ্রদে দাস্ত চেদিরাজ নমোঽস্তুতে।'
ওঁ চেদিরাজবসো ক্ষমস্ব' বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

ভোজ্যোৎসর্গঃ—অভিষেক-কর্ম্মের অভ্যুদয়-কামনায় অন্নজল বস্ত্রাদি সমন্বিত ভোজ্য সম্মুখে রাখিয়া, শিষ্য বাম হস্ত চিৎ করিয়া তাহা স্পর্শপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে কুশাদির দ্বারা জলের ছিটা দিয়া নিম্নলিখিতরূপে 'ভোজ্য অর্চ্চনা' করিবে। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যেভ্যো

নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ব্রাহ্মণাদিভ্যো নমঃ"।

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভোজ্য-উৎসর্গ করিবে :—"ওঁ তৎসৎ হ্রীঁ অদ্য অমুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে, অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক (শিষ্যের গোত্র ও নাম বলিয়া, স্ত্রী হইলে গোত্রায়াঃ বলিবে) শুভ শাক্ত (তথা পূর্ণাভিষেক) কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতু * অমুক দেবশর্ম্মনঃ (পিতার নাম বলিয়া) অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মনঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেব শর্ম্মনঃ, অমুক গোত্রস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মনঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মনঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মনঃ অক্ষয় স্বর্গ তথা শ্রীভগবতী প্রীতিকামঃ ইদং সঘৃত-সোপকরণ-অন্নজলবস্ত্রাদি-সহিতং ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মনায়াহং দদানি।

তাহার পর দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—"ওঁ তৎসৎ হ্রীঁ অদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মনঃ শ্রীভগবতী প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যদানকর্ম্মনঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং ('হরীতকী ফলং, 'বিল্বপত্রং' বা 'পুষ্পং' যেমন হইবে, তাহা বলিয়া) শ্রীবিষ্ণু দৈবতং অহং সম্প্রদদে।"

* পিতৃ ও মাতৃপক্ষে যাহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিবে না। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কৃতশ্রাদ্ধপিণ্ড সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারও নাম উল্লেখ করিবে না।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—"ওঁ কৃতৈতৎ সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যদান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" (গুরুদেব বলিবেন) "ওঁ অস্তু।"

স্নান ৪—পরদিন প্রাতঃকালে বা সেই দিবসে হইলে অধিবাসান্তে সর্ব্বৌষধিজলে বা অগুরুজলে "ওঁ প্রলেতোহখিল সিদ্ধিদায়িন্যৈ" এই মন্ত্রে শিষ্যকে স্নান করাইবে। পরে অন্যান্য নিত্যক্রিয়া সমাপন করিবে।

জগদম্বার পূজা :— এই সময়ে, পরে বা সর্ব্বাগ্রেই সুবিধামত মায়ের পূজা করিবে। 'পূজাপ্রদীপে' পূজার বিধি ও রহস্য দেখিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবে। প্রত্যেক সাধকেরই তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও একাগ্রভাবে অভ্যাস করা বিধেয়। বাহ্যপূজাই সাধকের অন্তর শক্তির পরিপুষ্টি আনয়ন করে। 'ঘটস্থাপনা' পরে দেখ।

দীক্ষাদাতা গুরু এই বার সাধনাভিলাষী শিষ্যের জন্মাবধি-কৃত সর্ব্ববিধ পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের জন্য তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করাইবেন। ইহাই প্রকৃত গুরুর কর্ম্ম। শিষ্যের বিত্ত বা অর্থাদিগ্রাহী গুরুই অধিক, কিন্তু শিষ্যের তাপ বা পাপপুঞ্জ কেহই লইতে চান না। সংসারে যাহারা পরমাত্মীয় বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, তাহারাও পাপের ভাগী হইতে চায় না। সকলেই সুখের ও সম্পদের ভাগী হইতে আশা করে। শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকির 'গার্হস্থ্য-জীবনের আখ্যায়িকা মধ্যে' সে কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত আছে। কেবল যথার্থ গুরুই এই সময় তাহা গ্রহণ করিয়া শিষ্যকে পাপমুক্ত করেন। সেই জন্ম জন্মান্তরের অশেষ পাপরাশির ক্ষয়ের জন্য তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবার কেমন অপূর্ব্ব মন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত আছে। পূর্ব্ববর্ণিত ভোজ্য-অর্চ্চনা করিবার ন্যায়ই বলিতে হইবে যথা :—'এতে গন্ধ-

পুষ্পে ওঁ কাঞ্চনসহিতায় তিলেভ্যো নমঃ, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ নমঃ'। "ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা আজন্মকৃত জ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষ দুষ্কৃতিপুঞ্জ ক্ষয়কামঃ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় (ব্রহ্মজ্ঞকৌল হইলে, 'পরব্রহ্ম গোত্রঃ শ্রীমৎ স্বামী অমুকানন্দনাথ ব্রহ্মজ্ঞ কৌলায়' বলিবে) দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানাহং সমুৎসৃজে" বলিয়া উহা গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিবে।

পুনরায় এইরূপ বাক্য রচনা করিয়াই ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণান্তের ন্যায় তিল-কাঞ্চনের দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। তাহার পর গায়ত্রীমন্ত্র জপের সংকল্প করিবে। তাহাও ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়, অর্থাৎ "ওঁ তৎসদ্ ইত্যাদি, ... আজন্মকৃত জ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষ দুষ্কৃতিক্ষয়কামঃ (অষ্টোত্তর শতসংখ্যক) গায়ত্রী-জপমহং করিষ্যে।" অনন্তর যথাবিধি গায়ত্রী-জপ সমাপ্ত হইলে, উপস্থিত কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত ভোজ্য-উৎসর্গ করিবে। এতদুদ্দেশেও পূর্ব্বোক্ত উৎসর্গ-মন্ত্রানুসারে সমস্তই বলিবে, কেবল "আজন্মকৃত হইতে............ ক্ষয়কামঃ" এই অংশের পরিবর্ত্তে "কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ" এই বাক্য বলিয়া সংকল্পপূর্ব্বক উক্ত তিল কাঞ্চন উৎসর্গের ন্যায় কৌলদিগকে ভোজ্য উৎসর্গ করিলেও পূর্ব্ববৎ যথারীতি দক্ষিণান্ত করিবে। এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, অথবা পূর্ব্বাহেই সুবিধামত গুরুদেব অভিষেক-ঘট স্থাপনা করিবেন।

'ঘটের পরিমাণাদি'-বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে :—

"নাতি হ্রস্বং নাতি দীর্ঘং স্বর্ণ-রৌপ্য বিনির্ম্মিতং।"

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে :—

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ।
চতুরাঙ্গুলাকং কণ্ঠঞ্চ মুখন্তস্য ষড়ঙ্গুলম্।
পঞ্চাঙ্গুলিপ্রমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্ম্মিতৌ॥
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্।
পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্॥
কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

ভাবার্থ:—অভিষেক-ঘট অধিক উচ্চ বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়া উচিত নহে। ইহা স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি নির্ম্মিত হইবে। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ইহার বিস্তার বা বেড় ৩৬ আঙ্গুল বা প্রায় দেড়হস্ত পরিমাণ হইবে, উচ্চে ষোল অঙ্গুলি, কণ্ঠের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশের পরিমাণ পাঁচ অঙ্গুলি হইবে। এই কলস অবস্থা ও ক্রিয়া অনুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাঁসা, মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাচ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহার কোনও স্থল ভগ্ন বা কোথাও ছিদ্র থাকিবে না। দেবতার প্রীতির জন্যই এই কলস বা ঘট প্রস্তুত করাইবে। তবে অবস্থা অনুসারে কোনরূপ ব্যয়শাঠ্য করিবে না।

তন্ত্র মধ্যে এই সকল কলসের গুণাগুণ সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে—

"সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্।
তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্যজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি।
মৃণ্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্॥"

স্বর্ণ-কলস—ভোগ প্রদান করে; রজত-কলস—মোক্ষ প্রদান করে; তাম্র-কলসে—চিত্তের প্রীতিবৃদ্ধি হয়; কাংস্য-নির্ম্মিত-কলসে—পুষ্টিবৃদ্ধি হয়, কাচ-নির্ম্মিত-কলস—বশীকরণ-কার্য্যে

প্রশস্ত; প্রস্তর-কলস—স্তম্ভন-কার্য্যের উপযোগী, মৃণ্ময়-কলস—সকল কার্য্যেই প্রশস্ত হইতে পারে। পরন্তু যে কার্য্যের জন্য অথবা যে কোনও উপাদানেই কলস প্রস্তুত করিয়া লওয়া হউক না, উহা সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। গুরু-পরম্পরায় সাধারণ গৃহস্থ-সাধারণের জন্য তাম্র-কলসই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীর উপদেশক্রমে তাম্রের পরিবর্ত্তে পিতলের কলস-ও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে তাহারও অভাব হইলে, মৃণ্ময়-কলসেরই ব্যবহার সকলকার্য্যেই হইয়া থাকে।

এই অভিষেক-কলস, মঠস্থিত আসন-বেদিকার উপর স্থাপন করিবার বিধান আছে। অন্যত্র অভিষেকস্থলে চারি অঙ্গুলি উচ্চ, দীর্ঘ ও প্রস্থে দেড় হস্ত পরিমাণ বিশিষ্ট একটী বেদী রচনা করিয়া তাহারই উপর একখানি প্রশস্ত তাম্র-পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক সেই পাত্রের উপর অভিষেক-ঘট বা কলস রক্ষা করিতে হয়। অধিকাংশ আনন্দমঠে যন্ত্রাঙ্কিত তাম্রাদি-পাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যথা বেদীর উপর পীত, কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও শ্যামলাদি পঞ্চবর্ণের গুণ্ডি বা গুঁড়ির দ্বারা সুমনোহর 'সর্ব্বতোভদ্র- মণ্ডল' * যথাবিধি রচনা ও অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত তাম্র-পাত্রসহ সেই অভিষেক-কলস তাহার উপর স্থাপন করিবে। কলসের উপর 'শ্রীঁ বীজ' পাঠ করিয়া নিম্নমুখী ত্রিকোণাকার সিন্দূর-চিহ্ন অঙ্কন করিবে ও সেই চিহ্নের মধ্যে দক্ষিণকালিকার মূল বীজ লিখিয়া দিবে।

* 'পূজাপ্রদীপে'—২০২ পৃষ্ঠায় 'সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের' চিত্রাদি দেখ।

"রুদ্রযামল" তন্ত্রে লিখিত আছে :—

"যত্র যত্র মহাবিদ্যা ভবত্যেব উপাসিতা।
তত্র তত্র ত্রিকোণঞ্চ অধোমুখমুদীরিতম্ ॥
দেব-ত্রিকোণে কর্ত্তব্যং উর্দ্ধাস্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥"

অর্থাৎ যে যে স্থানে দেবীর আরাধনা করিতে হইবে, সেই সেই স্থানেই অধোমুখে ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত করিবে, দেব বা পুংদেবতার অর্চ্চনাকালে উর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কন করা বিধেয়: 'পূজাপ্রদীপে'—"সগুণ-ব্রহ্মবস্তু কি" অংশে (১৫১ পৃষ্ঠা হইতে) বিস্তৃত তাৎপর্য্য দেখ।

দধি এবং অক্ষত দ্বারা কলস-গাত্র চর্চ্চিত করিবে। অনন্তর অনুলোমভাবে ক্ষ-কারাদি অ-কার পর্য্যন্ত একপঞ্চাশত মাতৃকা বর্ণ-মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া 'কারণবারি' বা 'তীর্থতোয়' অথবা যে কোনও নির্ম্মল সলিলদ্বারা সেই ঘট পূর্ণ করিবে। কারণবারি বা তীর্থতোয়াদি সম্বন্ধে সত্ত্বরজাদি-গুণযুক্ত ভাব-ভেদে যে মঠের যেমন বিধান প্রচলিত আছে, অভিষেকদাতা অভিজ্ঞগুরু সেইরূপই করিবেন, তবে অতিবৃদ্ধ-ব্রহ্মানন্দদেব-প্রবর্ত্তিত সিদ্ধ সাত্ত্বিক বা দিব্যভাবযুক্ত উচ্চাধিকারের মঠগুলির মধ্যে কুত্রাপি স্থূল কারণ-বারির ব্যবহার নাই। যে কোনও নির্ম্মল জলেই কলস পূর্ণ করিয়া, একত্র ঘর্ষিত রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, অগুরু, কর্পূর, কেশর বা জাফরাণ ও গোরোচনা এই পঞ্চতত্ত্ব ও বিশুদ্ধ গন্ধাদি প্রক্ষেপ প্রদানে সূক্ষ্ম কারণ বা মন্ত্রপূত সিদ্ধসলিল প্রস্তুত করিয়া লইবে। সুবিধা হইলে তন্ত্র-বিধি অনুসারে নিম্নলিখিত গন্ধাষ্টকও সেই কলস-মধ্যে নিক্ষেপ করিবার নিয়ম আছে।

'সারদাতিলকে' লিখিত আছে, গন্ধাষ্টক সাধারণতঃ ত্রিবিধ। শক্তি বিষ্ণু ও শিব-মন্ত্রের অভিষেকানুসারে তাহা স্বতন্ত্ররূপেই প্রযুজ্য হইয়া থাকে।

"গন্ধাষ্টকং ত্রিবিধং শক্তি বিষ্ণু শিবাত্মকং।"

"চন্দনাগুরু কর্পূর চোর কুঙ্কুম রোচনাঃ।

জটামাংসী কপিযুতা শক্তের্গন্ধাষ্টকং বিদু॥"

অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কর্পূর, রক্তচন্দন (কৃষ্ণশঠী), কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গেঁঠেলা বা-লাক্ষা এই অষ্টবিধ দ্রব্য শক্তি-গন্ধাষ্টক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"চন্দনাগুরু কর্পূর তমাল-জল কুঙ্কুমং।

কুশীতং কুষ্ঠসংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্টকং স্মৃতং॥"

অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কর্পূর, তমাল, বালা, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, কুড় এই অষ্টবিধ দ্রব্য শিব-গন্ধাষ্টক বলিয়া উক্ত আছে।

"চন্দনাগুরু হ্রীবের কুষ্ঠকুঙ্কুম সেব্যকাঃ।

জটামাংসী মুরমিতি বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং স্মৃতং॥"

অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কুম, শ্বেতবেণার মূল, জটামাংসী ও দেবদারু এই অষ্টদ্রব্য বিষ্ণুগন্ধাষ্টক বলিয়া পরিচিত। গুরুদেব শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা ও অবস্থা বুঝিয়া দেয় মন্ত্রানুসারে এই সকল বিধির যথাসম্ভব অবলম্বন করিবেন।

অনন্তর এই কলসমধ্যে নবরত্ন * (অভাবে পঞ্চরত্ন, তদভাবে অন্যূন এক তোলা স্বর্ণ, তাহারও অভাব হইলে, কেবল আতপ-

* নবরত্ন যথা :—মুক্তা, মাণিক্য বা চুনী, নীলকান্তমণি বা নীলা, গোমেদ, হীরক, প্রবাল, পদ্মরাগ, মরকত বা পান্না ও ইন্দ্রনীলমণি।

পঞ্চরত্ন যথা :—মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্য।

চাউল) নিক্ষেপ করিবে। 'ঐঁ' বীজ উচ্চারণ করিয়া কলসমুখে আম, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট ও বকুল এই পঞ্চপল্লব প্রদান করিবে, ('পূজাপ্রদীপের' ২০৩ পৃষ্ঠায় পল্লবাদি বিষয় দেখ)। এবং 'শ্রীঁ হ্রীঁ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপতণ্ডুল ও স-শিষ্ নারিকেল ফল-সমন্বিত স্বর্ণ, রজত, তাম্র নির্ম্মিত অথবা মৃণ্ময় শরাব পল্লবোপরি রক্ষা করিবে। অপরাজিতালতা ও রক্তবস্ত্র চেলি বা লালকাপড় শাড়ী (অভাবে রক্তসূত্র) দ্বারা কলস আচ্ছাদন ও কলসকণ্ঠ বন্ধন করিয়া দিবে। বিষ্ণুমন্ত্রে বা শিবমন্ত্রে অভিষেক করিতে হইলে, ক্ষৌমাদি শ্বেতবস্ত্রে অভিষেকঘট বন্ধন করা বিধেয়। এবং ঘটে তদনুরূপ পূর্ব্বকথিত ভাবে সিন্দুর-চিহ্নাদি ও দেবতার বীজ লিখিয়া দিবে।

এই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে, "স্থাং স্থীং স্থুং শ্রীং স্থিরীভব" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঘট স্থিরীকৃত করিবে। ('পূজাপ্রদীপে' ইহার বিস্তৃত ক্রিয়া-বিধান দেখ।)

নবপাত্র স্থাপনা—তন্ত্রে এই পাত্র-স্থাপনার বিশেষ বিধান আছে—১। 'শক্তিপাত্র'--রজত নির্ম্মিত, ২। 'গুরুপাত্র'--স্বর্ণ-নির্ম্মিত, ৩। 'শ্রীপাত্র'—মহাশঙ্খ বা নরকপাল দ্বারা নির্ম্মিত, ৪। 'যোগিনী-পাত্র', ৫। 'বীরপাত্র', ৬। 'পাদ্যপাত্র', ৭। 'ভোগপাত্র', ৮। 'বলি-পাত্র' এবং ৯। 'আচমনীপাত্র' তাম্র-নির্ম্মিত করিতে হইবে। পাষাণ, কাষ্ঠ ও লৌহ-নির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া সামর্থ্যা-নুসারে অন্য যে কোনও পাত্র দ্বারা এই অর্চ্চনা করা যাইতে পারে। অধুনা প্রায় সকল মঠেই গুরু-পরম্পরাপ্রবর্ত্তিত তাম্র-পাত্রেরই (অভাবে পিত্তলের পাত্রের) ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নয়টী তাম্রপাত্রেই পূর্ব্বমিশ্রিত চন্দন ও গোরোচনাদি

গন্ধাতন্ত্বগুলি জলসহ মিশ্রিত করিয়া পূর্ণ করিয়া দিবে। এইরূপ বিধানে নয়টী পাত্র স্থাপিত হইলে, অভিষেক-ঘটের চারিধারে তাহা মণ্ডলাকারে সাজাইয়া দিবে। কোন কোনও মঠে ইহাতে 'বিজয়া' দিবারও বিধি আছে। এই নব-পাত্রের প্রত্যেকটীতে একটী করিয়া রজত মুদ্রা ও যন্ত্রপুষ্প রাখিয়া দিবে। অনন্তর প্রত্যেক পাত্রে গুরুগণের ও ভগবতীর তর্পণ করিবে।

গুরু-চতুষ্টয়ের তর্পণ যথা :—

ঐঁ সশক্তিক-গুরু শ্রীমদ্‌অমুকানন্দনাথ অমুকী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ সশক্তিক-পরমগুরু শ্রীমদ্‌অমুকানন্দনাথ অমুকী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ সশক্তিক-পরাপরগুরু শ্রীমদ্‌অমুকানন্দনাথ অমুকী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ সশক্তিক-পরমেষ্ঠিগুরু শ্রীমদ্‌-অমুকানন্দনাথ অমুকী দেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। *

শ্রীশ্রীভগবতীর তর্পণ যথা :—

"ক্রীঁ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। ক্রীঁ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা-ষড়ঙ্গ-দেবতা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। ক্রীঁ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাবরণ-দেবতা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।"

এতদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র 'ঋষিতর্পণ', 'আবরণতর্পণ', 'পঞ্চদশ-

* পূর্ব্বোক্ত বিধানুসারে যাঁহারা একান্ত গুরুর অভাবে, যে কোনও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সহায়তায় স্বয়ং অভিষেকানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা 'সচ্চিদানন্দাদি' যথানাম গুরুচতুষ্টয়ের তর্পণ করিবেন। 'পূজাপ্রদীপে' (৪৮ পৃষ্ঠায়) সিদ্ধৌঘ গুরুদেবগণের ১৬শ সংখ্যক গুরু হইতে যথাক্রমে পরমগুরুর, পরাপরগুরুর ও পরমেষ্ঠিগুরুর নাম দেখ।

যোগিনীতর্পণ', 'অষ্টশক্তিতর্পণ', 'সাধারণ-দশদিকপালতর্পণ' 'ষড়ঙ্গতর্পণ', 'অস্ত্রাদিতর্পণ' ও 'ভৈরবতর্পণ' করিবার বিধি আছে। ('পূজাপ্রদীপে' দেখ)।

অভিষেক-কলসে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিবে। মন্ত্র যথা :—"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।

সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ জলদানদাঃ ॥
হ্রদা প্রস্রবণা পুণ্যাঃ স্বঃ পাতাল মহীগতাঃ।
সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং ॥"

অনন্তর অভিষেক-কলসে—('পূজাপ্রদীপে' বর্ণিত বিধি অনুসারে) মন্ত্র ও দেবতার আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, কুম্ভে দেবমূর্ত্তি কল্পনা করিবে ও দেবতার ধ্যান ও যথাবিধি পূজা করিবে।* তৎপরে স্তুতিপাঠ ও নমস্কার করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে।

পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত গণেশঘটে গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকার পূজা করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই ঘটে পঞ্চদেবতারও পূজা হয় এবং অভিষেকান্তে পঞ্চদেবতার বিসর্জ্জনও এই ঘটেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সকল অনুষ্ঠান সমাধা হইলে, অভিষেকাভিলাষী শিষ্য, গুরুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ভাবে করযোড়ে † প্রার্থনা করিবে :—

* 'পূজাপ্রদীপ' দেখ

† কোনও মঠে অভিষেক কার্য্য হইলে, যে কোনও সাধক তাহার হস্ত-ধারণ করিয়া চক্রেশ্বরগুরু মহারাজের সম্মুখে আনয়ন করিয়া বলিবেন—"কৌলমণ্ডলি-পরিশোভিত মহাকৌল চক্রেশ্বরায় নমঃ" উভয়ে প্রণাম করিবেন। পরে সেই সাধক চক্রেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—"নক্তমদ্য মহানিশায়াং অস্মাৎ স্নেহাস্পদ

শিষ্যের প্রার্থনা :—

"ত্রাহি নাথ কুলাচার-নলিনীকুলবল্লভ।
তৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে।
আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভ (শাক্ত) পূর্ণাভিষেচনে।
নির্ব্বিঘ্নঃ কর্ম্মণঃ সিদ্ধিম্ উপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ॥"

অর্থাৎ—নাথ, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের প্রভাকরস্বরূপ। হে কৃপানিধে, এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার মস্তকে ভবদীয় চরণ-কমলের ছায়া প্রদান করুন। মহাভাগ, আমার শুভ 'শাক্ত' তথা পূর্ণাভিষেক'-বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি যেন আপনার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে সাধন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি।

গুরুর আশ্রয় ও আজ্ঞাদান। গুরুদেব বলিবেন :—

"শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস! কুরু (শাক্ত) পূর্ণাভিষেচনম্।
মনোরথময়ী সিদ্ধি জায়তাং শিবশাসনাৎ॥"

অর্থাৎ—বৎস, তুমি শিবচ্ছক্তির আজ্ঞানুসারে শুভ 'শাক্ত' তথা 'পূর্ণাভিষেকে' অভিষিক্ত হও। শ্রীশ্রীভগবান মহেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।

শিষ্য গুরুর নিকট এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব-

স্বধর্ম্মপরায়ণ সাধনাভিলাষী শ্রীমান্ অমুক শর্ম্মা অতীব দীনভাবেন ভবদীয় চরণ-কমলসমীপে আশ্রয়-লাভার্থং উপস্থিতোঽভূৎ। প্রভো, কৃপাদান-প্রদানেন অস্য মনোরথং পূরয় ভবান্।"

চক্রেশ্বর শ্রীগুরুদেব বলিবেন—"তথাস্তু"

অনন্তর সেই ব্যক্তি করযোড়ে—"ত্রাহিনাথ ইত্যাদি" মূলে বর্ণিত প্রার্থনাবাক্য বলিবে।

শক্তি, আয়ু, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্যাদি শিবত্বলাভের নিমিত্ত সংকল্প করিবে। শিষ্য উত্তরমুখে দক্ষিণ জানু পাতিয়া বসিয়া কোশায় জল, তিল, হরীতকী, কুশ, দূর্ব্বা, তুলসী ও বিল্বপত্র আদি লইয়া, বাম হস্ত-তলের মধ্যে তাহা রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সংকল্প-মন্ত্র পাঠ করিবে।

অভিষেক-সংকল্প-মন্ত্র যথা :—

"ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (স্বপত্নী সহিত) বা অমুকী দেবী (স্বপতি সহিতা) সর্ব্বোপদ্রবশান্তি-সর্ব্বরোগ-নিবারণ-ধনকীর্ত্ত্যায়ুর্বৃদ্ধি-সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রাপ্তি, অসৌ-ভাগ্য প্রশমন-সর্ব্বপাতকাপনয়ন-সর্ব্বাশাপূরণ-মন্ত্রদোষনিবারণ-সর্ব্বার্থসাধন-সর্ব্ব-তীর্থফলাব্যাপ্তি-শত্রুকৃত--অভিচারপ্রশমন-সর্ব্ব-গ্রহদোষনিবারণ--ভূতরোগাদিশমন-ডাকিন্যাদিভয়বিধ্বংসন--বিষাদিকৃতদোষখণ্ডন--স্ত্রীকৃতাদিদোষশান্তি-নিদান (কুলদীক্ষাশ্রবণ) (পাদুকামন্ত্রগ্রহণ,) (দশার্ণমন্ত্রশ্রবণ,) (দণ্ডকমণ্ডলুধারণ,) ব্রহ্মমন্ত্রগ্রহণদ্বারা (সর্ব্বমন্ত্রো-পদেশকত্বরূপ সদ্গুরুত্ব,) সর্ব্বমন্ত্র-জপাধিকারিত্ব-সর্ব্বাপচ্ছান্তি সর্ব্ব-বিজয়-পরমৈশ্বর্য্য-পরদৈবত-মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি--ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-শিবত্ব--সিদ্ধৈ গুপ্তাবধূত (অথবা "প্রকটাবধূত") ভাবেন কৌলধর্ম্মাশ্রয়ার্থং গুরুদ্বারা (কৌলদ্বারা) মৎকর্ত্তব্য শুভ-(শাক্ত বা) পূর্ণাভিষেকা-ভিভূত (শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাদেবতা-মন্ত্রদ্বারা) অথবা অমুক দেবতা অমুক মন্ত্রদ্বারা ("ওঁ রাজরাজেশ্বরী শক্তি" ইত্যাদি তন্ত্রোক্ত-মন্ত্রদ্বারা, অথবা "ওঁ তারিণী কালিকা চণ্ডা মহাচণ্ডা মহৎসুকা" ইত্যাদি নিগমলতাদ্যুক্ত-মন্ত্রদ্বারা, কিম্বা "ওঁ গুরুস্ত্বাভি-ষিঞ্চন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরা" ইত্যাদি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত-মন্ত্রদ্বারা)

শ্রীমৎ দক্ষিণকালিকা অথবা অমুক দেবতার্চ্চিত ঘটস্থ (কুলদ্রব্যেণ) মন্ত্রপুত-সিদ্ধসলিলেন (শাক্ত বা) পূর্ণাভিষেক কর্ম্মাহং করিষ্যে।"

ইহার পর ঈশানকোণে সেই কোশার বা সঙ্কল্পপাত্রের সামান্য জল ফেলিয়া কোশাটী বা সেই পাত্রটী অন্য কোন পাত্রের উপর উপুড় করিয়া রাখিবে ও তাহার উপর কয়েকটী আতপ চাউল দিয়া হাতযোড় করিয়া বলিবে—'ওঁ সঙ্কল্পিতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি সিদ্ধিরস্তু'। গুরুদেব বলিবেন—'ওঁ অস্তু'।

শিষ্য—'ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু'। গুরু—'ওঁ ভবতু'।

অনন্তর কৃতসঙ্কল্প সাধক নিম্নলিখিত মন্ত্রে গুরুর অর্চ্চনা করিয়া **গুরুবরণ** করিবে। গুরু,—উত্তর মুখে বসিলে, শিষ্য—পূর্ব্বমুখ হইয়া করযোড়ে বলিবে—

শিষ্য বলিবে ... "ওঁ সাধুভবানাস্তাং"
গুরু বলিবেন ... "ওঁ সাধ্বহমাসে।"
শিষ্য বলিবে ... "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।"
গুরু বলিবেন ... "ওঁ অর্চ্চয়।"

পরে শিষ্য, গন্ধপুষ্প, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও অলঙ্কারাদি যথাশক্তি অর্চ্চনীয় উপকরণসমূহ গুরুদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া—গুরুর দক্ষিণ জানুর উপর আতপ চাউল রাখিবে ও বাম হস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্তে তাহা ধারণপূর্ব্বক বলিবে—"ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রী হইলে 'অমুকী দেবী' বলিবে) মৎসঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধয়ে। অমুক মন্ত্র (শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা-মন্ত্র বা যে মন্ত্রের দীক্ষা হইবে, তাহা বলিবে) দ্বারা (অমুক দেবতার্চ্চিত বা যে দেবতা হইবে তাহা বলিবে) ঘটস্থকুলদ্রব্যেণ (মন্ত্রপূত-সিদ্ধসলিলেন) শুভ

(শাক্ত অথবা) পূর্ণাভিষেকার্থং পরব্রহ্ম গোত্রং সশক্তিক শ্রীঅমুকা-নন্দনাথ ভবন্তং গুরুত্বেন অহং বৃণে।"

গুরুদেব বলিবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি।"

শিষ্য বলিবে "ওঁ যথাবিহিত গুরুকর্ম্ম কুরু।"

গুরু বলিবেন "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।"

অনন্তর গুরুদেব দেয় মন্ত্রের সংস্কার * করিয়া দিবেন। (কাল্যাদি সিদ্ধ-মন্ত্রের সংস্কার করিতে হয় না।)

এইবার গুরুদেব শিষ্যের নেত্রদ্বয় 'বৌষট' মন্ত্রে রক্ত-বস্ত্রদ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিবেন ও পুষ্পদ্বারা শিষ্যের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দেবতার প্রীত্যর্থে নিজ-মূল মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সেই কলসমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইবেন।

অতঃপর শিষ্যের হৃদয়ে ত্রিশূল (অভাবে অন্য কোন শস্ত্র) স্পর্শ করাইয়া গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিবেন:—

"কিং বৎস! তে হৃদি ন্যস্তং কথ্যতামনুভূয়তে?"

"বৎস! তোমার হৃদয়ের উপর ইহা কি অনুভব করিতেছ?"

শিষ্য (অনুভব করিয়া) বলিবে—

"শানিতং শস্ত্রমেতদ্ধি হৃদি ন্যস্তং মম প্রভো।"

"হে প্রভো! ইহা একটী শানিত শস্ত্র আমার হৃদয়ের উপর রক্ষিত হইয়াছে।"

গুরুদেব বলিবেন—

"অনেন তীক্ষ্ণশস্ত্রেণ ভেৎস্যামি হৃদয়ং তব।"

"ইহাদ্বারা আজ তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব।"

* 'পুরশ্চরণ প্রদীপে'—'মন্ত্রের সংস্কার' দেখ।

ব্রহ্মজ্ঞ কৌলগুরুর এইরূপ আদেশ শুনিয়া দৃঢ়চিত্ত শিষ্য অসঙ্কোচে বলিবে—

" এতন্নিবেদিতং পূর্ব্বং হৃদয়ং তে কৃপানিধে।
যথেষ্টং ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ কৌলসংসচ্ছিরোমণে॥"

"প্রভো, এ হৃদয় আপনারই, হে কৃপানিধে! ইহার আপনি যথাইচ্ছা করিতে পারেন।"

গুরুদেব তখন সস্নেহে বলিবেন—

" নাহং ভেৎস্যামি হৃৎপিণ্ডং শস্ত্রেণ নিশিতেন তু।
ভিত্ত্বা দৈবেন তে বৎস বীজং পরমদুর্লভম্।
বপামি হৃদয়ে শ্রীমান্ গুহ্যাতিগুহ্যমেব চ॥
প্রযত্নশ্চ প্রকর্ত্তব্য স্তদ্‌বীজস্যাঙ্কুরায়ণে।
অপ্রমত্তেন কর্ত্তব্যা নোপেক্ষা চ কদাচন॥"

"বৎস, তবে এ লৌহ-শস্ত্রে তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব না, তোমার হৃদ্‌পিণ্ড দৈবশস্ত্রেই বিদ্ধ করিয়া আজ যে পরম গুহ্যবীজ তাহাতে প্রদান করিব, দেখিও বৎস, সাধ্যমত তাহার উদ্গমের প্রয়াস পাইবে, কোন মতে তাহার অপব্যবহার করিবে না। কেমন সম্মত আছ ত?"

শিষ্য বলিবে—

" আদেশো মে শিরোধার্য্যঃ কৃপাং কুরু কৃপানিধে!।
ভবৎপাদাম্বুজচ্ছায়া মাশ্রিতোঽহং নিরাশ্রয়ঃ।
রক্ষ মাং কৃপয়া ব্রহ্মন্ শিষ্যস্তেঽহং প্রসাধিমাম্॥"

"আপনার অনুমতি আমার শিরোধার্য্য, কৃপানিধে আমি আপনার একান্ত আশ্রিত শিষ্য, আমায় রক্ষা করুন।"

গুরুদেব বলিবেন—

" যং বিশ্বাসমুপাশ্রিত্য আয়াতোঽত্র হিতেচ্ছয়া।
রক্ষ তং সর্ব্বথা বৎস! শ্রেয়ো নূনমবাপ্স্যসি॥
মহামায়াভিধা যা তু যা জগজ্জননী পরা।
কৈবল্যদায়িনী সাক্ষাৎ সগুণা ত্রিগুণাতীতা।
যৎপদাম্ভোরুহচ্ছায়া মধিগন্তু মিহাগতঃ।
পদপঙ্কজমাহাত্ম্যং যস্যা দেবৈঃ সুদুর্ল্লভম্।
তত্তত্ত্বং পরমং গুহ্যং রত্নন্তু পরমাদ্ভুতম্।
কোষাগারে সুগুপ্তে তু রক্ষিতং শঙ্করাশ্রিতে।
সাধানং মন্ত্রযোগস্য তন্ত্রমার্গস্তদুচ্যতে॥
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈতত্রিশূলং ত্রিগুণাত্মকম্।
তস্যৈব শিবকোষস্য কুঞ্চিকা কথিতা বুধৈঃ॥
ইতঃ পূর্ব্বং হি তস্যৈব স্থূলতত্ত্বং সুরক্ষিতম্।
হৃৎপিণ্ডোপরি তে বৎস! জ্ঞাতুং ভাবং মনোগতম্॥
সূক্ষ্মতত্ত্বন্তু তস্যৈবাধুনা ন্যাস্যামি তে হৃদি॥
তেনৈব তন্মহাকোষং হৃৎপদ্মস্থং সুগোপিতম্।
উন্মুক্তঞ্চ নিবদ্ধঞ্চ করিষ্যসি নিজেচ্ছয়া॥
সংস্মর্ত্তব্যং সদা বৎস! জন্ম চেদং নবং শুভম্।
বিস্মর্ত্তব্যং নৈতদঙ্কং জীবননাটকস্য তে॥
অযথাব্যবহারশ্চ ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
এতস্য গুপ্তরত্নস্য দুর্ল্লভস্য জগত্রয়ে॥
অযথাব্যবহারঞ্চেৎ কুর্য্যাঃ প্রমাদমাশ্রিতঃ।
ছিন্নং ভিন্নং ভবেৎ সর্ব্বং সাধনং শিবকোপতঃ॥ "

"দেখো বাবা, আজ যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এখানে উপস্থিত

হইয়াছ, যে জগজ্জননী মহামায়ার চরণ-ছায়া-মাহাত্ম্য লাভেচ্ছায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছ; সেই রত্ন-শ্রেষ্ঠ অমূল্য-নিধি শঙ্করাশ্রিত যে গুপ্ত-ভাণ্ডারে আবদ্ধ আছে, তাহাই মন্ত্রযোগ-সাধন বা এই প্রাবেশিক "তন্ত্রমার্গ"। স্মরণ রেখো, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ সেই ত্রিগুণাশ্রিত এই অলৌকিক ত্রিশূলই সেই শিবভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিবার 'কুঞ্জি' বা চাবিস্বরূপ। তোমার হৃদ্পিণ্ডের সম্মুখে তাহাই স্থূলভাবে ইতঃপূর্ব্বে রক্ষিত হইয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে তাহারই যে সূক্ষ্মতত্ত্ব এক্ষণে রক্ষিত হইতেছে, ইহা দ্বারাই তোমার হৃদ্মধ্যস্থিত সেই মহাভাণ্ডার ইচ্ছামত উন্মুক্ত ও আবদ্ধ করিতে পারিবে। সুতরাং ইহাকে কখনও বিস্মৃত হইও না, তোমার জীবন-নাটকের এই অপূর্ব্ব সময় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। যদি কখন ইহার অপব্যবহার কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, শিব-কোপানলে তোমার সাধন-রাজ্য একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, ইহা শূলপাণি ভগবান্ শঙ্করের মহাপ্রলয়ের সিদ্ধমন্ত্র। খুব সাবধানে এই গুপ্তরত্নের ব্যবহার করিও, কখনও অবহেলা করিও না।"

'আর এই দেখ' বলিয়া, শিষ্যের হস্তে গুরুদেব একটী নরকপাল প্রদান করিবেন। (অভাবে নরকপালের বা শুষ্ক 'মড়ার মাথা'র চিন্তা করিতে বলিবেন।) মানবদেহের শীর্ষস্থানের গঠন ও তাহার পরিণতি সম্যক্‌রূপে তখনই বা সময়ান্তরে বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিবেন এবং এই সাধনমার্গের উপদেশ প্রাণপণে সম্পূর্ণ গোপন রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ শিষ্যকে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইবেন। সুবিধা হইলে সেই কপালস্থিত বিজয়া শিষ্যকে স্পর্শ করাইয়া এই দেহান্তরস্থিত জীবের মুক্তি কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ও

বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিবেন। পরে ভৈরবগণের শক্তি ও সাধনাপথে তাঁহাদের উপদ্রব ও সহানুভূতির কথা যথাসম্ভব বলিয়া, সিদ্ধ পাদুকামন্ত্র উচ্চারণদ্বারা তাহাকে পুনরায় তিনবার প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইবেন।

অনন্তর গুরুদেব আরও বলিবেন—

"পাপপূর্ণে মহাঘোরে সংসারেঽস্মিন্ তমোময়ে।
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নো জীবাত্মা তে নিরন্তরম্।
দুঃখময়ভবদ্‌ঘোরং সান্তং তদ্ বিদ্ধি সাম্প্রতম্॥
প্রাক্তনী জীবলীলাচ সান্তা তেঽত্র বিচিন্ত্যতাম্।
নবে দেহে নবান্ প্রাণান্ সঞ্চারয়িতুমাগতঃ॥
উন্মোচ্য নেত্রাবরণং দর্শয়ামি তবানঘ!।
জীবাত্মানং নবীনঞ্চ নবে চাস্মিন্ কলেবরে॥
পূর্ণাভিষেকেনানেন নবোপনয়নং তব।
সম্পাদ্য দীয়তে বৎস! নবদৃষ্টিঃ শুভপ্রদা॥
যথা মার্গং সাধনস্য দ্রষ্টুং শক্ষ্যসি সাম্প্রতম্॥
চন্দনাক্তানি পুষ্পানি বিল্বপত্রানি চানঘ!।
দেবীপ্রীত্যর্থমেতানি প্রদীয়ন্তাং যথাবিধি॥"

"এতদিন তোমার জীবাত্মা সংসারের যে অজ্ঞান-অন্ধকারময় কলুষিত প্রদেশে অবস্থান করিয়া ছিল, আজ তাহার অবসান হইল, এইরূপ চিন্তা কর আজ তোমার সেই পূর্ব্ব জীবন-লীলা সমাপ্ত হইতেছে। যেন তুমি নূতন দেহে নূতন জীবন লাভের জন্যই এই মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়াছ। পূর্ণাভিষেকদ্বারা আজ সেই নূতন জীবাত্মার দর্শনলাভ করিবার জন্য তোমার নয়নের এই আবরণ উন্মোচন করিয়া, আজ তোমার প্রকৃত 'উপনয়ন' সংস্কার

করিয়া দিতেছি। সাধনপথ দেখিবার জন্য আজ হইতে নূতন দৃষ্টি পাইবে।" "এই লও" বলিয়া গুরুদেব পুনরায় কতকগুলি ফুল-বিল্বপত্র সচন্দন করিয়া শিষ্যের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দিবেন, তাহা দেবতার প্রীত্যর্থেই নিজে মূল-মন্ত্র উচ্চারণসহ শিষ্যের দ্বারা সেই ঘটের উপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইবেন। তাহারপর শিষ্যের সেই নেত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দর্ভাসনে তাহাকে বসিতে বলিবেন।

এইবার গুরুদেব ভূতশুদ্ধি করিয়া শিষ্যের দেহে দেবমন্ত্রের ন্যাস করিবেন। অনন্তর শিষ্য পুষ্পচন্দন বা অবস্থানুসারে বস্ত্রালঙ্কার-সহযোগে 'কুমারীপূজা' * (কুমারী উপস্থিত না থাকিলে সেই অভিষেকঘটেই কুমারীপূজা হইতে পারিবে) ও

* কুমারী পূজা—কুমারী অর্থে অবিবাহিতা কন্যা। বয়ঃক্রম অনুসারে কুমারীর ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যথা—একবর্ষা—সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষা—সরস্বতী, তিন বৎসরের কন্যা—ত্রিধামূর্ত্তি, চারি বৎসরের—কালিকা, পাঁচ বৎসরের—সুভগা ৬ বর্ষের—উমা. ৭ বর্ষের—মালিনী, ৮ বর্ষের—কুব্জিকা, ৯ বৎসরের—কালসন্দর্ভা, ১০ বৎসরের—অপরাজিতা, ১১ বৎসরের—রুদ্রাণী, ১২ বৎসরের—ভৈরবী, ১৩ বৎসরের—মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশ বর্ষের—পীঠনায়িকা, ১৫ বৎসরের—ক্ষেত্রজ্ঞা, ১৬ বৎসরের—অম্বিকা। কুমারী ১৬ ষোল বৎসর বয়স্কা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে, কিন্তু যাহাদের ঋতু আরম্ভ হইয়াছে, সেরূপ কন্যাকে কুমারী পূজায় গ্রহণ করা হইবে না। পূজার সময় বয়ঃক্রম অনুসারে কুমারীর নাম উল্লেখ করিতে হয়। যথা,—'সন্ধ্যাকুমারী' 'সরস্বতীকুমারী' ইত্যাদি।

কুমারী পূজাকালে, পূজক পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া কুমারীকে সম্মুখে আসনপরি বসাইবে। আচমন আদি সাধারণ ক্রিয়া করিয়া নিম্নলিখিত রূপে সঙ্কল্প করিবে।

উপস্থিত কৌল বা সাধকগণকে যথাসম্ভব অর্চ্চনা ও প্রণাম করিবে। অতঃপর গুরুদেব কৌলগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন ;—

"অনুগ্রহন্ত কৌলা মে শিষ্যং প্রতি কুলব্রতাঃ।
(শাক্ত বা) পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবন্তিরনুমন্যতাম্॥"

অর্থাৎ হে কুলব্রত কৌলগণ, আমার শিষ্যের প্রতি তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ কর, ইহার (শাক্ত অথবা) পূর্ণাভিষেকসংস্কার-বিষয়ে তোমরা অনুমতি প্রদান কর।

গুরুদেব এইরূপ প্রশ্ন করিলে, কৌলগণ সমাদরে বলিবেন—

"মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ।
শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পরতত্ত্ব পরায়ণঃ॥"

"ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিত দীক্ষাভিষেক কর্ম্মণঃ (বা পূজাদিকর্ম্মণঃ) পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্তিকামঃ-কুমারীপূজা কর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

পূজা "ঐঁ এতজ্জলং ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ, হ্রীঁ এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ, শ্রীঁ ইদমর্ঘ্যং ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ, হ্ৰ্ এস গন্ধঃ ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ, ঐঁ এতৎপুষ্পং ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ, হ্সৌঃ এষঃ ধূপঃ ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ, হ্সৌঃ এষ দীপঃ ওঁ অমুক কুমার্য্যৈ নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ হ্সৌ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ, হৈঁ বৈঁ হৈঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ স্বাহা শিরসে স্বাহা নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ, ঐঁ বাগীশ্বরি কবচায় হুঁ নমঃ। ঐঁ কুলেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ, হ্রীঁ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ, ঐঁ সিদ্ধজয়ায় পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ, ঐঁ জয়ায় উত্তরবক্ত্রায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কুব্জিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ, ঐঁ কালিকে দক্ষবক্ত্রায় নমঃ।"

অনন্তর কুমারীকে বস্ত্রাদি পরাইয়া ভোজন করাইবে ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—"ওঁ এতস্মৈ রজতায় নমঃ, এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" "ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ

অর্থাৎ মহামায়ার প্রসাদে ও পরমাত্মার প্রভাবে, আপনার শিষ্য পূর্ণাভিষেকদ্বারা পরতত্ত্ব-পরায়ণ ও পূর্ণত্ব লাভ করুন। (যদি এমন হয় যে, অভিষেক কালে কোন কৌলসাধক উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে অভিষেক-সাক্ষীস্বরূপ কোন যন্ত্র-পুষ্পে মন্ত্রকৌল কল্পনা করিয়া অথবা ঘটাশ্রিতা কুলেশ্বরী মহামায়াকেই সম্বোধন করিয়া, তাঁহাতে কৌলার্চ্চনা করিবে।)

ঘটে শক্তিসঞ্চার—এই সমস্ত কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হইলে, গুরুদেব পূর্ব্বার্চ্চিত সেই ব্রহ্মকলসে, শিষ্যের দ্বারা মহাশক্তির সংক্ষিপ্তভাবে পূজা করাইয়া স্বয়ং বা উপস্থিত কৌলগণ সহযোগে সেই ব্রহ্মকলসে স্বীয় অথবা সেই সমবেত সাধনশক্তি সঞ্চারিত করিবেন। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে, 'সাধনপ্রদীপে' অষ্টাভিষেকবর্ণনায় অভিষেক-ঘটে শক্তিসঞ্চার-সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথাই উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ স্বয়ং গুরুদেবের অথবা সেই উপস্থিত সাধকগণেরও কিছু কিছু শক্তির সহায়তায় অভিষেক-কলসস্থিত সলিল, শক্তিশালী করিবার এই উপযুক্ত সময়। এই ক্রিয়া-উপলক্ষে গুরুদেব স্বয়ং বা সমাগত সাধকগণ সমভি-ব্যাহারে কলসের সমীপে বা চতুর্দ্দিকে সুবিধামত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃত ভূতশুদ্ধির দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া স্ব স্ব হস্তদ্বয়ের করতলপৃষ্ঠ ঊর্দ্ধদিকে করিয়া উপর্য্যুপরি তির্য্যগ্‌ভাবে

অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিত দীক্ষাভিষেক (পূজাদি) কর্ম্মণঃ পরিপূর্ণফলপ্রাপ্তিকামনয়া কৃতৈতৎ অমুক কুমারী পূজনঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায়ৈ শ্রীমতী অমুক দেব্যৈ অমুক কুমার্য্যৈ তুভ্যং দদানি।"

অচ্ছিদ্রাবধারণ—"ওঁ কৃতৈতৎ কুমারীপূজাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।"

সেই কলসগাত্রে অঙ্গুলাগ্র স্পর্শ করাইয়া রাখিবেন ও মহাশক্তি জগদম্বার চিন্তা করিয়া শিষ্যের মঙ্গলার্থে স্ব স্ব সাধনশক্তির কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিতেছি, এইরূপ ভাবনা করিয়া শ্রীগুরুপাদুকা চিন্তাপূর্ব্বক ঘটাশ্রিত দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিবে। অন্যূন দ্বাদশ পল বা পাঁচমিনিট কাল এইভাবে বসিয়া দৈবীশক্তি (ইংরাজি ভাষায় 'উইল-পাওয়ার') সঞ্চারিত করিবার পর, কলস ছাড়িয়া দিবেন। প্রতি মঠেই গুরুপরম্পরাগত এইরূপ গুপ্তবিধি বা ক্রিয়ানুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। ইহা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার তাহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিগণও সামান্য চিন্তা করিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বাস্তবিক প্রথম হইতে এই কলস-সংস্কারের ব্যাপারে যতগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং পরে আরও যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, সেই সমস্তই গভীর বিজ্ঞান-সম্মত। তড়িৎ-শক্তি-সঞ্চারক বিবিধ ধাতু, রত্ন, ওষধি ও সিদ্ধমন্ত্র-সহযোগে কলসস্থিত অভিষেক-বারির মধ্যে পার্থিব ও অপার্থিব তড়িৎ, বিপুল-জৈব ও দৈবশক্তির যে ভাবে আবির্ভাব হয়, তাহা শিষ্যের পাপমলিন চিত্ত ও দেহশুদ্ধি-কল্পে যে অমোঘ উপায়, একথা প্রাচ্য বা প্রতীচ্য-বিজ্ঞান-দৃষ্টিতেও এক্ষণে আর অভিনব নহে। শাস্ত্রে আছে, অভিষেককালে অভিষেকদাতা গুরুর দেহে সশক্তিক-বিশ্বগুরু বা শিবশক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, সাধনপর-গুরুগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। নিস্তব্ধ বৃহৎ ঘটিকা-যন্ত্রের দোলক (ঘড়ির পেণ্ডুলম্) সামান্য মাত্রও বাহ্য আন্দোলন না পাইলে, যেমন তাহা পূর্ণশক্তি বা দম থাকিতেও স্বয়ং চলিতে পারে না, সাধনাকাঙ্ক্ষী শিষ্যও সেইরূপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম, সাধনা ও যথেষ্ট ভগবদ্‌কৃপা সত্ত্বেও

গুরুর আশীর্ব্বাদ ও তৎকর্ত্তৃক অভিষেকরূপ সাধন-শক্তি-প্রয়োগ * বা দৈবী আন্দোলন ব্যতীত কিছুতেই সাধনমার্গে প্রথমে পদার্পণ করিতে পারিবে না। সেই কারণেই সাধকমণ্ডলীর মধ্যে অভিষেক-প্রথার এত আদর। এই কার্য্যে গুরুর স্বীয় সাধনার্জ্জিত শক্তির কিয়ৎ পরিমাণ অপচয় বা ক্ষয় অবশ্যই হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবান যেমন ভক্তের অধীন, প্রকৃত জ্ঞানবান গুরুও তেমনি একনিষ্ঠ অনুগত শিষ্যের একান্ত ইচ্ছার এক প্রকার অধীন না হইয়া থাকিতে পারেন না, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তখন অর্থাৎ দীক্ষা বা অভিষেক-প্রদানকালে মন্ত্রদাতার শরীরে গুরুত্ব বা ভগবচ্ছক্তি সংক্রমিত হয়, এবং সেই শক্তি তাহার মাধ্যবিকা বা অভিষেকবারির মধ্যদিয়া শিষ্য-শরীরে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাই অভিষেক-সংস্কারের নিগূঢ় রহস্য। তাই বামকেশ্বর ও নিরুত্তর তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন ;—

"অভিষেকং বিনাদেবি কুলকর্ম্ম করোতি যঃ।
তস্যপূজাদিকং কর্ম্ম অভিচারায় কল্পতে।"

অর্থাৎ অভিষিক্ত না হইয়া যে ব্যক্তি কুলকর্ম্ম, উপাসনা ও সাধন ভজনাদি করেন, তাঁহার জপ পূজা সমস্ত ক্রিয়াই অভিচার স্বরূপ হয়। ইহার উদ্দেশ্য পূর্ব্বোক্ত ঘড়ির দোলকে বাহ্যশক্তির একটী ধীর আন্দোলনের ন্যায়, সাধনাকাঙ্ক্ষীর চিত্ত ও শরীরে প্রভূত জ্ঞান ও সাধনানুকূল সামর্থ্য সত্ত্বেও অভিষেকদাতা গুরুপ্রদত্ত

* 'পুরশ্চরণ প্রদীপের' প্রথম উল্লাস মধ্যে—"কুণ্ডলিনী শক্তির জ্ঞানলাভা-নুরূপ অনুষ্ঠান বিশেষকেই 'পুরশ্চরণ' বলে" এই অংশের মধ্যে দেখিতে পাইবে যে, মন্ত্রচৈতন্যশক্তি প্রদানে যিনি অভিজ্ঞ তিনিই প্রকৃত গুরু। ইত্যাদি 'বেধ-দীক্ষার' বিষয় বলা হইয়াছে।

একটী অপ্রত্যক্ষ দৈবী-স্পন্দন ব্যতীত তাহার সাধনক্রিয়ার গতি আরব্ধ হইতেই পারে না। হয় ত কোনও ক্ষণজন্মা শিষ্য তাঁহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত উৎকট সাধনবলে অনতিকালমধ্যে পূজ্যপাদ পরমহংসের ন্যায় এমন সমাধিলাভ করিতে পারেন, যাহা তাঁহার অভিষেকদাতা গুরু তখন কল্পনা করিতেও পারেন নাই, কিন্তু সেই জন্মার্জ্জিত বিপুল সাধন-সামর্থ্য গুরুদত্ত এইরূপ লৌকিক অভিষেক বা মন্ত্রচৈতন্যপ্রদ কোন অপ্রত্যক্ষ শক্তি-প্রয়োগ ব্যতীত আদৌ বিকশিত হইবার উপায় নাই। ইহা শঙ্করাদেশ। সেই কারণ শাস্ত্রে অভিষেক-ক্রিয়ার এতই আদর ও অনুষ্ঠান, এবং সাধন-মার্গে ইহার এতই অবশ্য-প্রয়োজন।

যাহা হউক গুরু ও সাধকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অভিষেক-কলসে শক্তি সঞ্চারিত হইলে, গুরু স্বয়ং সেই কলসোপরি "ক্লীঁ, হ্রীঁ, শ্রীঁ," এই মন্ত্র জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ।
ত্বত্তোয় পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মরতোঽস্তু মে॥"

অর্থাৎ হে ব্রহ্মকলস, তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা-স্বরূপ, তুমি উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল-পল্লব দ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হউক। এই বলিয়া গুরু সমাগত কৌলসহযোগে সেই কলস সঞ্চালিত করিয়া উত্তোলন করিবেন ও তন্মুখস্থ 'কল্পবৃক্ষ সদৃশ পল্লবগুলি' শিষ্যের মস্তকে রাখিয়া মনে মনে মাতৃকা-মন্ত্র স্মরণ করিবেন, পরে মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া উত্তরাভিমুখ শিষ্যকে পশ্চাদুক্ত মন্ত্রদ্বারা অভিষিক্ত করিবেন। এইস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, 'অভিষেকানুষ্ঠান'-কল্পে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল, তাহা শাক্ত ও পূর্ণ উভয়বিধ

অভিষেক-কর্ম্মেই প্রযুজ্য, কেবল সঙ্কল্পাদির উল্লেখ সময়ে, যথাসম্ভব বাক্যের পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই হইবে; কিন্তু অভিষেক-মন্ত্র উভয়েরই স্বতন্ত্র। অভিষেকদাতার অবগতির জন্য নিম্নে স্বতন্ত্রভাবেই তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

শুভশাক্তাভিষেক-মন্ত্রের ঋষ্যাদি কীর্ত্তন যথা:—"এষাং-শুভশাক্তাভিষেকস্য দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষিঃ অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শক্তির্দেবতা সর্ব্বকল্পসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।"

শাক্তাভিষেক মন্ত্র:—

"ওঁ রাজরাজেশ্বরী (শক্তি) দেবী ভৈরবী কালভৈরবী।
শ্মশানভৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দভৈরবী।
ত্রিপুটা ত্রিপুরাদেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্রিপুরমালিকা।
ত্রিপুরানন্দিনী দেবী তত্রৈব ত্রিপুরাতনী।
এতাস্ত্বমভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১॥

"ছিন্নমস্তা মহাদেবী তথা চৈকজটেশ্বরী।
তারা চ জয়দুর্গা চ শূলিনী ভুবনেশ্বরী।
ত্বরিতাখ্যা মহাদেবী তথৈব চ ত্রিখণ্ডিকা।
নিত্যা চ নিত্যরূপা চ বজ্রপ্রস্তারিণী তথা।
এতাস্ত্বমভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ২॥

"অশ্বারূঢ়া মহেশানী তথা মহিষমর্দ্দিনী।
দুর্গা চ বনদুর্গা চ শ্রীদুর্গা ভগমালিনী।
তথা ভগন্দরী দেবী ভর্গক্রিয়া তথাপরা।
সর্ব্বচক্রেশ্বরী দেবী তথা দক্ষিণকালিকা।

"সর্ব্বসিদ্ধিকরী দেবী সর্ব্বগন্ধর্ব্বসেবিতা।
উগ্রতারা মহাদেবী তথা নীলসরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৩॥

"ক্ষেমঙ্করী মহাকালী চানিরুদ্ধা সরস্বতী।
মাতঙ্গিনী চান্নপূর্ণা রাজ-রাজেশ্বরী তথা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৪॥

"উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৫॥

"উগ্রদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রা শুভদংষ্ট্রা কপালিনী।
ভীমনেত্রা বিশালাক্ষী মঙ্গলা বিজয়া জয়া।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৬॥

"মঙ্গলা নন্দিনী ভদ্রা কীর্ত্তিলক্ষ্মীর্যশস্বিনী।
পুষ্টির্মেধা শিবা সাধ্বী যশঃ শোভা জয়া ধৃতিঃ।
শ্রীনন্দা চ সুনন্দা চ নন্দিস্থানন্দপূজিতা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৭॥

"বিজয়া নন্দিনী ভদ্রা স্মৃতিঃ শান্তর্ধৃতিঃ ক্ষমা।
সিদ্ধিস্তুষ্টী রমা পুষ্টিঃ শ্রীবৃদ্ধিশ্চ রতিস্তথা।
দীপ্তিঃ কান্তির্যশোলক্ষ্মীরীশ্বরী বুদ্ধিরেব চ।
শাক্রী মায়াবতী ব্রাহ্মী জয়ন্তী চাপরাজিতা।
অজিতা মানবী শ্বেতা দিতিশ্চাদিতিরেব চ।
মায়া চৈব মহামায়া মোহিনী ক্ষোভিনী তথা।

কমলা বিমলা গৌরী লাবণ্যাম্বুধিসুন্দরী।
দুর্গা ক্রিয়া চারুমতী ঘণ্টাকর্ণী কপালিনী।
রৌদ্রী কালী চ মায়ূরী ত্রিনেত্রা চাপরাজিতা।
সুরূপা বহুরূপা চ তথৈব বিগ্রহাত্মিকা।
চর্চ্চিকা চাপরা জ্যেষ্ঠা তথৈব সুরপূজিতা।
বৈবস্বতী চ কৌমারী তারা মাহেশ্বরী পরা।
বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কার্ত্তিকী কৌশিকী তথা।
শিবদূতী চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালাবিভূষিতা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ৮॥

ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চ যমশ্চৈব নৈর্ঋতো বরুণস্তথা।
পবনোধনদেশানৌ ব্রহ্মানন্তৌ দিগীশ্বরঃ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা। ৯॥

সম্বৎসরশ্চায়নৌ চ মাসাঃ পক্ষৌ দিনানি চ।
তিথয়শ্চাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১০॥

রবিঃ সোমঃ কুজঃ সৌম্যা গুরুঃ শুক্রঃ শনৈশ্চরঃ।
রাহুঃ কেতুশ্চ সততমভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ॥ ১১॥

নক্ষত্রং করণং যোগো অমৃতং সিদ্ধরেব চ।
দগ্ধং পাপং তথা ভদ্রা যোগোবারাঃ ক্ষপাস্তথা।
বারবেলা কালবেলা দণ্ডা রাশ্যাদয়স্তথা।
অভিষিঞ্চন্তু সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১২॥

অসিতাঙ্গোরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোঽন্মত্তসংজ্ঞকঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারোঽষ্টৌ চ ভৈরবাঃ।
অভিষিঞ্চন্তু সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৩॥

ডাকিনীপুত্রিকাশ্চৈব রাকিনীপুত্রিকাস্তথা।
লাকিনীপুত্রিকাশ্চান্তে কাকিনীপুত্রিকাঃ পরে।
শাকিনীপুত্রিকা ভূয়ো হাকিনীপুত্রিকাস্তথা।
ততশ্চ যক্ষিনীপুত্রা দেবীপুত্রাস্ততঃ পরং।
মাতৃণাঞ্চ তথা পুত্রী ঊর্দ্ধমুখ্যাঃ সুতাশ্চ যে।
অধোমুখ্যাঃ সুতাঃ যে চ উন্মুখ্যাশ্চ সুতাঃ পরে।
এতাস্থামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৪॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৫॥

পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চৈব বিকারাশ্চৈব ষোড়শ।
আত্মান্তরাত্মাপরমজ্ঞানাত্মনঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আত্মনশ্চ গুণা যেতু স্থূলাঃ সূক্ষ্মাস্তথা পরে।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৬॥

বেদাদিবীজং হূঁবীজং স্ত্রীঁবীজং মীনকেতনং।
শক্তিবীজং রমাবীজং মায়াবীজং সুধাকরং।
চিন্তারত্নং মহাবীজং নারসিংহঞ্চ শাঙ্করম্।
মার্ত্তণ্ডভৈরবং দৌর্গং বীজং শ্রীপুরুষোত্তমং।
গাণপত্যঞ্চ বারাহং কালীবীজং ভয়াপহম্।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৭॥

গঙ্গা গোদাবরী রেবা যমুনা চ সরস্বতী।
আত্রেয়ী ভারতী চৈব সরযুর্গণ্ডকী তথা।
করতোয়া চন্দ্রভাগা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।

ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৮॥

ভৈরবো ভীমরূপশ্চ শোণ-ঘর্ঘর এব চ।
সিন্ধুতোয়হ্রদাঃ পান্তু তথা পাতালসম্ভবাঃ।
যানি কানি চ তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
তানি ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৯॥

জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বীপাঃ সাগরা-লবণাদয়ঃ।
অনন্তাদ্যাস্তথা নাগাঃ সর্পা যে তক্ষকাদয়ঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ২০॥

রতিশ্চ বল্লভা বহ্নের্মনঃকৃচ্চ ততঃ পরং। *
বৌষট্কারস্তু ফট্কার মভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ২১॥

নশ্যন্তু প্রেতকুষ্মণ্ডা-রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
পিশাচা গুহ্যকা ভূতা অভিষেকেন তাড়িতাঃ॥ ২২॥

অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ পাপানি সুমহান্তি চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন তারাবীজেন তাড়িতাঃ॥ ২৩॥

রোগাঃ শোকাশ্চ দারিদ্র্যং দৌর্ব্বল্যং চিত্তবিভ্রমং।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন বাগ্বীজেনৈব তাড়িতাঃ॥ ২৪॥

লোকানুরাগস্ত্যাগশ্চ দৌর্ভাগ্যমপিদুর্যশঃ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন মন্মথেন চ তাড়িতাঃ॥ ২৫॥

* বহ্নিশ্চ বহ্নিজায়া চ বষট্ কূর্চ্চমতঃপরং। (ইতি পাঠান্তরং)

তেজোহ্রাসো বলহ্রাসো বুদ্ধিহ্রাসস্তথৈব চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন শক্তিবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ২৬ ॥

বিষাপমৃত্যুরোগশ্চ ডাকিন্যাদি ভয়ং তথা।
ঘোরাভিচারাঃ ক্রূরাশ্চগ্রহা নাগাস্তথা পরে।
নশ্যন্তু চাভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ২৭ ॥

নশ্যন্তু চাপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেন শাক্তেন পূর্ণাঃসন্তু মনোরথাঃ ॥ ২৮ ॥

এই অষ্টাবিংশতি মন্ত্রের এক একটী পাঠ করিতে করিতে কলসস্থিত পঞ্চ-পল্লবদ্বারা তাম্রকুণ্ডে বা কোন বিস্তৃত-মুখ পাত্রে নিহিত সেই ব্রহ্মার্চ্চিত মন্ত্রপূত ব্রহ্মশক্তিযুক্ত সলিলদ্বারা গুরু শিষ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে সিঞ্চন করিয়া দিবেন। এই 'শাক্তাভিষেক' ক্রিয়া দিবাভাগেই সম্পন্ন করা বিধেয়। গুরুদেব যদি শিষ্যকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে এই দিবসেই নিশা-সময়ে সেই মন্ত্রপূত অবশিষ্ট তোয়দ্বারা শিষ্যের 'পূর্ণাভিষেকও' করাইয়া দিতে পারেন। অথবা দিবসে বা রাত্রিতে এক সঙ্গেই উভয় অভিষেক করিয়া দিতে পারেন। যদ্যপি শিষ্য পূর্ব্বে শাক্তাভিষিক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষেক কালেও নূতন করিয়া এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া 'পূর্ণাভিষেক-মন্ত্রদ্বারা', তাহা সম্পন্ন করাইয়া দিবেন। বৃদ্ধব্রহ্মানন্দদেবাশ্রিত সিদ্ধ-মঠসকলে এইরূপ বিধানই চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে।

শুভ পূর্ণাভিষেক-মন্ত্রের ঋষ্যাদিকীর্ত্তন যথা :—

এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ আদ্যাদেবতা প্রণবোবীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ।

শুভপূর্ণাভিষেক মন্ত্র :—

ওঁ গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দুর্গালক্ষ্মীভবান্যস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥ ১॥

ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ২॥

জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রাহ্মণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা॥ ৩॥

নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥ ৪॥

ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা
শ্রদ্ধা কান্তির্দ্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা॥ ৫॥

মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাত্বাম্ অভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ৬॥

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥ ৭॥

অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥ ৮॥

কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ৯॥

ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ তথেশানঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরঃ॥ ১০॥

রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহা॥ ১১॥

নক্ষত্রঃ করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌ দিনানি চ।
ঋতুর্মাসোঽয়নাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥ ১২॥

লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলাম্বুকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৩॥

গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৪॥

অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যাঃ পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ॥ ১৫॥

পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ।
পূর্ণাভিষেক সন্তুষ্টাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু পাথসা॥ ১৬॥

দৌর্ভাগ্যং দুর্যশো রোগা দৌর্ম্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেন পরম ব্রহ্মতেজসা॥ ১৭॥

অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতাঃ॥ ১৮॥

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যে রিষ্টকারকাঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥ ১৯॥

অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্কায়জা দোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥ ২০॥

নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেন পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥ ২১ ॥

এই একবিংশতি মন্ত্রদ্বারা গুরু পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রহ্মকলসস্থিত 'সিদ্ধ-সলিল'-সহযোগে কল্পবৃক্ষসদৃশ পঞ্চপল্লবদ্বারা শিষ্যের মস্তকে পূর্ণাভিষিঞ্চন করিবেন।

কলিতে দিবারাত্রি নির্ব্বিশেষে অভিষেক বিধি :—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই অভিষেকক্রিয়া নিশাসময়েই সম্পন্ন করিবার বিধি শাস্ত্রোক্ত, কিন্তু কোন কোন কুলাবধূত আবশ্যক বিবেচনায় শাক্তাভিষেকের ন্যায় বা দিবাভাগে শাক্তাভিষেকের সঙ্গেই পূর্ণাভিষেক-ক্রিয়াও সম্পন্ন করাইয়া দেন। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্ যুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরামোক্ষং যযুঃপুরা ॥
প্রবলে কলিকালেতু প্রকাশে কুলবর্ত্তিনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্ ॥"

অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে এই 'পূর্ণাভিষেক-সংস্কার' অত্যন্ত গুপ্ত ছিল। তৎকালে অতি গুপ্তভাবেই ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতেন। অতঃপর যখন কলির পূর্ণ-প্রভাব প্রকাশ হইবে, তখন কুলাবধূত মহাত্মগণ মুক্তাবধূতরূপে রাত্রি বা দিবসে যে কোনও সময়ে প্রকাশ্যভাবেই অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। তবে মুক্তাবধূত ব্যতীত কোনও গুপ্তাবধূতের দ্বারা এরূপ অনুষ্ঠান শাস্ত্রসম্মত নহে। কেন্দ্রিক বা অন্যান্য বিশিষ্ট মঠেই এরূপ অনুষ্ঠান প্রায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক এই উভয় অভিষেকের কোনটী সম্পন্ন হইলে, শিষ্য সেই তাম্রকুণ্ডনিহিত সিদ্ধ-সলিলে আচমন করিয়া শুক্ল বা কাষায়-বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গুরুসন্নিধানে উপবেশন করিবে। তৎপরে গুরু স্বীয়-দেবতা ও শিষ্য-সংক্রান্তদেবতা উভয়ের ঐক্য জ্ঞান করিয়া গন্ধাদিদ্বারা শিষ্য-দেবতার মস্তকে পূজা করিবেন। অনন্তর "ওঁ সহস্রারে হুঁ ফট্" এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া শিষ্যশরীরে নিম্নবর্ণনা অনুসারে কলান্যাস করিবেন।

কলান্যাসঃ—তিনটী কুশপত্রদ্বারা (পদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত) "ওঁ নিবৃত্তৈ-নমঃ," (নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত) "ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ" (কণ্ঠ হইতে ললাট পর্য্যন্ত) "ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ," (ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত) "ওঁ শান্ত্যাতীতায়ৈ নমঃ," এই প্রকার ন্যাস করিয়া পুনরায় (ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ললাট পর্য্যন্ত) "ওঁ শান্ত্যাতীতায়ৈ নমঃ," (ললাট হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত) "ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ," (কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত) "ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ," (নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত) "ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ" এবং (জানু হইতে পদতল পর্য্যন্ত) "ওঁ নিবৃত্তৈ নমঃ" এইরূপ ন্যাস করিবেন। অনন্তর শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া দেয় মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া, "অমুক মন্ত্রং * তেঽহং দদামি" এই বলিয়া শিষ্যের হস্তে জল প্রদান করিবেন। "দদস্ব" বলিয়া সেই জল শিষ্য ভক্তিসহকারে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ মস্তকে ধারণ করিবে।

মন্ত্রদানঃ—এইবার গুরু পূর্ব্বমুখ হইয়া পশ্চিমাভিমুখ শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার, স্ত্রী ও শূদ্র হইলে বামকর্ণে

* 'অমুক মন্ত্রং' স্থলে 'শ্রীমৎ দক্ষিণকালিকা' মন্ত্রং, অথবা শিষ্যকে যে মন্ত্র গুরু প্রদান করিবেন, তাহাই উল্লেখ করিবেন।

তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে একবার ঋষ্যাদি-সংযুক্ত মন্ত্র বলিয়া দিবেন। মন্ত্র-গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুর চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া শিষ্য বলিবে,—

"ওঁ তৎ প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ, মায়া-মৃত্যুমহাপাশাদ্বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ।"

গুরুদেব নিম্নপ্রদত্ত মন্ত্র পাঠ-সহযোগে (শিষ্যের বাহুমূল ধরিয়া) শিষ্যকে উত্তোলন করিবেন :—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তি-শ্রীকান্তিপুত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্ততে।" (শিষ্য 'ব্রহ্মচারী' ব্রত পালনরত হইলে, এই মন্ত্রান্তর্গত 'পুত্র' শব্দ উল্লেখ করিতে নাই।)

এই সময় সাধকমণ্ডলীর অনুমত্যনুসারে বা গুরু নিজেই শিষ্যকে উপযুক্ত মনে করিলে, 'আনন্দনাথ' যুক্ত কোন নাম তাহাকে প্রদান করিতেও পারেন। অনন্তর শিষ্য গুরুদত্ত সেই 'বীজমন্ত্র' একশত আটবার জপ করিবে ও ঘটের নিম্নস্থিত যন্ত্রে সেই দেবতার পূজা করিবে। গুরু এবং উপস্থিত সাধক বা কৌলগণও স্ব স্ব শক্তি-সংরক্ষণার্থে অষ্টাধিকসহস্র বা ন্যূনকল্পে অষ্টাধিক-শতবার ইষ্ট-বীজমন্ত্র জপ করিবেন।

দক্ষিণান্ত :—অনন্তর শিষ্য যথারীতি নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণান্ত করিবে :—

"ওঁ তৎসদ্ অদ্য (ইত্যাদি)—কৃতৈতচ্ছুভ (শাক্ত বা পূর্ণা-ভিষেক) কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং গো-ভূ-হিরণ্যাদি অথবা যৎকিঞ্চিৎ তৎকাঞ্চনমূল্যং দক্ষিণা পরব্রহ্ম-গোত্রায় শ্রীমৎ স্বামী অমুকানন্দ-

নাথায় কৌলায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

তাহার পর শিষ্য উপস্থিত কৌলদিগকে প্রণাম ও যথাশক্তি অর্চনা করিয়া জগদম্বার চরণামৃত পান করিবে অধিকারী হইলে ইতঃমধ্যে বা গুরুর আদেশক্রমে পরে অভিষেকাঙ্গীভূত গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রে স্বয়ং হোমকার্য্য * সম্পন্ন করিবে। নতুবা গুরু বা কোন অধিকারী সাধকের দ্বারা হোমকার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করাইতে হয়।

অভিষিক্ত না হইয়া লোভবশে অন্যকে অভিষেক করিতে নাই :—

মন্ত্রদাতা কোন গুরু স্বয়ং অভিষিক্ত এবং অভিষেকাদি ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ না হইয়া, কেবল লোভপ্রযুক্ত ইহা সম্পাদন করাইলে, জগদম্বার অভিসম্পাতে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হইবে। তাই 'কামাখ্যা-তন্ত্রে' সদাশিব স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞানাদ্ যদি বা লোভান্মন্ত্রদানং করোতি চ।
সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীশাপঃ প্রজায়তে॥" ইত্যাদি

সুতরাং লোভপ্রযুক্ত বা কেবল বৃথা আত্মপ্রাধান্য-রক্ষাকল্পে কেহ যেন এই দৈবী অনুষ্ঠানে অজ্ঞানতাবশতঃ কখনও হস্তক্ষেপ না করেন।

'শাক্তাভিষেক' অথবা 'পূর্ণাভিষেক'-অন্তে শিষ্যকে যে যে মন্ত্র প্রদান করিতে হইবে, তাহা গুরুপরম্পরায় প্রচলিত আছে। এস্থলে সে মন্ত্রের উল্লেখ করিলাম না। জ্ঞানবান গুরু ইচ্ছা করিলে, 'মন্ত্রকোষ' হইতেও তাহা উদ্ধার করিয়া, অথবা যে কোন অভিজ্ঞের নিকট জানিয়া লইতেও পারিবেন।

---

* 'পূজাপ্রদীপে'—'হোমবিধি' দেখ।

'পূর্ণাভিষেক'—সাধনার অন্তিম ক্রিয়া নহে, পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে। প্রথমে 'শাক্তাভিষেক' পরে 'পূর্ণাভিষেক' সাধনমার্গের যেন প্রবেশদ্বার। সুতরাং অভিষিক্ত হইলেই যে, সঙ্গে সঙ্গে বড় একজন সাধক বা একেবারে সিদ্ধপুরুষ হইয়া যাইলেন, একথা কেহই কখন মনে করিবেন না। তবে গুরুকৃপায় তদীয় সাধনশক্তির কণামাত্র অংশ যেন মূলধন রূপে প্রাপ্ত হইয়া, এখন হইতে তাঁহার উপদিষ্ট ক্রিয়ায় রীতিমত সাধনব্যাপারে শিষ্যকে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে না পারিয়া, পূর্ণাভিষেকান্তেই সহসা গর্ব্বে অভিভূত হইয়া যান, তখন তাঁহারা আর কাহাকেই একেবারে গ্রাহ্য করেন না। তাঁহাদের সাধনা যত হউক আর না হউক, লোক-সমাজে 'আমি একজন অভিষিক্ত সাধক' বলিয়া গুরুদত্ত 'গুপ্ত নামে' পরিচয় দিতেই বা সাধনার বাহ্য অনুষ্ঠান বহুল রং ঢং ও হাবভাবময় বাক্যালোচনায় অধিক আনন্দ ও সম্মান অনুভব করেন। এতদ্ব্যতীত অনেকে আবার এই সময় হইতে শিষ্য-করণ ও দীক্ষা-প্রদান-দ্বারা স্বয়ংই যেন অদ্বিতীয় সিদ্ধগুরু সাজিয়া বসেন। যদিও দীক্ষাপ্রদানে গুরুমণ্ডলীর কোনও নিষেধ বাণী নাই, বরং তাঁহারা পূর্ণাভিষেকান্তে ব্রাহ্মণ-শিষ্যকে মন্ত্র-প্রদানের অধিকার বা আদেশই প্রদান করিয়া থাকেন, কারণ গুরুবংশের সাধকদিগকে সেরূপ আদেশ প্রদত্ত না হইলে, ক্রমে উন্নত ও উদার সাধনক্রম যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে, পক্ষান্তরে সাধনাভিলাষী শিষ্যবংশও আর বুঝি রক্ষা হয় না। কিন্তু সাধনা ও অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সময় তাহাতেও যেন বিষময় ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী সাধনার

উচ্চতর আদর্শ না পাইয়া ক্রমে তাহার বাহ্যানুষ্ঠানেই অধিকতর রত হইয়া পড়িতেছে, ফলে প্রকৃত সাধন-রহস্য ও সাধনার ক্রম তাহারা আদৌ বুঝিতে পারিতেছে না। এইরূপে কেবল-মাত্র 'পূর্ণাভিষিক্ত'-শিষ্যপরম্পরায় তাহাই একণে সাধনার সর্ব্বোচ্চ বা শেষ (Final) অনুষ্ঠান বলিয়া তাঁহারা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ স্থির করিবার আরও এক বিশেষ কারণ আছে। 'পূর্ণাভিষেক' যেমন সাধনামার্গের প্রথম অভিষেক, 'পূর্ণদীক্ষাভিষেক' ও 'মহাপূর্ণদীক্ষাভিষেক' তেমনই সাধনার প্রায় শেষ ও সর্ব্বোচ্চাভিষেক। 'সাধনপ্রদীপে' সে কথা বিস্তৃতভাবেই বলা হইয়াছে। সাধারণ অনভিজ্ঞ বা কেবল-মাত্র পূর্ণাভিষিক্ত-গুরুপরম্পরায় শিষ্যকরণফলে, শিষ্যগণের 'পূর্ণাভিষেক' ও 'পূর্ণদীক্ষাভিষেকের' মধ্যে যে কতদূর পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার জ্ঞান আদৌ উন্মেষিত না হওয়ায়, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা তাঁহাদের বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সেই কারণ অনেক সময়ে দেখা যায়,—বহু পুথীপড়া তান্ত্রিক-সাধক এই বিষয় লইয়া কত বৃথা তর্কজাল বিস্তার করিয়া বসেন! তাঁহাদের সেই বদ্ধমূল ভ্রান্ত-ধারণা অপনোদন করা একণে নিতান্তই দুরূহ বলিয়া মনে হয়। বিশেষ সেই তর্কপর সাধক আবার যদি সংস্কৃত ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হয়েন, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। তিনি তাঁহার অধীত সংস্কৃত ব্যাকরণ, তাঁহার সাধনরহস্য-বোধহীন আভিধানিক ভাষার্থজ্ঞান ও দর্শনাদি কতিপয় বিচার-শাস্ত্রের প্রকৃত 'দর্শনক্রিয়া' বিহীন লৌকিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে কয়খানি অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক তন্ত্র বা সাধন-শাস্ত্র নিজে নিজেই পড়িবার অবসর পান, তাহাতেই সর্ব্বজ্ঞরূপে তিনি

লোকসমাজে নিজের পরিচয় দিতে তিলমাত্রও ইতস্ততঃ করেন না। পরিতাপের বিষয়—অধুনা অধিকাংশ স্বতন্ত্র খণ্ডিত, লুপ্ত ও গুপ্ত হইলেও, তাহার যে কয়খানির অসম্পূর্ণ অংশমাত্র সাধারণে দেখিতে পান, 'গুরুর কৃপায় তাহারও যথার্থ সাধন-তত্ত্ব নির্ণিত বা উপদিষ্ট না হইলে, তাহা যে কোন পণ্ডিতেরও যে কখনও অধিগম্য হইতে পারে না', শিবোক্ত এই সরল কথাটী এক্ষণে অনেকেই স্মরণ রাখিতে সমর্থ নহেন বা ইচ্ছা করেন না।

ক্রিয়াজ্ঞানহীন তন্ত্রোপদেষ্টা ও তাহার উপদেশ-ফল :—'তন্ত্র' বলিতে তন্ত্রানভিজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তিগণ এক্ষণে যেমন শ্রীশ্রীকালীপূজা ও তদানুষঙ্গিক বাহ্য-পঞ্চমকারাদির কেবল উপভোগমাত্রই বুঝিয়া থাকেন, অধিকাংশ ক্রিয়াবান বা পূর্ণাভিষিক্ত আধুনিক তান্ত্রিকও যে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক বুঝেন, সে কথা আর নিসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। দুই একজন প্রকৃতই অসাধারণ পণ্ডিত, অথচ সাধক-চূড়ামণি বলিয়াও লোক সমাজে তাঁহারা পরিচিত, কোন কোনও তন্ত্রের অনুবাদক বা ব্যাখ্যাকর্ত্তা বলিয়াও তাঁহারা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন ; তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শিষ্যবৃন্দের জ্ঞান ও অবস্থা এবং তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত তন্ত্র-ব্যাখ্যা দেখিয়া, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, সাধন-শাস্ত্রজ্ঞান ও কর্ম্মনিষ্ঠার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, একপক্ষে যেমন বিমোহিত হইতে হয়, পক্ষান্তরে তাঁহাদের উচ্চতর ও উদার সাধন-জ্ঞানহীনতা এবং তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-পুষ্ট ভাব দেখিয়া আবার তেমনই মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। মনে হয় এ জন্মে এমন শক্তি ও সামর্থ্যের কি শোচনীয় অপব্যবহারই হইল! তাঁহাদের সেই তন্ত্র-ব্যাখ্যা পাঠে ইহাও

স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা প্রকৃত সাধনার পথ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এবং উচ্চতম ক্রিয়াবান বা প্রকৃত প্রশস্ত কৌল-গুরুর অভাবেই সন্দেহান্দোলিত ভাবে এই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বা করিতেছেন। তাঁহারা যতই নিজেকে স্বয়ং-সিদ্ধ বলিয়া ভাবুন না, অথবা অনুগত মুগ্ধ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক লোকসমাজে উচ্চ বিজ্ঞাপিত হউন না, কিম্বা তাঁহারা প্রহরব্যাপী সদ্‌যুক্তি ও বিবিধ দার্শনিক বিচারসহ বক্তৃতা দ্বারা ক্রিয়া-জ্ঞান-হীন সাধারণ শ্রোতার হৃদয় মোহিত করুন না, কিন্তু যদি তাঁহাদের নিভৃতে ডাকিয়া জগদম্বার চরণ-সাক্ষ্য করিয়া বলা যায় যে, স্বীয় বক্ষস্থলে হস্তার্পণ করিয়া সরলভাবে একবার বলুন দেখি,—কেবল লৌকিক প্রশংসা, শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞান, বাহ্য-পক্ষ-তত্ত্বাবাদ ও তর্কজনিত ক্ষণভঙ্গুর আত্মতুষ্টি ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবদানন্দের কি কোনও আস্বাদ পাইয়াছেন? অথবা আপনাদের মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিবার আবশ্যক নাই, আপনাদের আত্মপ্রাধান্য খর্ব্ব করিয়াও কাজ নাই, যাহাতে আপনাদের জীবিকারূপ গুরুগিরি ব্যবসায় নষ্ট হইতে পারে, এমন কোনও কর্ম্ম করিবারই প্রয়োজন নাই, পরন্তু কেবল নিজেদের সর্ব্ববিধ পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, আর কত জন্ম এইভাবেই বৃথা কাটাইতে হইবে? আপনি সুপণ্ডিত, ভক্তিবান এবং সাধনপথের একজন যথার্থ পরিচিত পথিক বলিয়াই আপনাকে বলিতেছি যে, যে বিষয় নিজেই এখনও ঠিক নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছেন, সে বিষয় কেবল আত্মমর্য্যাদা-রক্ষাকল্পে অন্য ব্যক্তিকে অভ্রান্ত বলিয়া উপদেশ দেওয়া কি সঙ্গত? আপনি বিজ্ঞ 'দার্শনিক',

দর্শনের গুহ্য-ভাবাত্মক উপদেশ দিন—উত্তম কথা, তাহা অধুনা কালগ্রস্ত ভাবে কেবল 'বিচার-শাস্ত্র' বলিয়াই পরিচিত, সেই কারণ তাহার প্রকৃত 'দর্শনচেষ্টা' কাহারই নাই, ফলে কেবল তাহার পঠন-পাঠনই হইয়া থাকে, যাহা হউক তাহাতে সাধারণ শিষ্যের উপস্থিত জ্ঞানপিপাসা বা তত্ত্ব-জ্ঞানবিকাশপক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে সে কিছুতেই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হইতে পারিবে না। আপনি ভক্তিমার্গ বাগ্মী, সাধারণ্যে সকল সাধনার মূলবস্তু সেই ভক্তিরই উপদেশ দিন, তাহাতেও সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে, জীব ভগবদ্বিশ্বাসী হইবে; কিন্তু আপনার এই পরিণত বয়সে আপনাকে সানুনয়ে অনুরোধ করি, কাহাকেও আর 'ভ্রান্ত-ক্রিয়োপদেশ' দিবেন না। শাণিত শস্ত্রের উপর দিয়া বিচরণ করা, অথবা অগ্নিমধ্যে ক্রীড়া করা, নিতান্ত সহজ-কর্ম্ম নয়! এ কথা প্রত্যক্ষ ভাবে জানিয়াও কেবল তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধি-কল্পে অজ্ঞের আর সর্ব্বনাশ করিবেন না! তবে যাঁহারা মূর্খ, কদাচারী ও ঘোর আত্মপ্রবঞ্চক, স্বার্থই যাহাদের জীবনের সর্ব্বস্বধন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র! জগদম্বা তাহাদের যে জ্ঞান দিয়াছেন, বা জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে যেমন ভাবসঙ্গ তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকুক; তাহাদের উচ্চতর সাধনমার্গের কোনও গূঢ় কথা এক্ষণে বলিয়া বিশেষ লাভালাভ নাই, কারণ বর্ত্তমান জগৎ ত তাহাদের প্রভাবে অনুপ্রাণিত নহে!

যাহাহউক কথা হইতেছিল—'তান্ত্রিক-সাধনার' অর্থ কেবল কালীপূজা নহে, বা 'বাহ্য-পঞ্চতত্ত্বানুষ্ঠান'ও নহে। "আমি পণ্ডিত বা পণ্ডিতের চূড়ামণি, আমি বিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রে রত্ন বা তাহার

অলঙ্কারস্বরূপ; অথবা আমি বিদ্যার ভূষণ, সাগর, অর্ণব বা অনন্তবারিধিসদৃশ যাহা হয় 'কিছু'; এইরূপ আমি যতই 'কিছু' হই না, আমার বিদ্যা সীমা ছাড়িয়া ক্রমে অসীম ও অসংখ্য উপাধি-তরঙ্গে আন্দোলিত হউক না, জানি তাহাতে আমি কেবলমাত্র ভাষাজ্ঞানযুক্ত নানা-শাস্ত্রবিদ্ একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়াই পরিচিত হইব, কিন্তু সাধনরাজ্যে হয় ত লৌকিকভাবে একজন মূর্খ বর্ণজ্ঞান-বিহীন সাধকের চরণরেণু হইবারও যোগ্য হইব না।" আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ সে দিনেও বিশ্ববরেণ্য সাধকচূড়ামণি পরমহংস 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ দেব' তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় এ কথা আজ কাল আবালবৃদ্ধ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন,—সে দিন বড় বড় বৈদান্তিক, ব্রহ্মজ্ঞানী ও বিজ্ঞানবিদ্ জ্ঞানের অগাধ অম্বুধি লইয়া গোষ্পদসদৃশ তাঁহার সেই ছোট ছোট কথা-সলিলমধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন; সে কি আমাদের এই বিশাল শাস্ত্র-জ্ঞানের ফলে, না শ্রীগুরুদত্ত কোনও গূঢ় ক্রিয়ার যথার্থ সাধনার বলে? তাই বলি, বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া স্থিরচিত্তে একবার নিজ অন্তরে ভাবিয়া দেখ দেখি,—দেখিতে পাইবে, তোমার ভ্রান্ত-জ্ঞানের অসীম সাগর শুকাইয়া যাইবে, তোমার তর্কের বোঝা খসিয়া পড়িবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তখন বুঝিতে পারিবে, 'তন্ত্র' বা সাধনশাস্ত্র প্রকৃতই আমার এই সাধনাহীন শুষ্ক জ্ঞানের অতীত!

"আমি হয় ত ক্রিয়াবান সাধনতন্ত্র-জ্ঞানপুষ্ট বা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ গুরু পাইলাম না, যাঁহাকে পাইলাম—কোনওরূপে তাঁহার নিকট সাধনার বাহ্য-অনুষ্ঠানপূর্ণ তাঁহার কেবল অভিনয়রূপ অভিষেক মাত্র

গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলাম, আর ঘরে বসিয়া স্বয়ং-সিদ্ধ-পুরুষ হইয়া তন্ত্ররাশি পড়িয়া একটা বিকট সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম; সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় বিলাসী মধু-পানরত সাধক-নামধারী সঙ্গী ও শিষ্যও জুটিয়া গেল,—আমার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, আমার ভক্তি-গদ্‌গদ একটা অপূর্ব্ব নাটকীয় ভাব দেখিয়া অথবা আমার বিচিত্র বাক্যাড়ম্বর ও কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত-তান শুনিয়া, তাহারা আমাতে মহাপুরুষের লক্ষণসকল অনুভব করিল। আমি তথা-কথিত 'কুলতত্ত্বপূর্ণ' কলস হইতে অভিনব ভঙ্গিতে তখন পান-পাত্র পূর্ণ করিয়া চক্রমধ্যে তাহা বিতরণ করিতে লাগিলাম—আমি জানিতাম যে, স্থূল 'আগুতত্ত্বের' কি অপ্রতিহত মহিমা! তথাপি আমি ক্রমে সেই সঙ্গ ও প্রলোভনবশে তাহাতে যথেষ্টরূপ অভ্যস্ত হইলেও, আমি 'বীর' হইয়াও অতি গোপনেই চক্রানুষ্ঠান করিয়া থাকি ও তাহাতে তন্ময় হইয়া যাই! 'শাপ-বিমোচনের' কথা যে আদৌ জানিতাম না, তাহাও নহে, তবে তাহার সেই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়াই সাধনার সমস্ত অনুষ্ঠান কোনওরূপে এখন রক্ষা করি—ফলে পাত্রের মাত্রা একটু বাড়িলেই আমার বেশ 'নেশা' হয়, তখন জগদম্বার অলৌকিক 'কৃপা-শক্তি সহজেই হ্রাস'-প্রাপ্ত হইয়া কেবল স্থূল 'তত্ত্বশক্তিই' প্রকটা হইয়া পড়ে! চক্ষু সামান্য লোহিতাভ হইলেই 'পাত্রান্তর গ্রহণ করা কঠিন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ' তাহাও জানি, কিন্তু দগ্ধ সংসার মোহ ও অদম্য প্রলোভনের হস্ত হইতে যে আর পরিত্রাণ নাই! জানি—'বাহ্য-কুলতত্ত্বপঞ্চক' আচারহীন ব্যক্তিগণের উদ্ধারের জন্যই তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট, অথবা সমুচ্চ ক্রিয়াবান সাধকের আত্মপরীক্ষার * অন্তিম

* 'পূজাপ্রদীপে'—বীরভাবান্তর্গত 'বামাচার' সাধনা দেখ।

উপায়-স্বরূপ; জানি—পাকা বা শক্ত গুরু ব্যতীত এই উপায়ে চক্রানুষ্ঠান ও পূজার্চ্চনা অতি দুরূহ ব্যাপার ; সত্যের অনুরোধে মন্ত্রের টিপ্পনীতে তাহা আমিও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া থাকি, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহা আমি আদৌ পালন করিতে পারি নাই, কারণ আমি যে এক্ষণে এই 'মধুচক্রের' চক্রেশ্বর-গুরু! হায় হায়! আমার উদ্ধারকর্ত্তার কোনও সন্ধান নাই, আমিই আবার কত হতভাগ্য লোকের উদ্ধার-কার্য্যে যেন বদ্ধপরিকর!"

কি কুসংস্কার জানি না, এইরূপ বুঝিয়া সুঝিয়া কতলোকেই যে পাপের অতলজলে ডুবিয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই! কি জানি কি মোহবশে অন্ধ হইয়া এই 'পূর্ণাভিষেক-ব্যাপারেই' যেন সংসার-বাসনাবর্জ্জিত অষ্টপাশমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞবোধে সরল সাধন-শিশুগুলির মুখে (বিষের) 'পাত্র' ধরিয়া দেয়, ক্রমে তাহাদের সাধনার সারধন সেই 'পাত্রটীই' বোধ হয় ভবসাগরের শেষ ভেলারূপে পরিণত হয়। মুখে বলেন, আমি—বীর, কিন্তু কেবল নিন্দা ও লজ্জার ভয়ে ঘরের কোণে 'পাত্রটী' অতি সাবধানে গোপনে রাখিয়া দেন—আশঙ্কা, পাছে কোন 'অনধিকারী' বা তীব্র কটাক্ষকারী তাহা দেখিতে পায়! এতই সাহস, তথাপি কালামুখে 'বীরাচারী' বলিতে লজ্জা হয় না! হায় হায়! কি শোচনীয় অধঃপতন! আযাকুলাঙ্গার আমাদের এখন যেমনই সমাজ, তেমনই কি সাধনা!! ধিক্!!!

যথার্থ 'বীরাচারী' হইতে হইলে—শ্রীমৎ স্বামী আগমবাগীশ মহাশয়ের কথা স্মরণ কর, প্রকৃত বীরের ন্যায় প্রকৃতিকে করায়ত্ত কর, কামক্রোধাদি রিপুদলকে পদদলিত কর, ঘোর অমানিশায় তাঁহার ন্যায় অন্তরে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব কর, নতুবা এ দুর্দ্দিনে

শুধু মধুপানরত বীর সাজিও না ; তাই শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—"ন বীরো মদ্যপানতঃ"। অর্থাৎ কেবল মদ্যপান করিলেই বীরাচারী হয় না!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'তন্ত্রশাস্ত্র'—গুরুমুখাগত কুলবধূসম গুপ্তধন, ইহা শাম্ভবীবিদ্যা, সাধনশক্তিহীন সাধারণের ইহা অধিগম্য নহে। শ্রীসদাশিব পুনঃ পুনঃ নানাস্থানে তাহার এইরূপই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং সাধনার উন্নত ক্রম-বিধান কেবল সিদ্ধ-গুরুপরম্পরা-নির্দ্দিষ্ট মৌখিক গুপ্ত উপদেশ ব্যতীত কোনও সাধনশাস্ত্রে বা তন্ত্রের মধ্যেও স্পষ্ট লিপিবদ্ধ নাই। সেই কারণ বলিতেছিলাম, কেবল পঞ্চমকার-যোগে কালীপূজাই তান্ত্রিক-সাধনার সর্ব্বস্বধন নহে। শ্রীসদাশিব আরও সুস্পষ্টভাবে তন্ত্রান্তরে তাহাই বলিয়াছেন,—"আদৌকালী ততস্তারাঃ সুন্দরী তদনন্তরম।" অর্থাৎ তন্ত্রমার্গের প্রথমেই সাধারণভাবে কালীসাধনা হইলেও সাধকের অবস্থানুসারে অন্যান্য বহু সাধনা তাহাকে করিতে হয়। "সাধনপ্রদীপে" (বা তন্ত্ররহস্যের প্রথম খণ্ডে) সে সকলেরও কিছু কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী অংশে তাহার বিস্তৃত বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই পূর্ণাভিষেক ব্যাপারে "সাধনপ্রদীপোক্ত"—'শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকার ধ্যান-রহস্য' এবং "পূজাপ্রদীপের" (দ্বিতীয় ভাগে) চতুর্থ উল্লাসে—'শক্তিতত্ত্ব—ধ্যান-রহস্য' ভাল করিয়া পাঠ করিবে ও তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াই তাঁহার যথাবিধি 'মন্ত্র'জপদ্বারা অদম্য সাধনা করিতে হইবে। বিলাসিতা, আলস্য, আর কেবল মুখে সাধনার "পাকামো" এই তিনটী পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধ-গুরুর উপদেশমত রীতিমত সাধনভজনদ্বারা কালীসাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। গ্রাম্যভাষায়

এক প্রচলিত প্রবাদ আছে—"আঠে কাঠে দড় ত, ঘোঁড়ার উপর চড়"। সাধনা-ব্যাপার বাস্তবিক বালকের খেলার সামগ্রী নহে, বা কেবল 'বুকনিবাজী'ও নহে। বিধিমত প্রকারে গুরূপদিষ্ট ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হইবে। শ্রীশ্রী৺কালীপূজা-পদ্ধতিতে পূজার সকল অনুষ্ঠানই লিপিবদ্ধ আছে, তাহা দেখিয়াই সাধারণতঃ পূজা-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে সত্য, কিন্তু মনে রেখো বাবা "শক্তকথা কেহই ব্যক্ত করেন না;" সে স্থানে সকলেই যেন সুবোধ শিশুটীর মত নির্ব্বাক নিস্পন্দ! সে স্থলে কেবল তন্ত্রের 'অভয়-বচনটী' উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই অনেকে নিশ্চিন্ত! "পূজা-প্রদীপে" দর্শনমূলক উদার উপাসনাতত্ত্ব ও যোগতন্ত্র-বিজ্ঞানপূর্ণ 'পূজাবিধান' ভাল করিয়া দেখিলে অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

'পূর্ণাভিষিক্ত' হইয়াছ, গুরুর কৃপায় হয় ত 'পাত্রাধিকারও' পাইয়াছ, আনুষ্ঠানিক বাহ্য-পূজার আড়ম্বরে 'রহস্য-পূজার' সেই 'মকার' গুলির গুপ্ত উপদেশ, মধুমত্ত গুরুর নিকট ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়াছ, আজকাল অনেক মুদ্রিত তন্ত্রের টীকায় সে সব কথা, বেশ গুছাইয়া হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলা আছে, হয় ত তাহাও দেখিয়াছ—বেশ কথা; তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই; অধিকার-ভেদে তাহাও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ও অবশ্য প্রতিপাল্য, কিন্তু 'মাতৃকান্যাস' ও 'ভূতশুদ্ধি' প্রভৃতি পূজার এই সামান্য ক্রিয়ার সময়েও মাত্র সেই মন্ত্রকয়টীর উচ্চারণ ব্যতীত আর কোনও বিষয়ে লক্ষ্য করিয়াছ কি? অথবা গুরুমুখে কোনও উপদেশ পাইয়াছ কি? বড়ই সমস্যার কথা! কর্ম্মানভিজ্ঞ গুরু নিশ্চয়ই তখন গম্ভীরভাবে বলিবেন,—"বাবা, উহা কঠিন ব্যাপার, উহা এখন বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং উহার অনুকল্প এই 'মন্ত্রকয়টীই' উচ্চারণ বা জপ কর,

তাহা হইলেই তোমার 'আন্ত্রিক'-ভূতশুদ্ধির ফল হইবে।" কেন বাবা! তুমি ত উপযুক্ত গুরু সাজিয়াছ, তুমিত অম্লানবদনে শিষ্যকে 'পাত্র' ধরিতে দিয়াছ, চক্রের 'ঢং' 'ঢাং' 'ধরণ' 'ধারণ' বেশ করিয়া শিখাইয়া দিয়াছ! নিম্নঅধিকারী পানাসক্ত শিষ্যের পক্ষে সে সব ভালই করিয়াছ, উপযুক্ত বা ঠিক যেন পাকা গুরুর মতই কার্য্য করিয়াছ, তবে পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে কেবল কলসি (কাচপাত্র) বা ঐ বোতলান্তর্গত 'তরলতত্ত্বটা' না দেখাইয়া আসল কুলতত্ত্ব 'কুণ্ডলিনী জাগরণ' ও 'ভূতশুদ্ধি' আদি কঠিনতর ক্রিয়ার দ্বারা শিষ্যের 'উপ-নয়নে' তাহা দেখাইয়া দাও না! তাহা হইলে নিজের অকূল-পাথারের ন্যায় শিষ্যেরও পরকালটা একেবারে "ঝরঝরে" হইবে না; তাহা হইলে হয় ত বেচারা কোনদিন পরকালের পথে প্রকৃত কূলের আভাস পাইয়া এ জীবন সার্থক জ্ঞান করিতে পারিবে এবং যথাক্রমে পরবর্ত্তী 'দীক্ষাভিষেক' গুলিতে সদ্গুরুর কৃপায় নিজেই সাধনার বহু জটিলপথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।

যাহাহউক পূর্ণাভিষিক্ত সাধক, তোমায় আবার বলি, সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিও—কেবল পূর্ণাভিষিক্ত হইলেই মানুষ সিদ্ধ হয় না; তাহাতে গুরু-কৃপায় সাধনামার্গে তাহার গুরুতর কার্য্য করিবার প্রথম অধিকার বা সূত্রপাত হয় মাত্র। প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া অদম্য সাধনায় রত হও, তবেই একদিন সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। 'সাধনপ্রদীপোক্ত' ও 'পূজাপ্রদীপোক্ত' 'ধ্যান-রহস্য', মন্ত্র-রহস্য' ও 'পূজা-রহস্য' এবং গুরুর নিকট 'জপ্-রহস্যও' * এই সঙ্গে ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, আর

* 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'—মন্ত্রজাপকের 'পুরশ্চরণবিধি' দেখ।

পূজা-অর্চ্চনার সঙ্গে সঙ্গে সাধনার সহায়ক আসল কার্য্য—মনের একাগ্রতাপ্রদ 'যম', 'নিয়ম', 'আসন', 'প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ' ও 'ভূতশুদ্ধিটী' গুরুর নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়া লও; নতুবা কিছুই হইবে না ধন, কিছুই হইবে না! সাধন, ভজন, জপ্, তপ্, সমস্তই তোমার ব্যর্থ হইবে। সাধনার গূঢ় রহস্যকথা বস্তুতই অতি কঠিন, তন্ত্রে বা সাধনশাস্ত্রে কোনও স্থলেই সে কথা স্পষ্ট বা বিস্তৃত করিয়া বলা নাই; তাহা শিবের আজ্ঞায় চিরকালই কেবল সদ্-গুরুমুখাগত হইয়া রহিয়াছে। কঠিন 'ভূতশুদ্ধির' গূঢ়-রহস্যের ন্যায় উচ্চ-'অভিষেক'গুলিও তন্ত্রের পৃষ্ঠায় কদাচ নামমাত্রেই,উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরমপূজ্যপাদ অতিবৃদ্ধ আদি ব্রহ্মানন্দদেবের শিষ্য-পরম্পরায় অতি গুপ্তভাবেই তাঁহার বা তন্ত্রের আদিস্থান এই বাঙ্গালার 'সিদ্ধমঠসমূহে', যাহা এখনও অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে, তাহা এবং উক্ত ভূতশুদ্ধি আদি সাধনার ক্রমোন্নত গভীর বিষয়গুলির যথাসম্ভব আভাষ পরবর্ত্তী স্তবকে যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। 'পূজাপ্রদীপেও'—সাধনার অনেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়াছে। পাঠক, তাহা মনোযোগ দিয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবে। ওঁ সদাশিব ওঁ।

তৃতীয় উল্লাস।

ক্রমদীক্ষাভিষেক।

"রসেন্দ্রৈর্যথা বিদ্ধময়ঃ সৌবর্ণতাং ব্রজেৎ।
ক্রমদীক্ষাপ্রভাবেণ তথাত্মা শিবতাং ভবেৎ॥"

'পূর্ণাভিষেক'-সাধনার পর, 'ক্রমদীক্ষাভিষেক', গ্রহণ করা উচ্চাভিলাষী সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—

"আদৌকালী ততস্তারা সুন্দরী তদনন্তরম্" অর্থাৎ অগ্রে কালী, পরে তারা, তাহার পর সুন্দরী বা ত্রিপুরাসুন্দরীর সাধনা ব্যতীত কোনও সাধকই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে সহজে অগ্রসর হইতে পারেন না।

"ক্রমদীক্ষেতি বিখ্যাতা সর্ব্বদা সিদ্ধিকামতঃ।" এই ক্রম-দীক্ষাভিষেক সর্ব্বকামনা বা মন্ত্রযোগের সমগ্র সাধনার সারধন; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে ইহা সাধকের মধ্যস্তর বা দ্বিতীয়-ক্রমমাত্র। এই কারণেই ইহা 'ক্রমদীক্ষাভিষেক' বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। শ্রীসদাশিব তাই বলিয়াছেন :—

"কলৌপাপ সমাচারে সিদ্ধির্নস্যাৎ কদাচন।
সিদ্ধির্নস্যাৎ সিদ্ধির্নস্যাৎ কলৌনান্য বিধানতঃ॥
ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কলৌনস্যাৎ কদাচন।
ইতিজ্ঞাত্বা মহাদেবি ক্রমদীক্ষাং সমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ কলিকালে ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কিছুতেই ভগবৎ ভাব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। পূর্ণাভিষেকে প্রদত্ত-মন্ত্রের যথোক্ত জপ ও পুরশ্চরণাদি সম্পূর্ণ হইলে, সাধক ক্রমদীক্ষা-ভিষেক গ্রহণ করিবার উপযোগী হন। যদি ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর কৃপায় কাহারও ক্রমদীক্ষা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে। বাস্তবিক ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কলিযুগে উচ্চসাধনানুকূল জপ-পূজাদি মন্ত্রযোগের কোনও ক্রিয়া-কর্ম্মই অথবা কোনও মন্ত্রই সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং গুরুর নিকট অতি যত্নসহকারে ক্রমদীক্ষাভিষেক গ্রহণ করা মুক্তিকামার্থী প্রত্যেক সাধকেরই কর্ত্তব্য। তাই 'তন্ত্র' বলিয়াছেন :—

"যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি ক্রমদীক্ষাচ জায়তে।
তদাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য নাত্রকার্য্যা বিচারণা॥
ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কথংসিদ্ধিঃ কলৌভবেৎ।
সর্ব্বাশ্রমেষু ভূতেষু সর্ব্বদেবেষু সুব্রতে।
ক্রমংবিনা মহেশানি সর্ব্বং তেষাং বৃথা ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতোভবেৎ॥"

এই অভিষেকপ্রসঙ্গে গুরু যে মন্ত্র প্রদান করেন, তাহার সাধনার সময় 'ব্রাহ্মণ জাতীয়' সাধকের নানা বাধা-বিঘ্ন সহ্য করিতে হয়। কারণ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এই সাধনাকালে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া, তাঁহার অভীষ্ট তারা-মন্ত্রের প্রতি অভিসম্পাৎ প্রদান করেন, তাহাতে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া মহর্ষিকেও পুনরভিসম্পাৎ করেন। তদবধি দেবী ব্রাহ্মণ-সাধকদিগকে সামান্য উদ্বেগ প্রদান না করিয়া কিছুতেই 'মন্ত্র-সিদ্ধি' দেন না। "তারার্ণবে" সেই কথাই লিখিত আছে :—

"বশিষ্ঠারাধিতাবিদ্যা নতু শীঘ্রফলা যতঃ।
অতস্তেনাপি মুনিনা শাপোদত্তঃ সুদারুণঃ।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ॥"

তবে দেবীর শাপোদ্ধারকৃত সিদ্ধমন্ত্র সাধকের শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

শাপোদ্ধারমাহ।

"চন্দ্রবীজং ত্রপান্তস্থ বীজোপরি নিয়োজিতং।
ততোপ্রভৃতি বিদ্যেয়ং মধুরিব যশস্বিনী।
ফলিনী সর্ব্ববিদ্যানাং জয়িনী জয়কাঙ্ক্ষীনাং।
বিষক্ষয়করীবিদ্যা অমৃতত্ব-প্রদায়িনী॥"

অতএব দেবীর শাপোদ্ধারকৃত মন্ত্রই \ রুর কৃপায় গ্রহণ করিয়া তাহা জপ করিলে, সাধক সর্ব্বকার্য্যে জয়যুক্ত হইবেন। 'পূজা-প্রদীপে'—পূজা-বিধি, মন্ত্র ও জপাদিরহস্য দেখিয়া বুঝিয়া লও।

'রুদ্রযামলে' উক্ত আছে:—শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্ঠদেব মহাবিদ্যা তারাদেবীর দৈববাণী শ্রবণ করিয়া প্রথমে মহাচীনে 'আদি-তারাপীঠে' গমন করেন, পরে তথা হইতে পুনরায় তাঁহারই আদেশে 'বীরভূমীতে'—তারাপুরে আসিয়া উক্ত সিদ্ধ-মন্ত্র সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সিদ্ধিলাভ করেন। সেই 'তারাপুর' সম্বন্ধে—'যোগিনীতন্ত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়—

> "ঈশানে বক্রনাথস্য বৈদ্যনাথস্য পর্ব্বতঃ।
> তারাপুর মিদং খ্যাতং নগরং ভূবিদুর্ল্ভম্॥
> তত্র যত্নেন গন্তব্যং যত্র তারা শিলাময়ী॥"

এই 'তারাপুরে' বশিষ্ঠদেবের প্রতিষ্ঠিত তারামূর্ত্তির জীর্ণাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত পঞ্চমুণ্ডাসন এখনও সর্ব্বজনের অতীব আদরের ও পূজার বস্তু। কোন কোন মহাপুরুষের প্রমুখাৎ জানিতে পারা যায় যে, তিনি এক প্রাচীন শাল্মলী বৃক্ষের মূলে প্রথমে নিজ আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনারম্ভ করেন, পরে সেই স্থানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীমৎ আদি-শঙ্করাচার্য্যদেব তুঙ্গভদ্রা-নদীর তটে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে 'নীলসরস্বতী' (তারাদেবী-মূর্ত্তি) প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। তিনি কেবল যে, নিরাকার ব্রহ্মধারণা করাকেই অদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চারি-আম্নায় চারিটী মঠেই এক একটী দেবীরও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন (সে কথা 'জ্ঞানপ্রদীপের' ২য় ভাগে 'মঠাম্নায়-

রহস্য'-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে) এবং তদীয় শিষ্যবর্গকে সাকার-পূজারও উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা—"নাপ্রামান্যং সাকার-প্রতিপাদক-শ্রুতিনাং।" অর্থাৎ সাকার প্রতিপাদক শ্রুতিসকল অপ্রামাণ্য নহে। তিনি এইরূপ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা-কল্পেই পরমপূজ্যাপাদ আদি-ব্রহ্মানন্দদেবের আদর্শে নিজ প্রিয়-শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন :—

"মূর্ত্ত্যামূর্ত্তং উভয়াত্মকং ব্রহ্ম ! ॥"

অর্থাৎ "মূর্ত্তি ও অমূর্ত্তিরূপে ব্রহ্ম উভয়াত্মক, এইরূপ ঐক্যবাদীকেই প্রকৃত অদ্বৈতবাদী কহে। অতএব সগুণ-ব্রহ্মস্বরূপ পঞ্চদেবতার প্রতি দ্বেষরহিত হইয়াই ব্রহ্মার্চ্চনা কর ; যথেচ্ছাচার বিধির নিষেধ কর।" শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াই তিনি উক্ত তুঙ্গভদ্রা-তীর্থে অন্তিম "তারামূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং তাহার পূজাপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন। "শঙ্করবিলাসে" শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-দেবের নিম্নলিখিত সেই প্রার্থনা বাক্য-উদ্ধৃত আছে :—

"সাকারশ্রুতিমুল্লঙ্ঘ্য নিরাকার প্রবাদতঃ।
যদঘং মে কৃতং দেবি, তদ্দোষং ক্ষন্তুমর্হসি ॥
ত্বমেব জগতাংধাত্রী সারদে স্ব স্বরূপিনী।
তব প্র সাদাদ্দেবেশি মুকো বাচালতাং ব্রজেৎ ॥
বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্য বিপর্য্যয়ং।
দেবানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চ্চনং ॥
স্বমতং স্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূরি দুষ্কৃতং।
তৎক্ষমস্ব মহামায়ে পরমাত্মস্বরূপিনি ॥
কৃতাঘং পরিহ।..ায় তবার্চ্চা স্থাপিতাময়া।
অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাহূত সংপ্লব ॥"

"অর্থাৎ হে দেবি, সাকার-প্রতিপাদক-শ্রুতিকে নিন্দা করিয়া নিরাকার-প্রতিপাদক শব্দার্থ প্রতিপন্ন করাতে যে পাতক করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। তুমি জগন্মাতা, তোমার প্রসাদে মূক-ব্যক্তিও বাক্‌পটুতা লাভ করে। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মীদিগের সহিত বিচারজন্য বেদার্থকে বিপরীত করিয়াছি এবং দেবতাদিগের মন্ত্র, জপ, যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি যাহা খণ্ডন করিয়াছি, স্বীয় মত-স্থাপনার জন্য যে যে দুষ্কার্য্য করিয়াছি, হে সাবদে, সেই সমুদয় অপরাধ আমার ক্ষমা কর। আমার কৃত পাতকের পরিহারার্থ তোমার জাগ্রত প্রতিমা মৎকর্ত্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে। হে মাতঃ, এই প্রতিমায় আপনি কল্পকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করুন।

ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পক্ষে ক্রমসাধনানির্দ্দিষ্ট এই 'তারা-সাধনা' সকলেরই অতীব শ্রদ্ধাসহকারে করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাকার বা সগুণময়ী এই ব্রহ্মশক্তিমূর্ত্তির উপাসনাপথেই সাধক নির্গুণ ব্রহ্মো-পাসনায় পৌঁছিতে পারেন। 'পূজাপ্রদীপে'—শক্তিতত্ত্ব-অংশও এই সঙ্গে ভাল করিয়া বুঝিতে যত্ন করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মসাধনার মূলেই প্রথম 'কালী-সাধনা', পরে 'তারা-সাধনা' করিতে হয়, এই ক্রমদীক্ষা-কালেই সাধক সেই মধ্যপীঠ 'নীলসরস্বতীর' সাধনা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই এই সময় ব্রহ্মসাধনা ও প্রণব উচ্চারণের অধিকারী হন। স্ত্রী ও শূদ্রগণও এই সময় হইতে পরব্রহ্ম গোত্রভুক্ত হইয়া সদ্‌গুরুর কৃপায় গুপ্ত-উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু চক্রমধ্য ব্যতীত, সামাজিক-ভাবে প্রায় কাহাকেও তাহা ধারণ করিতে দেখা যায় না। তবে কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে, চড়ক-সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় মালাকারে তাহা গলায় ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান

সময়ে ক্রমদীক্ষিতের সংখ্যা এত বিরল যে, নাই বলিলেই হয়; সেই কারণ সচরাচর সেরূপ দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই।

চড়ক-উৎসবকে উচ্চ কৌল-সাধকগণ 'তারা-উৎসব' বা 'নীলের উৎসব' বলিয়াই বর্ণনা করেন। বাস্তবিক শ্রীজগদম্বা এই তারা-মূর্ত্তিতেই সৃষ্টিতত্ত্ব নিরোধ করিয়া প্রলয়ের বা মুক্তি দিবার জন্য যেন দণ্ডায়মান হইয়া আছেন। সাধক, সাধনপথে অধিকতর অগ্রসর হইলে, ক্রমে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

এই অভিষেক গ্রহণকালে শাক্তাভিষেক বা পূর্ণাভিষেকের ন্যায় কোন বিস্তৃত অনুষ্ঠানের বিধান নাই। ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষী সাত্ত্বিক-সাধক, প্রথমে জগদম্বা দশমহাবিদ্যার আদ্যাশক্তি বা 'দক্ষিণ-কালিকার' যথারীতি পূজা ও জপাদি সম্পন্ন করিয়া, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌গুরুর সন্নিধানে ক্রমদীক্ষাভিষেকের প্রার্থনা করিবেন। শ্রীমদ্ গুরুদেব শিষ্যের অবস্থা ও পূর্ণাভিষেক অধিকারের সাধনা-কার্য্য এবং যথাশাস্ত্র পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণাদি * ক্রিয়া কতদূর কি ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া পূর্ণাভিষেকের অনুরূপভাবেই জগদম্বার ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠান করিবার উদ্দেশে ঘটস্থাপনাদির ব্যবস্থা করিবেন। পরে শিষ্য নিম্নলিখিতরূপে ক্রমদীক্ষার 'সংকল্প ও গুরুবরণ' করিবেন।

ক্রমদীক্ষারসংকল্প-মন্ত্র যথা —

"ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ পরব্রহ্ম-গোত্রঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথঃ (স্বপত্নী-সহিত) সর্ব্বসিদ্ধিঃ তথা ব্রহ্মক্রিয়া-শক্তিসিদ্ধ্যর্থং শ্রীমদ্ গুরুদ্বারা মৎকর্ত্তব্য

* 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'—'পুরশ্চরণ বিধান' দেখ।

শ্রীকৌলধর্ম্মান্তর্গত ক্রমদীক্ষাভিষেকাঙ্গীভূত শ্রীমত্তারিণী-মন্ত্রদ্বারা শ্রীমত্তারা-দেবতার্চ্চিত ঘটস্থ মন্ত্রপূত-ক্রিয়াশক্তিসমন্বিতসিদ্ধ-সলিলেন ক্রমদীক্ষাভিষেক কর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এইবার সাধক করযোড়ে গুরুর অর্চ্চনা ও যথাবিধি গুরুবরণ করিবেন। *

শিষ্য বলিবে—"ওঁ সাধুভবানাস্তাং"। গুরু বলিবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে"। শিষ্য—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামোভবন্তং"। গুরু—"ওঁ অর্চ্চয়"। পরে শিষ্য গন্ধপুষ্পাদি অর্চ্চনীয় উপকরণ (যেরূপ পূর্ণাভিষেক-কালে বলা হইয়াছে) শ্রীগুরুদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণজানু ধারণপূর্ব্বক বলিবে—"ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ পরব্রহ্ম-গোত্রঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথঃ মৎসঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধয়ে শ্রীমত্তারিণী-মন্ত্রদ্বারা শ্রীমত্তারা-দেবতার্চ্চিতঘটস্থসিদ্ধসলিলেন শুভ ক্রমদীক্ষাভিষেকার্থং পরব্রহ্ম-গোত্রং (সশক্তিকং) শ্রীমৎস্বামী অমুকানন্দনাথং ভবন্তং গুরুত্বেন অহং বৃণে।"

গুরুদেব বলিবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি"। শিষ্য বলিবে—"ওঁ যথাবিহিত গুরুকর্ম্মকুরু"। গুরু—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।"

অনন্তর গুরুদেব স্বয়ং বা শিষ্যদ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত ঘটে ক্রিয়াশক্তি-শ্রীশ্রীমত্তারাদেবীর যথাশক্তি উপচারে পূজাপদ্ধতি-অনুসারে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। দেবীর স্তব

* পূর্ণাভিষেকদাতা গুরুর নিকটেই ক্রমদীক্ষাভিষেক গ্রহণ করিলে, এরূপভাবে স্বতন্ত্র গুরুবরণের প্রয়োজন হইবে না। সে অবস্থায় যথাশক্তি তাঁহার চরণে পূজা করিলেই হইবে।

ও কবচ পাঠ করিবেন; এবং সমাগত উচ্চাধিকারী কৌলগণ-সহযোগে গুরুদেব পূর্ণাভিষেক-অনুষ্ঠানের অনুরূপভাবেই শ্রীশ্রীমত্তারিণী-মন্ত্র চিন্তা করিতে করিতে সেই ঘটে শক্তিসঞ্চার করিবেন; এবং কলসোপরি গুরুদেব ১০৮ বার তারিণী-মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মকলস উত্থাপনের নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কলস উঠাইবেন।

"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ।
ত্বত্তোয় পল্লবৈসিক্তঃ শিষ্যোব্রহ্মরতোঽস্তমে॥"

অনন্তর সেই কলসস্থিত সিদ্ধ-ক্রিয়া-বারি তাম্রকুণ্ডে বা অন্য কোন গভীর প্রশস্ত-মুখ-পাত্রে নিহিত করিয়া ঘটস্থিত পঞ্চপল্লবের দ্বারা (১০৮ বার) "হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ তারিণীঃ সিঞ্চামি" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট শিষ্যকে তারিণীমন্ত্র চিন্তাকরিয়া ক্রমদীক্ষাভিসিঞ্চন প্রদান করিবেন। গুরুদেব বাম-হস্তস্থিত স্ফটিক বা মহাশঙ্খ-মালায় মন্ত্রের সংখ্যা রাখিবেন। এই সময় ইচ্ছা করিলে ও সুবিধা হইলে গুরুদেব পূর্ণাভিষেকের মন্ত্রও উচ্চারণপূর্ব্বক অভিষিঞ্চন করিতে পারেন। তাহারপর গুরুপরম্পরায়-প্রচলিত তারিণী-মন্ত্রের যথাবিধি দীক্ষাপ্রদান করিবেন। যথারীতি অভিষেক ও দীক্ষান্তে সাধক শ্রীগুরুপাদুকা পূজা করিয়া অবস্থানুসারে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবেন এবং কৌলতৃপ্তি-কামনায় যথাসাধ্য উপচারে উপস্থিত কৌলসাধক-দিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিবেন। ইতঃমধ্যে সাধক দীক্ষাগ্রহণান্তর তারিণীমন্ত্রেই যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া হোমকার্য্য সমাধা করিয়া লইবে।

অশৌচত্যাগ ঃ—

এই সাধনার সময় হইতে সাধকের অশৌচকাল লাঘব করিতে হয়। অর্থাৎ ইহাই সাধকের 'শোক-বিজয়' অথবা 'পার্থিব আনন্দ-বিজয়-সাধনা'। বাস্তবিক মনুষ্য যতদিন কোনও আত্মীয়-বিয়োগে শোকে মুহ্যমান থাকে, অথবা পুত্রাদির জনন-জন্য উৎফুল্ল-হৃদয় থাকে, অর্থাৎ যতদিন জ্ঞাতি-আত্মীয়ের জনন বা মরণ-জন্য চিত্ত আনন্দে কিংবা শোকে প্রতিনিয়ত স্পন্দিত হইতে থাকে, হৃদয়ের সেই স্পন্দন-হেতু ততদিনই তাহার প্রকৃত অশৌচকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সেকালে ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধকাল-সংখ্যা দশদিনের মধ্যেই জ্ঞাতির বিয়োগ বা সংযোগ-জনিত শোক ও আনন্দবেগ বিদূরিত করিতে পারিতেন, এইহেতু দশদিনই তাঁহাদের অশৌচকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য বর্ণ যথাক্রমে দীর্ঘতরকাল, শূদ্র ক্রমে একমাস, এতদ্ব্যতীত সকলেই বর্ষ বা কালাশৌচ ভোগ করিতেন। সে নিয়ম এখনও এদেশে প্রচলিত আছে।

এই প্রসঙ্গে শৌচাশৌচ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলি। অশৌচকালে সন্ধ্যাপূজাদির বিধি নাই, আবার অশৌচ-অবস্থা না হইলেও—প্রতি সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও দ্বাদশীতে 'সায়ংসন্ধ্যানাস্তি' বলিয়া পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারও তাৎপর্য্য বা কারণ ঐ হৃদয়ের স্পন্দন বা চাঞ্চল্য-মাত্র। পূজা বা 'সন্ধ্যার' প্রতিপাদ্য বিষয় অভীষ্টদেবতা বা ভগবানের সম্যক্ প্রকারে 'ধ্যান' (সম্+ধ্যৈ+অঙ্—সন্ধ্যা। পাণিনীয় মতে 'ধ্যৈ' অর্থে ধ্যান।) বা উপাসনা করা। পূজ্যপাদ ঋষিগণ সতত প্রকৃত কর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন, সাধনার নামে

কেবল কতকগুলা বাহ্যানুষ্ঠানসহ উপাসনার অভিনয় বা ঢং করিতে বলেন নাই। 'সন্ধ্যা' বা ধ্যানমূলক উপাসনাকার্য্য সাধকের হৃদয় বা মনের সহিতই প্রগাঢ় সম্বন্ধযুক্ত। মন যদি কোনও কারণে স্পন্দিত বা চঞ্চল হয়, তবে মনের ধ্যেয়-বস্তুতে লক্ষ্য স্থির হইবে কেমন করিয়া? মন যখন কোন কারণবশতঃ বা স্বভাবতঃ স্পন্দনতা-হেতু ধ্যান করিতে অসমর্থ, তখন আর সন্ধ্যা-পূজার ভান করিয়া লাভ কি? সুতরাং তখন তোমার পূজা-সন্ধ্যা নাস্তি। মনের ঐরূপ স্পন্দন-সময়ই মানবের অশৌচকাল বলিয়া কথিত। সে হিসাবে জীব নানা কর্ম্ম-সম্পর্কে ভগবানে প্রায় মন ঠিক রাখিতে পারে না বলিয়া সততই তাহারা অশুচি হইয়া রহিয়াছে। আর্য্য-আচার বা বিধি-নিয়মের মধ্যে এমন কোনও কর্ম্ম নাই, যাহা ভগবৎ-স্মরণ না করিয়া হইতে পারে। আহার, নিদ্রা, জাগরণ, শয়ন, উপবেশন, কথন, এমনকি চিন্তনাদি সকল কর্ম্মেই শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে হয়, অর্থাৎ সকলকে সর্ব্বদা শুচি হইয়া প্রত্যেক কর্ম্ম করিতে হয়। তাই শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন:—

"অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥"

অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি অপবিত্র বা পবিত্র অথবা যে কোনও অবস্থা প্রাপ্ত হউক না, কমলনয়ন শ্রীভগবানকে বা নিজ ইষ্টদেবতাকে একবারমাত্র অন্তরের সহিত স্মরণ করিলে, তাহার দেহের বাহ্য ও অন্তর সর্ব্বত্রই পবিত্র হইয়া যায়। সেই কারণ আর্য্যের সকল কর্ম্মের পূর্ব্বেই এই 'মন্ত্রটী' একবার উচ্চারণ করিবার বিধি আছে। ইহাতেই বুঝা যায়, জীব শুচি না হইয়া কোন শুভ কর্ম্মই করিবার অধিকারী নহে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণের অশৌচ-কাল দশদিন, কিন্তু উন্নত সাধনপরায়ণ বা বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণের অশৌচ-কাল একদিনমাত্র শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট, আবার সিদ্ধ সাধক বা সন্ন্যাসিগণের অশৌচ-ব্যবস্থা আদৌ নাই, অথবা শ্রবণ-মুহূর্ত্তমাত্রই তাঁহাদের অশৌচকাল, কারণ তাঁহারা জগদম্বার কৃপায় প্রকৃতির নশ্বর সংসারলীলা অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-রহস্য তখন যথার্থভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও জন্ম বা মরণ-জন্য চিত্তের আর চাঞ্চল্য হয় না। ক্রমদীক্ষাভিষেকান্তে উপযুক্ত সাধক সেই সাধনারই ক্রমশঃ অনুশীলন ও পুষ্টিবিধানের জন্য এই সময় হইতে শৌচান্তে বস্ত্র-পরিবর্ত্তনাদি সাধারণ বা সামান্য শুচি-অশুচির ভাবও চিত্ত হইতে পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করেন। অর্থাৎ "সাধনপ্রদীপোক্ত" নবধা-আচারের অন্তর্গত দক্ষিণাচার, যাহা পূর্ব্বসাধিত পূর্ণাভিষেক বা দক্ষিণকালিকা-সাধনার সময় পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এক্ষণে 'ক্রমদীক্ষিত' সাধক 'সিদ্ধান্তাচার' ও 'বামাচারের' অন্তর্গত ক্রম-সাধনার মধ্যস্তরে পূর্ব্বাভ্যস্ত সংস্কারসমূহ এই নব-বিধানের সহিত ক্রমে বিচারদ্বারা তাহাদের শৌচাশৌচপুষ্ট হৃদয়ে দৃঢ়তর করিতে থাকেন। গুরুদেবের আদেশক্রমে, সাধক এখন হইতে 'অধিক উপবাস' ও 'অভুক্ত অবস্থায় বাহ্য-তপঃ-পূজা বা জপাদি' করিবার প্রথা পরিত্যাগ করেন। অথবা ক্রমদীক্ষান্তেই অন্তরে নির্ব্বিকার হইবার জন্য জগদম্বার প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক তাম্বূল-চর্ব্বণ করিতে করিতেই নিজের জপাদি সাধন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ক্রমদীক্ষিত-সাধক, বিশেষ ব্রাহ্মণ-সাধকমাত্রের অতি অবশ্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই সাধনাটী

যত সত্বর সম্ভব সম্পন্ন করা বিধেয়, সাধ্যমতে সাধনায় কোন প্রকারে আলস্য, অবহেলা বা কালবিলম্ব করিবে না, তাহাতে সিদ্ধির পক্ষে বিষম বিঘ্ন হইতে পারে। আচার-নাশের সাধনায় অলক্ষ্যে অনাচার ও ব্যাভিচার অভ্যাস হইয়া যাইতেও পারে। তাই গুরুমণ্ডলী একবাক্যে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া থাকেন। পূর্ণাভিষিক্ত সাধক যে যন্ত্র-মন্ত্রসাধনায় ইতঃপূর্ব্বে ইচ্ছাশক্তির (Will-Power) উন্মেষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ক্রমদীক্ষিত সাধক, সেই ইচ্ছাশক্তি-বলেই আজ অনন্ত ব্রহ্ম-সাধনার পথে ক্রিয়াশক্তির উদ্বোধন করিবার জন্য এই ক্রম-সাধনা-নির্দ্দিষ্ট জপ-পূজাদি একান্ত মনে সম্পন্ন করিবে। "সাধনপ্রদীপে" ও "পূজাপ্রদীপে" আদ্যাশক্তি-রহস্যে শ্রীশ্রী৺দক্ষিণকালিকার ধ্যান-মন্ত্রের যেরূপ আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের গভীর সাধনার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে— সাধক, সেই ভাবে ক্রম বা সাক্ষাৎ ক্রিয়া-শক্তিস্বরূপা তারাদেবীর ধ্যান-মন্ত্র ও তাহার 'আধ্যাত্মিক-রহস্য' বিষয়ে এইবার চিন্তা করিবে।

ক্রম বা ক্রিয়া-শক্তি—তারা-রহস্য ঃ—

ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ক্রম বা ক্রিয়া-শক্তিই স্বয়ং তারাদেবী। 'তারার্ণবাদি' তন্ত্রের মধ্যে সেই তারাদেবীর নিম্নলিখিতরূপধ্যান করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাংকটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভুষিতাং।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং॥
খড়্গাকর্ত্তৃসমাযুক্তসব্যেতরভুজদ্বয়াং।

কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিযুগান্বিতাং।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং।
বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রয়ভূষিতাং॥
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং।
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারভূষিতাং॥
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং॥

দেবীর এই ধ্যান-মন্ত্রের রহস্য-বিষয়ে সাধক এইবার চিন্তা করিবে ও কালী-তারা অভেদ-জ্ঞানে পূজার্চ্চনা করিতে ভুলিবে না। শ্রীসদাশিব সেই কারণ 'মুণ্ডমালা' তন্ত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন;—

"যথাকালী তথাতারা এক দৈব হি ভিন্নতা।

*　　*　　*　　*

কালীতারাসমাবিদ্যাচারে স্তুতিবিবরণে॥
যন্ত্রে মন্ত্রে ফলং তুল্যং ন বিশেষঃ কথঞ্চন।
ইত্যেবং ভেদবুদ্ধ্যাতু কথিতং চরিতং প্রিয়ে॥
অভেদবুদ্ধ্যা দেবেশি সর্ব্বাস্বল্যা ন সংশয়ঃ।
শ্রীমদেকজটাদেবী উগ্রতারা সরস্বতী॥
ব্যালানাং দমনে কৃষ্ণরক্ষণে যমুনাজলে।
পপাত তারিণীবিদ্যা নীলবর্ণাসরস্বতী॥
দেবৈশ্চৈব হি দেবেন্দ্রৈর্যোগীন্দ্রৈঃ সাধকোত্তমৈঃ।
সাধকৈর্মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ কিন্নরৈঃ খগৈঃ॥
বিদ্যাধরৈর্নরৈকৈশ্চ নানা ঋষিগণৈরপি।
আরাধিতা মহাকালী মহানীলসরস্বতী॥
বদন্তি সাধকাঃ সর্ব্বে কালীং কালবিনাশিনীম্।
নীলাং সরস্বতীং বিদ্যামুগ্রতারাং মনোহরাম্॥

কালীকায়াশ্চ তারায়া মাহাত্ম্যং দেবদুর্লভম্।

কঃশক্নোতি মহীমধ্যে তস্য মাহাত্ম্যকোবিদঃ।" ইত্যাদি।

সুতরাং তারাদেবীর মন্ত্র ও অর্চ্চনাবিধি সামান্য ভিন্ন-প্রকারের হইলেও, পূর্ব্ব-সাধিত ইচ্ছাশক্তিরই ক্রম-অনুসারে ক্রিয়াশক্তি-তারা বা নীলসরস্বতীর সাধনা করিতে হইবে। সাক্ষাৎ ভাবে ক্রিয়া-সাধনার অনুভূতি এই সময় হইতেই সাধকের উপলব্ধ হইতে থাকে।

ক্রিয়াশক্তি-রূপিণী এই দ্বিতীয়া মহাবিদ্যাদেবীর অনেক নাম; ইঁহাকে কেহ—'নীলসরস্বতী' বলেন, কেহ—'একজটা' বা 'তারাদেবী', কেহ—'কামতারা', কেহ—'তারিণী', আবার কেহ বা—'উগ্রতারা' ইত্যাদি নামে অভিহিত ও অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

"তথা লীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী"

ইনি সাধককে বিশিষ্ট-বাক্-শক্তি প্রদান করেন, এই হেতু ইনি বাগ্বাদিনী "নীলসরস্বতী" বলিয়া উক্তা হন। আবার :—

"তারকত্বাৎ সদাতারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী"

ভব-যন্ত্রনা হইতে ত্রাণ করিয়া পরম সুখ ও মোক্ষ প্রদান করেন বলিয়া "তারা" ও 'তারিণী' আদি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন; এবং

"উগ্রাপত্তারিণীযস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা।"

অর্থাৎ সাধকের উগ্র-আপদ্সমূহ নাশ করেন বলিয়া, "উগ্রতারা" নামে ইনি প্রকীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। যাহাহউক তারাদেবী কালিকাদেবীরই বিভিন্ন রূপমাত্র, কিন্তু ইহার মন্ত্র যে স্বতন্ত্রবিধ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই সিদ্ধমন্ত্র-সমষ্টি—'রশ্মি-পঞ্চকসংযুক্ত'। তন্ত্রে 'রশ্মি' অর্থে—'বর্ণ' বুঝিতে

হইবে। সুতরাং সেই মন্ত্র, পাঁচটী বর্ণের সমষ্টিজাত। তাহা পঞ্চ-ভূত-সিদ্ধির-পক্ষে যেমন সহায়ক, তেমনি সহসা অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি ও বেদাদি গভীর ব্রহ্ম-বিজ্ঞানময় শাস্ত্র সকলের অভ্রান্ত জ্ঞান-প্রদায়ক। সাধকগণ সাধনার অনেক রহস্য বা গুপ্ত-বিষয় এই সময়েই অনুভব করিয়া প্রকৃত জ্ঞানমার্গের পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন। তারাদেবীর ধ্যান-মন্ত্রে—"প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং ইত্যাদি, যাহা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার স্থূল অর্থ এইরূপ :—দেবী প্রত্যালীঢ়পদা, অর্থাৎ শবরূপী শিবের বক্ষোপরি দেবীর বামপদ অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিন্যস্ত রহিয়াছে, ইনি ঘোরবর্ণা, ইহাঁর গলায় মুণ্ডমালা বিভূষিত রহিয়াছে, ইনি খর্ব্বাকৃতি এবং লম্বোদর-বিশিষ্টা, ইহাঁর কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত। ইনি নবযৌবন-সম্পন্না এবং ইঁহার মস্তক পঞ্চমুদ্রায় * অলঙ্কৃত রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্বেত-অস্থির পট্টিকাবিশিষ্ট পঞ্চ-নরকপালদ্বারা শোভিত রহিয়াছে। ইনি চতুর্ভুজা ও ললজ্জিহ্বা-বিশিষ্টা, ভীষণরূপিণী কিন্তু বরপ্রদা! ইহাঁর দক্ষিণকরদ্বয়ে খড়্গ ও কর্ত্তরী, কাটারি বা কাতান, এবং বামকরদ্বয়ে নর-কপাল ও প্রফুল্ল নীলকমল ধৃত রহিয়াছে, ইহাঁর শিরোদেশে উগ্রপিঙ্গলবর্ণের একটী জটা শোভা পাইতেছে। তাহারই উপর 'অক্ষোভ্য-ঋষি' স্ত্রী-নাগ বা নাগিনীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

* শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেব—"তন্ত্রচূড়ামণিতে" বলিয়াছেন—'পঞ্চমুদ্রা' অর্থাৎ শ্বেতাস্থি-নির্ম্মিত পট্টিকা-চতুষ্টয়সহ পাঁচটী নরকপাল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—তুঙ্গভদ্রাতীর্থে আদি শঙ্করাচার্য্যদেব নীলসরস্বতী-তারাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং পূজা করিয়াছিলেন এবং "তন্ত্রচূড়ামণি", 'প্রপঞ্চসার' ও অন্যান্য সংগ্রহতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর নয়নত্রয় অতি উজ্জ্বলভাবে শোভিতা। দেবী প্রজ্বলিত-চিতাগ্নিমধ্যে ভীষণ দন্তপঙ্‌ক্তি বাহির করিয়া যেন করালমূর্ত্তিতে অবস্থিতা, কিন্তু তিনি আপনার আবেশে আপনি সহাস্যবদনা। স্ত্রী-জনসুলভ বিবিধ রত্নালঙ্কারে দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শোভিতা রহিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপক অনন্ত-অম্বুরাশির মধ্যে এক বিরাট শ্বেতপদ্মোপরি দেবী এই ধ্যানবর্ণিত-মূর্ত্তিতে বিরাজমানা রহিয়াছেন। তারাদেবীর এই ভাব-বোধক ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান-মন্ত্র অন্যান্য তন্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধক মাত্রেই পূজাকালে তারাদেবীর এইরূপভাবেই ধ্যান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধ্যান করিবার পূর্ব্বে সাধককে তন্ত্রোক্ত আরও কয়েকটী বিষয়ে সামান্য মনোযোগ দিয়া ধীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কালী-তারা অভেদ-মূর্ত্তি; যিনি কালী, তিনিই তারা। যদি তাহাই হয়, তবে আবার বিবিধরূপ ধ্যান-মন্ত্রের আবশ্যক কি? 'তন্ত্ররহস্যের' প্রথমখণ্ডে (সাধনপ্রদীপে) উক্ত হইয়াছে,—আর্য্য-ঋষি-প্রবর্ত্তিত সাধন-প্রণালী কোনরূপেই ভিত্তিহীন নহে, সকল সাধনারই অতীব গভীর উদ্দেশ্য গুরুমুখে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই অনন্ত ও অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তা বা ব্রহ্মধ্যান উপভোগ করিতে স্ব স্ব বুদ্ধি ও অধিকার-অনুসারে তেত্রিশকোটি বিভিন্ন দেবদেবীর স্থূলভাব বা মূর্ত্তির যথাক্রমে উপাসনা করিতে হইবে, অথবা জগতের প্রত্যেক নরনারী, জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, প্রস্রবণ আদি প্রকৃতির তেত্রিশকোটি কেন, অনন্তকোটি বিভিন্ন বস্তুতে তিনি সতত বিদ্যমান, এই সকলের মধ্যেই সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বা

পরমাত্মার প্রত্যক্ষস্বরূপ পরিদর্শন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি কেবল মুখের কথায় সিদ্ধ হইতে পারে? ব্রহ্মের সেই অদ্ভুত অদ্বৈত-ভাব জন্ম-জন্মান্তরের কত হাজার হাজার বৎসরের বিভিন্ন সাধনায় তাহা যে উপলব্ধ হইবে, তাহা সেই ত্রিকালদর্শিনী সাধকতারিণী মা তারাই জানেন। 'সাধনপ্রদীপে' (প্রথমখণ্ড 'তন্ত্ররহস্যে') "আদ্যাশক্তি-তত্ত্ব" নামক পঞ্চম উল্লাসে "মূর্ত্তিপূজক কে?" ইতি শীর্ষক অংশে জল ও তুষার-ন্যায়ের বিষয় বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে, যদি না থাকে, তবে সেই অংশ এখন আর একবার পাঠ করিয়া দেখ, আর নয়ন মুদ্রিত করিয়া একান্তে চিন্তা কর, তাহা হইলেই সহজে বুঝিতে পারিবে যে, সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্তের উপলব্ধি করিতে তাঁহার সান্তরূপ কল্পনার এত প্রয়োজন কেন? জ্যামিতির একটী স্বতঃসিদ্ধ আছে:—যদি একটী বস্তু অন্য একটী বস্তুর সহিত সমান হয়, তাহা হইলে, তাহার সহিত সমতা-বিশিষ্ট সকল বস্তুই পরস্পর সমান হইবে, সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন একটী পরমাণুর মধ্যেও যদি তোমার কোনও সাধনফলে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তার অতি অস্পষ্ট একটুমাত্রও অস্তিত্বের আভাস অনুসন্ধান করিতে পার বা তাহার অনুসন্ধান পাও—তাহা হইলে, কালে অন্য বা প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেই অথবা তাহাদের সমষ্টির মধ্যে সেই বিশ্বব্যাপক পরমাত্মার সুস্পষ্ট ও বিরাট অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। তাহা হইলেই ভূধর-প্রান্তরে, স্থাবর জঙ্গমে, গ্রহ-নক্ষত্রে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে সেই অনন্তের অব্যক্তলীলা সাধকের উপলব্ধ হইবে। তাই সাধক আজ অনন্তের অতি নিকটে আসিয়া 'যন্ত্র' বা পুরুষ-প্রকৃতিরূপ যুগ্ম-সাকার-মূর্ত্তির উচ্চতর ক্রমসাধনায় 'কালী'

হইতে 'তারার' সামান্য ভিন্নরূপ ধ্যানের আয়োজন করিতেছে।

এই ক্রম-সাধনায় তারামূর্ত্তি ধ্যান করিবার পূর্ব্বে যে সকল সাধন-বিধি আছে, সে সম্বন্ধে দেবাদিদেব শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

প্রথমে তারা-প্রকরণ-নির্দ্দিষ্ট আচমন, আসনশুদ্ধি ও 'কামনীদেবী' চিন্তা প্রভৃতি সম্পন্ন করিতে হইবে। ('পূজা-প্রদীপে'—এই সকল বিষয় ভাল করিয়া দেখিয়া ও প্রথমে বুঝিয়া, তাহাতে অভ্যস্ত হও।) সাধকের পুনঃ পুনঃ স্মরণ থাকে যেন যে, 'ভূতশুদ্ধি' ব্যতীত পূজার্চ্চনা জপ-সমাধির কোন উচ্চ ক্রিয়াই সিদ্ধ হইবে না। (এই গ্রন্থের স্থানান্তরে ও 'পূজাপ্রদীপে' এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে দেখ।) সাধক সেই ভূতশুদ্ধির দ্বারা শূন্যময় বিশ্বের চিন্তা সহজে করিতে সমর্থ হইবে। অনন্তর দেবীর ধ্যান করিবার সময় আসিবে, তখন সাধক স্বীয় আত্মাকে নির্লেপ, নির্গুণ শুদ্ধদেবতাস্বরূপ চিন্তা করিবার জন্য অন্তরীক্ষমধ্যে নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান অভ্যাস করিবে।

প্রথমে 'আঃ' এই মন্ত্রাত্মকবর্ণকে রজোগুণের ভাববোধক একটী রক্তকমল, তাহার উপর 'টাং' এই মন্ত্রাত্মকবর্ণকে সত্ত্বগুণের ভাববোধক একটী শ্বেতপদ্ম, এবং তদুপরি 'হূং' এই মন্ত্রাত্মকবর্ণকে তমোগুণের ভাববোধক একটী নীলপদ্ম ধ্যান করিবে। অনন্তর সেই 'হূঁ'কারজ নীলকমলের বীজকোষ-ভূষিত একটী কর্ত্তৃকা বা কাটারির দর্শন অথবা চিন্তা করিবে, তাহারই উপর সাধক আপনাকে পুনরায় 'তারিণীময়' কল্পনা করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত "প্রত্যালীঢ় পদাং ঘোরাং ইত্যাদি" রূপে ধ্যান করিবে। ক্রমদীক্ষিত সাধক, এখন সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছ যে, তাঁহার সাধনক্রিয়া

ক্রমে কত গুরুতর হইয়াছে, এখন আপনাকে অর্থাৎ 'অহংজ্ঞানকে' কি ভাবে দেবীর অনন্ত ও অচল রূপসাগরের মধ্যে মিশাইয়া দিতে হইবে! কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যাহা সহসা অতি কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, সাধনকৌশল অবগত ও আয়ত্ত হইলে, তাহাই তখন অতি সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয়। সেই কৌশলসমূহই সাধনার বা যোগক্রিয়ার 'ক্রম'। গুরুকৃপায় তাহাই শ্রদ্ধাসহকারে সংগ্রহ করিতে হয় এবং আলস্য ও সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্থির বিশ্বাসের সহিত তাহার কার্য্য করিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'সাধনপ্রদীপোক্ত' আদ্যাশক্তি তত্ত্বের মধ্যে বা দক্ষিণা কালীরহস্য ও 'পূজাপ্রদীপের' চতুর্থ উল্লাসের মধ্যে 'শক্তিতত্ত্ব-ধ্যান-রহস্য' অংশে, বিশেষ উহারই মধ্যে "সচ্চিন্ময়ী মায়ের স্বরূপ বুঝিবার ক্রম" বর্ণনার মধ্যে জগজ্জননী মহামায়ার যেরূপ ধ্যান প্রক্রিয়া বলা হইয়াছে, সাধক, সেইভাবে প্রথমে অগ্রসর হইয়া পরে তারাধ্যান করিতে যত্ন করিবে। অর্থাৎ শ্রীশ্রীমত্তারাদেবীরও ধ্যানরহস্য সাধককে তেমন ভাবেই চিন্তা করিতে হইবে। দৃঢ়া ভক্তিভাবে সাধনার সহিত চিন্তা করিলে সে রহস্য সাধকের আদৌ অবিদিত থাকিবে না। তবে সাধকের সেই চিন্তা করিবার পক্ষে সামান্য সহায়তা হইতে পারে ভাবিয়া, এইস্থানে অতি সংক্ষেপে 'তারা-ধ্যান-রহস্যের' দুই একটী কথার আভাষ প্রদত্ত হইতেছে। সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সামান্য মনোযোগ সহকারে ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, সকল রহস্যই তাহাদের অতি সহজ বলিয়া বোধ হইবে।

ইতঃপূর্ব্বে তারাদেবীর ধ্যান-প্রক্রিয়া যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে 'স্থূল-ভূতশুদ্ধির' ক্রিয়াদ্বারা প্রথমে নিজ স্থূলদেহসহ

সমগ্র বিশ্ব শূন্যরূপ চিন্তাপূর্ব্বক অন্তরীক্ষমধ্যে পূর্ব্বকথিত ভাবে একটী রক্ত-কমল, পরে তদুপরি একটী শ্বেত-কমল, অনন্তর তাহার উপর একটী নীল-কমল চিন্তা করিতে হইবে, এই ক্রিয়া উপলক্ষে সাধক, নিজ মূলাধার স্থানে উক্ত—'রক্ত কমল', স্বাধিষ্ঠান স্থানে—'শ্বেতকমল' ও মণিপুরস্থানে—'নীলকমল' চিন্তা করিতে পারিবে। এই কমলত্রয়ই যথাক্রমে রক্ত বা 'রজঃগুণ', শ্বেত বা 'সত্বগুণ' এবং নীল বা 'তমঃগুণের' সমাবেশ বুঝিতে হইবে। যখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই 'ভূতশুদ্ধির' ফলে শূন্যময় বোধ হইতেছে, তখনও নির্গুণ-ব্রহ্মের প্রকৃতিরূপ শক্তিত্রয়সম্ভূত গুণত্রয়ের ভাব সাধকের অন্তরে বর্ত্তমান থাকে; যতক্ষণ সেই ভাবময় গুণত্রয় অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কখনই হইতে পারিবে না। কারণ ব্রহ্ম যে, নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মক সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভাবত্রয় চিন্তার এবং সেই জ্ঞানের নাশ কিংবা তাহার ছেদন করিবার জন্যই উক্ত কর্ত্তৃকা, কাটারি বা কাতানখানি পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণভাব-প্রতিপাদক কমলত্রয়ের উপর অবস্থিত। সাধকপ্রবর, এইবার কর্ত্তৃকার বিষয় ভাল করিয়া চিন্তাপূর্ব্বক তারা-সাধনার রহস্য-কথা আরও গভীরভাবে ভাবিয়া দেখ, অধিকতর বিমোহিত হইয়া যাইবে। কর্ত্তৃকাটী 'হূঁকারজ' অর্থাৎ গুণত্রয়ের শেষ তমঃগুণ-প্রতিপাদক পূর্ব্ব-বর্ণিত কৃষ্ণ-নীলবর্ণ কমল হইতে জাত। ব্রহ্মের তমোগুণেই সৃষ্টি-ধ্বংস হইয়া থাকে, সেই কারণ শ্রীসদাশিব, দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনায় বলিয়াছিলেন—"মহাপ্রলয়কালে কেবল তুমিই তমোগুণে বিরাজিতা ছিলে।" সুতরাং যেন সেই তমোগুণ-জাত বিশ্ব-বিধ্বংসকারী কর্ত্তৃকাটী এক্ষণে গুণত্রয়কে নাশ বা ছেদন করিবার জন্যই

অধোমুখে ত্রিগুণ-প্রতিপাদক কমলত্রয়ের উপর রক্ষিত। সাধক, এইভাবে সাধনাসাহায্যে ত্রিগুণের স্থূলভাব নাশ করিলেই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রলয়-পয়োধিজল-সদৃশ এক অনন্ত অম্বুরাশির উপলব্ধি করিতে পারিবে অথবা ঐরূপ চিন্তা করিবে। সেই সলিলের উপরিস্থিত অদ্ভুত পূত শ্বেত শুদ্ধ-সত্ত্বগুণান্বিত ঐ বিরাট কমলের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির চিন্তা করিবে ও তাহারই মধ্যে পুনরায় আপনাকে 'তারিণীময়' চিন্তা করিয়া দেবীর পূর্ব্ববর্ণিতরূপ ধ্যান করিতে যত্নবান হইবে। এইস্থলে আগমোপদেষ্টা গিরিজা-পতি স্বয়ং শঙ্কর যে কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন, অর্থাৎ সাধক 'আপনাকেই তারিণীময় চিন্তা করিয়া' তাহারই মধ্যে আত্ম 'অনাহত' ভূমিতে তারা দেবীর ধ্যান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা 'সাধনপ্রদীপোক্ত' "ভাবতত্ত্বের" মধ্যে "দেবএব যজেদ্দেবং ন দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" ইত্যাদি শিববাক্যের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিবে, স্বয়ং দেবতা না হইয়া কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে নাই। প্রথম অবস্থায় সাধক এইভাবে নিজেকে দেবতাময় করিয়া চিন্তা করিতে পারিবে না। কারণ প্রকৃত ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসাদি ক্রিয়ার অভ্যাস না হইলে, ইহা সহজে কাহারও উপলব্ধ হইবার নহে, তাহা সর্ব্বত্র পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ইহার পর অনাহতের মধ্যে রক্তারুণবর্ণ 'গুপ্তকমলকেই' সাধক, উক্ত চিতাগ্নি সমন্বিত কমলকোরক চিন্তা-পূর্ব্বক তাহারই মধ্যে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ও তাঁহার যথাবিধি মানস ও বহিপূর্জা করিবে।

প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নি-মধ্যে সাধক 'আপনাকেই তারিণীময়' চিন্তা করিবে। 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্যময় বা জ্ঞানময়, তাহার শক্তি

অর্থাৎ সেই জ্ঞানশক্তি যাহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধারে প্রজ্জলিত চিতাগ্নি হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই মধ্যে 'আপনাকে তারিণীময়' করিয়া দণ্ডায়মান করিতে হইবে। তাহাতে সাধকের 'ভৈরবী' বা পার্থিব ভাবরাশি যাহা তখনও স্বর্ণ-ধাতুর অন্তর্গত অন্যান্য হীন ধাতুর ন্যায় খাদরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই অজ্ঞানতারূপ ধাতু বিশেষ, তাহাই এক্ষণে উক্ত খাদের ন্যায় পুনঃ পুনঃ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া নির্ম্মল করিয়া লইতে হইবে। যাহা হউক বাহিরে ও ভিতরে উভয় স্থলেই সেই তারিণীময় আত্মচিন্তা করিতে হয়।

সাধক, 'কালী'-'তারা' অভেদভাবে পূজা করিবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা পুনরায় স্মরণ কর, কিন্তু সেই অভেদের মধ্যে যে, কি বা কতটুকু ভেদ আছে—তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

কালী, তারা ও ত্রিপুরা, এই ত্রিশক্তি যথাক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মের সমীপ, অধিকতর সমীপ ও অধিকতম সমীপবর্ত্তী, অথবা ব্রহ্মের ওতপ্রোত-সম্বন্ধ-জড়িত প্রকটমূর্ত্তি তুরীয়া-শক্তি। কালিকা-ধ্যানে সাধক, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের যে প্রত্যক্ষ ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়াছেন, তারা-ধ্যানে চিত্তস্থির করিয়া প্রথমেই সেই স্থূল বা প্রত্যক্ষ গুণত্রয়ের ছেদন করিতে হইবে। অবশ্য সে বিভিন্ন ত্রিগুণ-জ্ঞানের সম্পূর্ণ নাশ ব্যতীত নির্গুণ-ব্রহ্মের যথার্থ উপলব্ধি সম্ভবপর নহে! এই ক্রম-সাধনার পথেই সাধনার শেষ সীমায় তাহা সাধকের উপলব্ধি হইয়া থাকে। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, সাধনার নববিধ আচারের মধ্যে দক্ষিণ-কালিকা-সাধনা বা পূর্ণাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই 'দক্ষিণাচার' অবলম্বনীয়। এক্ষণে এই ক্রমদীক্ষা-সাধনায় পূর্ব্বানুষ্ঠিত সেই

দক্ষিণাচার পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে 'সিদ্ধান্তাচার' সঙ্গে সঙ্গে 'বামাচার' অবলম্বন করিতে হইবে। 'দক্ষিণ' শব্দের অর্থ অনুকূল এবং 'বাম' শব্দের অর্থ প্রতিকূল, এ সকল কথা "সাধনপ্রদীপে" "আগমে আচারতত্ত্ব" শীর্ষক তৃতীয় উল্লাসে এবং 'পূজাপ্রদীপে'র দ্বিতীয় উল্লাস মধ্যে—'পূজা ও উপাসনা-ভেদ' অংশেও বলা হইয়াছে। দক্ষিণাচারের সাধনায় চরম সাত্ত্বিকতার স্রোতে যে সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, হৃদয়ের যে সকল সাত্ত্বিকভাব পুষ্ট হইয়াছে, উপস্থিত এই সাধনাপথে পূর্ব্বসাধনালব্ধ সেই সুপুষ্ট সাত্ত্বিকতারূপ শ্বেত-শাশ্বত-বিরাট-কমলোপরি প্রত্যালীঢ়পদ-বিশিষ্টা অর্থাৎ যে ব্রহ্ম-শক্তি বাম বা প্রতিকূল পদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া যেন গমনোদ্যতা বা ক্রিয়াশীলা হইয়া আছেন, তাঁহারই অর্চ্চনা করিতে হইবে।

"মহানীল তন্ত্রে" উক্ত হইয়াছে :—

"তারা বিদ্যাসু সর্ব্বাসু ভাবনাদৌ ব্যতিক্রমঃ।"

অর্থাৎ তারা-বিদ্যার সাধনা-ব্যপদেশে ভাবনাদির ব্যতিক্রম করিতে হয়। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে,—"তারা-বিষয়ে বৈপরীত্যা-স্থিতি।" অর্থাৎ তারাসাধনায় বিপরীত আচারই অবলম্বনীয়। সাধক, আরও অগ্রসর হও, আরও গভীরভাবে সাধনসাগরে নিমজ্জিত হও। এই সাধনায় নিজেকে প্রথমে তারিণীময় চিন্তা করিয়া তাহার মধ্যেই পুনরায় তারা বা তারিণীকে ধ্যান করিতে হইবে, অর্থাৎ দক্ষিণ বা অনুকূল-পদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া ইতঃপূর্ব্বে যে কার্য্য করিয়াছিলে, এক্ষণে সে পদ সেই স্থানেই রাখিয়া বাম বা প্রতিকূল-পদ অগ্রসর করিয়া দাও, এইরূপে তিন-পদ যাইলেই সিদ্ধির পথ সুগম হইবে। ইহাকেই বলে ত্রিপাদ-সাধনা। তিন

পা অগ্রসর হইলেই মুক্তি। সাবধান, প্রলয়পয়োধিজলসদৃশ অনন্ত-অম্বুরাশির মধ্যস্থিত শ্বেত শাশ্বত-কমল বা পূর্ব্বসাধনালব্ধ সার সাত্ত্বিকতার গণ্ডী এখনই অতিক্রম বা পরিত্যাগ করিবে না। প্রজ্জলিত-চিতাগ্নিমধ্যে সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইবে, এই ভ্রান্ত-আশঙ্কায় ঐ বিরাট কমলদলের বাহিরে অনন্ত ও অতলজলে এখনই ঝাঁপ দিবে না। খুব সাবধান, বাম বা প্রতিকূল-আচার অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে সাত্ত্বিক-আধার কখনই পরিত্যাগ করিবে না। অনেক সাধকেই এই সাধনমার্গে আসিয়া কেবল শিক্ষা ও সাধনার দোষে কতই বীভৎস ক্রিয়া করিয়া সাধন-ভজন সকলই ব্যভিচারের অতলজলে জলাঞ্জলি দিয়া বসে।

পূর্ব্বে ক্রমদীক্ষার অভিষেক গ্রহণের সময় হইতে সাধকের শোক-বিজয় বা শৌচাশৌচের যে ভাবসমূহ চিত্ত হইতে পরিত্যাগ করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই বাম বা প্রতিকূল-মার্গে পদার্পণ করিবার প্রথম অবস্থা। পূর্ব্বানুষ্ঠিত সাত্ত্বিকাচারের পূর্ণ উপলব্ধিসহ ক্রিয়া-তৎপর হইয়া, তাহারই অন্তরে তামসিকতার এক অদ্ভুত মিলন-ভাব এখন সাধন করিতে হইবে। সাধক এখন 'অনাচারী' না হইলেও 'অবিচারী' হইবে। অর্থাৎ অন্তরে অবিচার বা তামসিকতার গুপ্ত-অনুষ্ঠান করিলেও, লোক-শিক্ষার জন্য বাহিরে সাত্ত্বিকতার নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সদাচারসমূহ যথাসম্ভব পালন করিবে। কারণ যতদিন গুপ্ত-সাধকরূপে সমাজ-ভুক্ত বা সংসারের মধ্যে গৃহীর ন্যায় অবস্থান করিবে, ততদিন পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণের এবং পরে শিষ্য ও অনুগত ভক্তগণের শিক্ষা ও তাহাদের অন্তকরণের সহায়তা করিবার জন্য সহসা সাত্ত্বিক-আচার পরিত্যাগ

করা কোনও সাধকেরই কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ পরম পূজ্যপাদ ঋষি দিগের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও লৌকিক আচার ও নিত্যকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিবে না। সাধক এই সাধনাবস্থায় চিত্তের যতদূর পুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হয়, অন্য সাধারণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, বিনা-অধিকারে সেই সকল বাহ্য আচারেরই অনুকরণ-ব্যপদেশে অনাচারী হইয়া উঠিতে পারে। সুতরাং সাধক, সেই শ্বেত-শাশ্বত-সাত্বিক-গণ্ডিস্বরূপ বিরাট-কমলের মধ্যে অবস্থান করিয়াই অতি গুপ্তভাবে বা কেবল অন্তরেই বামাচার অবলম্বন করিবে।

এই সাধনাবস্থায় দেবী প্রত্যালীঢ়পদা, এইরূপ ধ্যান করিবার বিষয়ে তন্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণকালিকায় দেবী শবহৃদয়ে উপবিষ্টা বা বিপরীত রতাতুরা * অথবা একাধারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্রীরূপে শিব-সংযুক্তভাবে অবস্থিতা হইলেও, সাধকসন্তানকে সাধনার ক্রম পরিদর্শন করাইবার জন্য সাধনানুকূলপথে, অনুকূল বা দক্ষিণ পদ অগ্রবর্ত্তী রাখিয়া তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, অথবা ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি তখন তাঁহার সেই ইচ্ছাশক্তিই প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে দেবী, তারা মূর্ত্তিতে ক্রিয়াশক্তিরূপে বিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্ব নিবৃত্তি করিবার জন্য 'ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাংকটৌ' এইভাবে শিবসংযোগ পরিত্যাগ করিয়া সাধকসন্তান নিবৃত্তিমার্গে পরিচালনের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মানা হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আধারে ও অন্তরে জ্ঞানশক্তি অতি গুপ্তভাবে সতত নিহিত রহিয়াছে। এখন আর নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন নাই, যাহা আছে তাহারই পুষ্টি ও বিনষ্টির জন্য

* বিপরীত-রতাতুরা বিষয়ে 'পূজা-প্রদীপ' শক্তির ধ্যান ৭২-পৃ দেখ।

কঠোর সাধনা করিতে হইবে; আর নূতন কর্ম্মফলে সাধকের আবশ্যক নাই, এখন সুকর্ম্মের রক্ষা দ্বারা কুকর্ম্মের বিনাশ সাধনাই সাধকের কর্ত্তব্য। সেই কারণ দেবী দক্ষিণ-পদ-সাধনার অনুকূল সাত্ত্বিক-ভাব পূর্ব্ব-রক্ষিত স্থানে সংন্যস্ত রাখিয়াই বামপদ অর্থাৎ প্রতিকূল-ভাব বা গুপ্ত তামসিক ভাব অগ্রসর করিয়া সাধক-সন্তানকে সাধনার ক্রম বা সাধনপথে দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের সঙ্কেত প্রদর্শন করিতেছেন। 'প্রত্যালীঢ়' শব্দ সাধারনতঃ (প্রতি+আ+লিহ—ক্ত) ধনুর্দ্ধারীদিগের পাদ সংস্থান বিশেষ বা বাননিক্ষেপ সময়ে উপবেশন বিশেষ বলিয়া অভিধানে দেখা যায়। এক্ষণে সাধককে ঠিক ধনুর্দ্ধারীর মতই সাধনোপবেশনে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে। ব্রহ্ম-সাধনায় পুণ্যবান্ সাধক, এইবার দ্বিতীয়পদ অগ্রসর কর, আর সেইপদ যে, সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যময় ব্রহ্মেরই হৃদয়োপরি রক্ষিত হইয়াছে, ব্রহ্মের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাই প্রত্যক্ষ কর—ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে বীরবর অর্জ্জুনের মত লক্ষ্য ভেদ করিয়া ব্রহ্মচৈতন্য লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান স্পষ্টতর হইতেছে, তখন অনুভব করিতে পারিবে। অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে যাহা জড়িত বা অনুপ্রাণীত সেই বিরাট ব্রহ্ম-হৃদয় যে, সাধনার বাম পদানত, তাহা তখন সুস্পষ্ট ভাবে পরিদর্শন করিয়া—তন্ময় হইয়া যাইবে।

দেবীর কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। ব্যাঘ্র—বি+আ+ঘ্রা-ধাতু ক প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ব্যাঘ্র শব্দে গন্ধ উৎপাদনে ঘ্রা ধাতু বিদ্যমান হেতু গন্ধবতী পৃথ্বীর বলিয়া উক্ত। পৃথ্বীর গুণ গন্ধ। দেবীর কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; ব্যাঘ্র নহে। ইহার তাৎপর্য্য গন্ধবতী পৃথিবী নহে,

পার্থিব-ভাব-গন্ধযুক্ত জীব-ভাব। সাধক, তারিণীময় আত্মচিন্তায় তখনও সেই 'পার্থিব-ভাবগন্ধ' নাশ করিতে পারে নাই বলিয়াই মায়ের ধ্যানাদর্শে—"ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ" চিন্তা করিতে হইবে।

দেবী 'খর্ব্বাং', অর্থাৎ তিনি খর্ব্বাকৃতি; বিক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত সর্ব্বময়ী-ভাবের যেন খর্ব্বাকারে 'সমষ্টীভূতা', আবার তিনি লম্বোদরী অর্থাৎ তিনি যে 'ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী'—তাহারই আভাস ইহাতে প্রদত্ত হইতেছে।

বিশ্ব-সংসার প্রলয়-চিতাগ্নির মধ্যে সতত ভস্মীভূত হইতেছে—জীবের শেষ-দশা, 'ভূতপঞ্চক' বা পার্থিব-ভাবপুষ্ট নশ্বর সাধকদেহের শেষ-লীলা, জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং বা প্রজ্বলিত-চিতাগ্নির মধ্যে তারিণীময়-আত্মচিন্তা, সাধককে মর্ম্মে মর্ম্মে এইবার তাহাই উপলব্ধি করিতে হইবে। আবার আধার-কমলের নিম্নে সেই ভাব-ধ্বংসকারী শাণিত 'কর্ত্তরী', তাহাও যেন সর্ব্বদা স্মরণে থাকে! সাধক, সতত মনে রাখিও—'তারা-সাধনা' নিতান্ত 'শিশু-সাধ্য-বিষয়' নহে!

'শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকার ধ্যানকালে' দেবীর বাম-হস্তদ্বয়ে—সদসৎ অনুকূল সাধনকার্য্যে সদ্যচ্ছিন্ন 'শিরঃ' বা অসুরমুণ্ড (অজ্ঞানতা) এবং জ্ঞানময় 'খড়্গ' ছিল, তখনও সাধকের রক্তমাংসময় স্থূল দেহের অস্তিত্ব বোধ ছিল, রক্তবীজাদি * অসুরদল বা রিপুগণের প্রলোভনের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তারা-সাধনায় দেবীর 'বামহস্তে' আর তাহা পরিলক্ষিত হইতেছে না, তাহার পরিবর্ত্তে 'বাম' বা

* 'পূজাপ্রদীপে'—'শক্তিতত্ত্ব'—'ধ্যানরহস্য' অংশে 'রক্তবীজাদির রহস্য' দেখ; 'মা আমার দক্ষিণাকালী' অংশও দেখ।

প্রতিকূল সাধন-কার্য্যে শ্মশান-সুলভ চিরপরিত্যক্ত নরকপাল দেবীর নিম্ন বামহস্তে ধৃত রহিয়াছে, আবার 'কপাল'—শূন্যময় আকাশ-ব্যাপক; অর্থাৎ সাধক, আকাশাত্মক উক্ত শেষ তত্ত্বের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখিতে যত্ন কর, তাহা হইলে—তাহারই 'উপরের হস্তে' ভীষণ-দৃশ্য 'খড়্গের' পরিবর্ত্তে অতি কমনীয়-কান্তি কোমলাকৃতি সুমনোহর নীলকমল সাধক-হৃদয়ে জীবের বিমল মুক্তিপ্রদ শান্তির আশা প্রদান করিবে। 'দক্ষিণকালিকা-সাধনায়' দেবীর ধ্যানে বামমার্গে বা বামদিকে সদ্যচ্ছিন্ন 'শিরঃ' ও 'খড়্গ' যেরূপ ভীতির চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছিল, প্রত্যালীঢ়পদা তারাদেবীর বিপরীত-বিধ সাধনায় সে ভয়ের দৃশ্য না থাকিলেও, এ আর এক ধরণের 'ভীতি' ও 'শান্তি'-বিজড়িত অদ্ভুতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হয়, কেবল তথাকথিত স্থূল 'বামমার্গ' ধরিয়া উচ্ছৃঙ্খল সাধনায় বিধ্বস্ত হইয়া যাও, তোমার শেষ-পরিণতি শ্মশান-শোভা ঐ শুষ্ক নরকপালে পরিণত হউক, অথবা অতি ধীর অথচ কঠোর সূক্ষ্ম-সাধন-ক্রিয়াবলম্বনে অতি সাবধানে, স্থির সাত্ত্বিক-আচারের মধ্যদিয়াই বামপদ অগ্রসর করিয়া সুবিমল 'কমল-শান্তি' উপভোগ কর। এখানে আর 'বরাভয়' নাই। যতক্ষণ নিতান্ত অপুষ্ট ছিলে, সাধন-পথে নিতান্ত বালকের মত বিচরণ করিতেছিলে, ততক্ষণ তোমার 'অভয়' ও 'বরের' প্রয়োজন ছিল, এখন ক্রমে সাধনায় যেমন সুপুষ্ট হইতেছ, মা অমনি সে ভাব সঙ্কর্ষণ করিয়া লইতেছেন। ক্রিয়া-সাধক, স্নেহাস্পদ আমার,—এখন যে তুমি নিজের পায়ে বল পাইয়াছ—সাধনার পথে 'পা' ফেলিতে শিখিয়াছ—খুব সাবধানে সদা 'গুরু-পাদুকা' স্মরণ করিয়া নিজেই অগ্রসর হও।

'দক্ষিণাচারে' যখন জগজ্জননী কালী দক্ষিণপদ অগ্রসর

করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার দক্ষিণ-হস্তে 'বরাভয়' ছিল, অর্থাৎ দক্ষিণ-পদবিক্ষেপে সাধনায় অগ্রসর হও, 'অভয়' পাইবে; আরও অগ্রসর হও, শান্তিপ্রদ 'বর'ও প্রাপ্ত হইবে, দেবীর দক্ষিণ-করদ্বয়ে এই ভরসার কথাই তখন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সাধকের বর্ত্তমান অবস্থায় সে দক্ষিণ-অঙ্গ বা হস্ত ও পদ পশ্চাতে অর্থাৎ পূর্ব্ব-রক্ষিত স্থানে বা 'সাত্ত্বিক-আশ্রয়ে' রাখিয়া বামপদ বা তমোগুণযুক্ত গুপ্ত 'বিচারহীনতার' প্রতি অগ্রবর্ত্তী করা হইয়াছে, সুতরাং সে দিকে আর ফিরিবার আবশ্যক নাই! যদি সাধক কোনরূপে সম্মুখ-বিস্তৃত সাধনপথে অগ্রসর না হইয়া পিছনে ফিরিবার উপক্রম করে বা সেই ইচ্ছায় পশ্চাতে বা এস্থলে দক্ষিণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে, সাধক, মাতৃহস্তে আর সেই বরাভয়-যুক্ত দেখিতে পাইবে না, তৎপরিবর্ত্তে অতি ভীষণ দুইখানি শাণিত শস্ত্র,—'খড়্গ' ও 'কর্ত্তরী' ধৃত রহিয়াছে, ('খড়্গ'—কালের এবং 'কর্ত্তরী'—জ্ঞানের চিহ্ন,) এক্ষণে তাহাই দেখিতে পাইবে। সাধক, শিবের আদেশ, মনে রাখিও, সাধনমার্গে এখন আর অন্ধ হইয়া চলিও না, ঐ সাবধান-আজ্ঞাসূচক 'কাল-ভয়' ও 'জ্ঞানযুক্ত' দেবীর দক্ষিণ-হস্ত-দ্বয়ের প্রতিও সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও, আর অতি সাবধানে বামপদ প্রসারণ-পূর্ব্বক, বর্ত্তমান সাধনার বিনির্দ্দিষ্ট 'গোপনে বিপরীত ক্রিয়া-বিধান' সম্পন্ন করিয়া যাইও। তাহা হইলেই, বর বা মুক্তিরপথ তোমার অদূরে সম্পূর্ণ মুক্ত বা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

সর্ব্বজ্ঞানময়ী-দেবীর কণ্ঠে, 'কালিকা-ধ্যান-রহস্যোক্ত' ধী-শক্তির আধার 'পঞ্চাশৎ-মাতৃকাবর্ণাত্মক' মুণ্ডমালা এখনও বিরাজিত রহিয়াছে, কারণ পরবর্ত্তী 'জ্ঞান-শক্তি'-সাধনার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত

এই 'জ্ঞান-মাল্যের' বিলয়-সাধন অসম্ভব। সাধক, এই ক্রিয়াশক্তির ফলে—অদূর ভবিষ্যতে সূক্ষ্ম 'জ্ঞানশক্তি' প্রাপ্ত হইলে, কেবল ইহা বলিয়া নহে, অনেক স্থূল-বিষয়েই তখন আর তোমার প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু যতক্ষণ সেই ইপ্সিত সূক্ষ্ম-শক্তি সাধকের করায়ত্ত না হইতেছে, ততক্ষণ বিনা-বিতর্কে দেবীর কণ্ঠস্থিত ঐ 'জ্ঞানমাল্যের'ধ্যান অবশ্যকর্ত্তব্য,—অর্থাৎ সাধনার সহিত ধী-শক্তির আধার উক্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ-নিবদ্ধ' সাধন-শাস্ত্রসমূহ তন্ত্রাদির গুরুমুখাগত গভীর রহস্য-বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করিতে হইবে।

দেবীর মস্তকে শ্মশানের শেষচিহ্ন পঞ্চমুদ্রাস্বরূপ 'অস্থিমালায় গ্রথিত ত্রিকোণাকারে রক্ষিত শ্বেত নর-কপাল-পঞ্চকের' দ্বারা শোভিত। 'মুণ্ড' যে,—'জ্ঞানাধার' তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ স্থলে 'পঞ্চমুণ্ড' অর্থে—'শব্দ', 'স্পর্শ', 'রূপ', 'রস' ও 'গন্ধ' এই পঞ্চগুণময় 'পঞ্চ-বিষয়'-জ্ঞানের আধাররূপেই 'পঞ্চমুণ্ড'; কিন্তু এই মুণ্ড-পাঁচটী রক্তমাংসাদিযুক্ত নহে, কেবল তাহার 'কপালাস্থি'মাত্র। ইহার তাৎপর্য্য—তোমার অনিত্য বিষয়-জ্ঞান-পঞ্চক, যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনায় কতকটা সংযত হইয়াছে, তাহাই এখন নষ্ট করিয়া কেবল কপালরূপে পরিণত করিয়া, তাহারই উপরে নিজেকে উপবেশন করাইতে হইবে। ইহাই সর্ব্বোচ্চ অধিকারের 'পঞ্চমুণ্ডাসন-বিধি'।* 'অক্ষোভ্যঋষি' বা মহাদেব কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত 'নাগ' বা সর্পের ফণামণ্ডলে দেবীর জটাজূট সমলঙ্কৃত। কোন কোনও সাধক দেবীর 'ধ্যানান্তর' বলিয়া এইভাবেই উপদেশ দিয়া থাকেন। যথা ॥:—

* 'পূজাপ্রদীপে'—'পরিশিষ্ট' অংশের মধ্যে 'শবাসনাদি' দেখ।

"শীর্ষেহক্ষোভ্যমহাদেবকৃতনাগফণাভিশোভিতাং পার্শ্বদ্বয়ে লম্বমান নীলোৎপলমাল্যাং পঞ্চমুদ্রাস্বরূপ শুভ্রত্রিকোণাকার কপালপঞ্চকমাং ইত্যাদি" —

অর্থাৎ তাঁহার মস্তকে 'অক্ষোভ্য'=ক্ষোভশূন্য, 'ঋষি'=তৎ-মন্ত্র-দ্রষ্টাস্বরূপ—অবিচলনীয় মহাদেব ফণাসহিত 'অনন্ত'-নাগ তাঁহার শীর্ষরূপে শোভিত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অক্ষোভ্যঋষি 'স্ত্রী-নাগ' বা নাগিনীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই 'নাগ' অনন্ত-আকাশাত্মকব্রহ্ম বা পরমশিবস্বরূপ, কিন্তু সেই 'নাগ' তখনও 'স্ত্রী' অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা ব্রহ্মশক্তি বা প্রকৃতি-স্বরূপিণী—তখন 'কুণ্ডলিনী' শক্তি শিবসংযোগভূতা হইয়া 'কুল-কুণ্ডলিনী'রূপে প্রত্যক্ষভাবে যেন সেই সূক্ষ্ম সর্পাকারেই বিরাজিতা; আবার তিনিই সর্ব্বক্ষোভবিরহিত হইয়া তৎ বা তাঁহার সেই মন্ত্রের দ্রষ্টারূপে অর্থাৎ 'পশ্যন্তী-নাদরূপে' * ঋষিস্বরূপ। সাধকই সেই সমুন্নত অবস্থায় এই অক্ষোভ্য-ঋষিস্বরূপ হইয়া কুলকুণ্ডলিনীতে লয় প্রাপ্ত হইবে। ('পূজাপ্রদীপের' ৩৩২ পৃষ্ঠায় 'জপসমর্পণ'-বিধির মধ্যে কুলকুণ্ডলিনীরূপা বিষয়টী ভাল করিয়া দেখিলে অনেকটা বুঝিতে পারিবে।) ইহার রহস্য অতীব গভীর—সাধক, বিশেষ মনোযোগ দিয়া ইহা পুনঃপুনঃ বুঝিতে যত্ন করিবে। ইহা 'পুথীপড়া বিদ্যার' কর্ম্ম নয়! তাঁহারই দুই পার্শ্বে নীল-কমলমালা লম্বিত, তাহা 'মুক্তি' বা 'লয়াত্মক' কর্ম্মপ্রবাহস্বরূপ। 'পঞ্চমুদ্রা'-স্বরূপ শ্বেত-শাশ্বত ত্রিকোণ-যন্ত্রাকারে পাঁচটী নরকপাল-রূপ পঞ্চতত্ত্বমূলক 'পঞ্চ-তন্মাত্রা' (তৎ+মাত্রা) অর্থাৎ তাঁহারই

* 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'—(চৈতন্যরূপিণী-কুণ্ডলিনী ও পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী-নাদবিজ্ঞান) দেখ।

পঞ্চবিধ বিষয়-জ্ঞান-শক্তি দ্বারা বিনির্ম্মিত রহিয়াছে। সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ উর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ-যন্ত্র-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে 'পূজা-প্রদীপে'—'উপাস্যভেদ' অংশের মধ্যে "উর্দ্ধমুখী ও অধঃমুখী ত্রিভুজের সমাহারভূত ষট্‌কোণ-যন্ত্র" দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে।

শিব-শক্তিসমন্বিত কপাল-যন্ত্রের মধ্য হইতেই 'নীল ও রক্তাদি ত্রিবিধ মিশ্রজ বর্ণ বা ত্রিগুণসঞ্জাত—উগ্র পিঙ্গলবর্ণের' অসংখ্য মুক্তকেশরাশি একত্রীভূত হইয়া একটীমাত্র বিরাট-জটে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ-দৃষ্টিতে শিবশক্তিসমন্বিত মূল-ব্রহ্মশক্তির অসংখ্য শক্তিকণা-সংখ্যাতীত 'রূপ' বা 'মূর্ত্তি'-বিশিষ্ট অনুভূত হইলেও, একজটা তারা-দেবীর এই উগ্রসাধনায় তাহাই যেন সমষ্টীভূত হইয়া একের বা সেই 'অদ্বৈতের' দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। সাধক, দেবীর 'ধ্যানরহস্যে' ইহাও একাগ্র-চিত্তে চিন্তা করিবে।

মহামায়া আদ্যা পরমাপ্রকৃতির দ্বিতীয় ভাব-সাধনায়, সাধক এই ভাবে মনোপ্রাণ এক করিয়া ধ্যান-কার্য্য করিলে, ক্রমদীক্ষা-ধিকার যেমন অতি সহজে সম্পন্ন হইবে, তেমনই ইহার অধিকতর গূঢ়-রহস্য সাধক-হৃদয়ে আরও স্পষ্টীভূত হইয়া আসিবে,—সাধকের চিত্ত পরবর্ত্তী উচ্চতর সাধনার জন্য পরিপুষ্ট হইয়া আসিবে, ইহাই এক্ষণে সাধকের ক্রিয়ার 'অনুশীলনা'।

ক্রমদীক্ষান্তে সাধক, ক্রিয়াসাধনার জন্য 'তারিণী-মন্ত্র' যথারীতি জপ করিবে। পূর্ব্বে দক্ষিণকালিকা-মন্ত্রসাধনায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা রুদ্রাক্ষমালায় দেবীর মন্ত্র 'জপ' করিবার কথা সকলেই অবগত

আছেন, কিন্তু তারামন্ত্রের সাধনায় ভিন্নরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে পারা যায়। * "তারানিগমে" লিখিত আছে :—

"নৃকপালস্য খণ্ডেন রচিতা জপমালিকা।
মহাশঙ্খময়ীমালা অকস্মাৎ সিদ্ধিদাস্মৃতা।
দন্তৈর্ব্বা প্রকর্ত্তব্যা তথা চাঙ্গুলিপর্ব্বভিঃ।"

'মনুষ্যকপালখণ্ড' বা মাথার খুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাতেই মালা প্রস্তুত করিতে হয়, ইহাকেই "মহাশঙ্খমালা" বলে। ইহাতে সাধকের আশু-মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। 'দন্ত' দ্বারা বা 'অঙ্গুলিপর্ব্বের' অস্থির দ্বারাও জপমালা নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়। তাহাও মহাশঙ্খের-অনুরূপ, তারা-সাধনায় তাহাও প্রশস্ত।

"অভাবে স্ফাটিকীমালা মহাশঙ্খস্য শঙ্কর।
শোধয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।"

উক্ত মহাশঙ্খের অভাবে শুদ্ধ "স্ফটিক-মালা"-শোধন করিয়া জপ করিলেও সাধকের মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি সর্ব্ব-কামনাই সিদ্ধ হয়।

'ষট্‌কর্ম্মপ্রধান'—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সাধনাভেদেই মালার ভিন্ন ভিন্ন বিধি তন্ত্রমধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা :—

"মহাশঙ্খজপাদ্বৎস অকস্মাৎ সিদ্ধিভাগ ভবেৎ।
মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্ফাটিকে স্যাদ্রুদ্রাক্ষে সর্ব্বসিদ্ধিভাক্।
কুশগ্রন্থিঃ শান্তিকে স্যাৎ খরদন্তাশ্চ মারণে।
উচ্চাটনে চ খদন্তা বশ্যে প্রবালমালিকা।
বিদ্যায়াঞ্চ ধনেচাপি স্ত্রিয়ামাকর্ষণে তথা।
শত্রূণাং স্তম্ভনে বাপি মালা রৌপ্যময়ী তথা।"

* 'রুদ্রাক্ষমালায়' সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং যে কোন মন্ত্র-সাধনায় ভিন্নরূপ মালা না হইলেও, ক্ষতি হইবে না। ইহাও শিবাদেশ।

অর্থাৎ 'মহাশঙ্খমালা'—আশুসিদ্ধিপ্রদা, 'স্ফটিকে'—মন্ত্রসিদ্ধি, 'রুদ্রাক্ষ'—সর্ব্বসিদ্ধিভাক্, শান্তিকর্ম্মে—'কুশগ্রন্থি', মারণে' গর্দ্দভ-দন্ত', 'উচ্চাটনে'—কুক্কুরদন্ত, বশ্যে বা বশীকরণের জন্য—'প্রবালমালা', বিদ্যা, ধন ও স্ত্রীর আকর্ষণে এবং শত্রু-স্তম্ভনে—'রৌপ্য-রচিত' মালাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

মালা-শোধন বা মালা-সংস্কৃত না হইলে, মন্ত্রাদির সিদ্ধি ত দূরের কথা, সাধকের নানা সাধন-বিঘ্ন উপস্থিত হয়। মালার সংখ্যা ও শোধনাদি বিষয়, যে যে শ্রেণীর সাধক, সে সেই শ্রেণীর গুরুর নিকট হইতেই জানিয়া লইবে। † তবে তারা-সাধনায়

* শুদ্ধ-স্ফটিকের পরীক্ষা—অন্ধকার গৃহে স্ফটিক মালার দানাগুলি পরস্পর ঘর্ষণ করিলে, অগ্নিকণার ন্যায় চিক্ চিক্ করে।

† মালা-শোধন বা মালা-সংস্কার-বিষয়ে সাধারণ বিধি এই যে,—মালা সাধারণতঃ কার্পাস বা রেশমের সূতায় মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রত্যেক মালা সূতায় গাঁথিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে একটী একটী গ্রন্থি বা গাঁট দিবে। কোন কোন বিধান মতে প্রত্যেকবার আড়াইপাক দিয়া অর্থাৎ 'নাগপাশ-গ্রন্থি' দিবার ব্যবস্থা আছে। পরে "ওঁ" মন্ত্রে বা ইষ্ট "বীজ"-মন্ত্রে উভয় দিকের সূতা মেরুর মালাটীর মধ্যে পূরিয়া মেরু-বন্ধন করিবে। মালা গ্রন্থি দেওয়া না হইলে, কেবল গাঁথিয়া ও শোধন করিয়া লইলেও চলিবে।

মালা-শোধনের জন্য—নয়টী অশ্বত্থপত্র, ত্রিকোণ-বৃত্ত, চতুষ্কোণ ও মণ্ডল-অঙ্কিত কোণ আধার-পাত্রের উপর 'আধারশক্তি কমলাসনের' পূজা করিয়া তাহার উপর পদ্মাকারে স্থাপন করিবে। অর্থাৎ উক্ত পত্রগুলির বৃন্ত সমস্তই একত্র যেন ভিতরের দিকে এক কেন্দ্রে থাকিবে এবং পাতার মুখগুলি বাহিরের দিকে গোলাকারে পদ্মের মত থাকিবে। তাহার উপর মাতৃকামন্ত্র ও মূলমন্ত্র জপ করিয়া, মালা রাখিবে, পঞ্চগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) প্রস্তুত করিয়া "ওঁ সদ্যোজাতং"......ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইবে। ('জ্ঞানপ্রদীপের' ১ম ভাগে

'মহাশঙ্খাদি জপেরমালায়'—তুলসী, গো ময় ও গঙ্গাজল স্পর্শ করাইবে না, এবং তাহা অতি যত্নসহকারে গোপনে রাখিবে। জপের জন্য স্ফটিক মালা বা মহাশঙ্খময়ী মালায় নির্দ্দিষ্ট দানার সংখ্যা ১০৭টী, উহার 'মেরু' লইয়া ১০৮ হইবে। কোন কোনও সম্প্রদায়ের সাধক ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ দানার যোগে সর্পাকারে গ্রথিত স্ফাটিকী জপমালায় ৫৫টী দানাও নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু সাধারণ রুদ্রাক্ষ বা অন্য সকল মালারই ১০৮টী, অথবা তাহার মেরু লইয়া ১০৯টী করিয়া দানা গৃহীত হইয়া থাকে। ক্রম-সাধকমাত্রেই এই সকল কথা স্মরণ রাখিবে। স্ফটিকাদি মালায় তারা-মন্ত্রের জপকালে-মালার মেরুসহ জপ করিয়া ১০৮ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হয়। কিন্তু 'মেরু' উল্লঙ্ঘন করিতে নাই, দ্বিতীয়বার জপের সময় মালা পুনরায় ফিরাইয়া লইতে হয়।

'১৬শ। সমাধি' অংশের মধ্যে 'ওঁ সদ্যোজাত'-মন্ত্র ও নিম্নলিখিত অন্যান্য মন্ত্রগুলিও লিখিত আছে, দেখিয়া লও।)

পরে চন্দন, অগুরু ও কর্পূর একত্র ঘষিয়া তাহা দ্বারা মালা সংলিপ্ত করিতে করিতে বলিবে—"ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায়"......ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। (এই মন্ত্রও 'জ্ঞানপ্রদীপের' উক্ত মন্ত্রের নিম্নে '৪র্থ বামদেব' মন্ত্র বলিয়া উক্ত আছে।)

অনন্তর "ওঁ অঘোরেভ্যোঽথঘোরেভ্যো"......ইত্যাদি ('জ্ঞানপ্রদীপের' উক্ত স্থান হইতে দেখিয়া) এই '২য় মন্ত্র' পাঠ করিতে করিতে ধূপের পবিত্র ধূমে মালার গাত্র ধূপিত করিবে।

এইবার চন্দনাদি দ্বারা মালা লেপন করিতে করিতে "ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায়"......ইত্যাদি '১ম মন্ত্র' ('জ্ঞানপ্রদীপ' হইতে দেখিয়া) পাঠ করিবে।

অতঃপর সমর্থ হইলে মালা একশত বার (মণি সহিত), অভাবে বা অসমর্থ পক্ষে অন্ততঃ একবার, "ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ" ইত্যাদি '৫ম মন্ত্র' (উক্ত স্থান হইতে দেখিয়া) জপ করিবে। (অন্যান্য মালায় 'মণি সহিত' জপ করিবে না)

'অপমৃত' ও 'অদীক্ষিত' ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মানবের মাথার অস্থিখণ্ড রক্ত-ধমনি অথবা 'রক্তবর্ণ সূত্র'-সহযোগে গ্রথিত হইলেও মহাশঙ্খমালা বলিয়া উক্ত হয়। অবিবাহিতা দ্বিজ-কন্যার দ্বারা সূতা কাটাইয়া, তাহা যজ্ঞসূত্রের ন্যায় নবগুণযুক্ত করিয়া অথবা যজ্ঞ-সূত্রেরদ্বারাই রুদ্রাক্ষাদি প্রতি মালার পর আড়াই পাক বেষ্টন দিয়া এক একটা গ্রন্থি প্রদান করিতে হইবে। ইহাকে 'ব্রহ্মগ্রন্থি' বলে। অথবা দুইপাক দিয়া গ্রন্থি বা সাধারণ এক একটী গ্রন্থি দিয়াও মালা গাঁথা যাইতে পারে। এইরূপ মালা পুণ্যময়ী ও সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী। অনন্তর যথাবিধি 'মালা শোধন' করিয়া লইবে।

অনেকে ক্রমদীক্ষাধিকারী না হইয়াই সখ করিয়া গলদেশে 'স্ফটিকমালা' ধারণ করিয়া থাকেন ও তাহাতেই ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, কিন্তু সেরূপ কার্য্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ক্রমদীক্ষাধিকার প্রাপ্ত হইলেই, সাধক, প্রয়োজন অনুসারে মহাশঙ্খ অথবা স্ফটিকমালা গলে ধারণ করিবে। অন্যথা সে মালা শান্তি বা সিদ্ধিপ্রদা হইবে না। তবে ঔষধরূপে উহা গলে ধারণ করা যাইতে পারে, কারণ

এই ভাবে মালার সংস্কারপূর্ব্বক মালায় ইষ্টদেবতার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' ও মূল-মন্ত্রে 'পূজা' করিবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রে পরে পুনরায় রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পাদি দ্বারা 'পূজা' করিবে।

"ওঁ হ্রীঁ মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্ব-স্বরূপিণী। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়িন্যস্ত স্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব॥"

ইহার পর ইষ্টগুরুর 'প্রণাম' করিয়া মালা গ্রহণান্তর মূলবীজ 'জপ' করিয়া লইবে।

মালার সূতা পচিয়া বা ছিঁড়িয়া যাইলে—পূর্ব্বের কথিত মত গাঁথিয়া বীজ-মন্ত্র জপ করিয়া লইতে হয়।

চিত্ত-চাঞ্চল্য নাশ করিতে স্ফটিকের তুল্য অন্য বস্তু আর নাই। ইহা বহুপরীক্ষিত ও অবধারিত সত্য। কিন্তু তাহাও কোন সাধক, ব্রাহ্মণ বা গুরুর আজ্ঞা লইয়া শ্রদ্ধাশুদ্ধ-অন্তরে ধারণ করা কর্ত্তব্য। তাহার জন্য পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাপূর্ণ দানার মালার প্রয়োজন নাই। অল্পসংখ্যক দানাও মালাকারে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তারা-সাধনায় সাধককে 'শোক-বিজয়ের' অভ্যাস করিতে হয়। এই অবস্থায় শোক ও সাধারণ শৌচা-শৌচভাব যেমন সহজে নিবৃত্তি হয়, তেমনি ভয়, ঘৃণা ও বিভীষিকাদি অষ্টপাশান্তর্গত কতকগুলি কঠিন পাশ বা ভাবও তারা-সাধনার কার্য্য-ব্যপদেশে বিদূরিত হইয়া থাকে। স্ফটিক বা মহাশঙ্খময়ী মালার ব্যবহার হইতে শব ও শ্মশান-সাধনা প্রভৃতি 'বামাচারের' বিবিধ কার্য্য, যাহা গুরুর আদেশ-ক্রমে এই সময় সাধক সম্পন্ন করিয়া থাকে, সে সমস্ত বিষয় তাহাতেই সিদ্ধ হয়; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ-গুরুর অভাবে অনেকে আবার এই অবস্থাতেই চিরদিন আবদ্ধ হইয়াও থাকে। ('পূজাপ্রদীপে'—'পরিশিষ্ট'-অংশে 'শব-সাধনাদি' দেখ) এ সময় সাধকের কতকগুলি প্রত্যক্ষ বিভূতি লাভ হইয়া থাকে। মোহান্ধ সাধক, 'মোহ' বা 'ভবঘোর' হইতে 'মুক্ত' হইবার আশায় এই অবস্থায় 'অঘোরী' সাধনাভুক্ত হইয়াও, সেই সাধনসিদ্ধ বিভূতির 'মোহাভিমান-ঘোরে' পুনরায় আবদ্ধ হইয়া থাকে! অর্থাৎ সেই বিভূতিতে তখন হইতে মুগ্ধ হইয়া থাকে। বীরভূমের 'তারা-পিঠে' এরূপ শ্রেণীর সাধক অনেক সময়েই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাধারণ সংসারী-জীব কেবল নশ্বর লৌকিক-স্বার্থবশে,

নিজেদের দুঃখ-যন্ত্রণা অপনোদনের আশায়, অতি কাতর-ভাবে সেই সমুদায় সামান্য-বিভূতিপুষ্ট সাধককে উচ্চকোটীর ব্রহ্মজ্ঞানী বোধে সর্ব্বদা সেবা ও ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাতেই তাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মকল্যাণকর স্ব স্ব উন্নততর সাধনা-কার্য্যে বিরত হয় ও সেই তুচ্ছ বিভূতি-পুষ্টির জন্যই বিব্রত হইয়া থাকে। ফলে ইহজন্মে সামান্য প্রশংসা ও অর্থ-প্রাপ্তি এবং সেই স্বার্থপর ভক্তগণের যথেষ্ট সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে নূতন কর্ম্মবন্ধনে পড়িয়া পরজন্মে শক্তিহীন ও অবনত হইবারই পথ প্রশস্ত করে। সাধনমার্গে প্রত্যেক কর্ম্মেরই যে কিরূপ সূক্ষ্ম-গতি বিদ্যমান আছে, তাহা প্রায় কেহই বুঝিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানার্থী বা মুক্তিকামী সাধকের সর্ব্বদা স্বীয় অবস্থার বিষয় স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। কোন একটী শক্তি লাভ করিয়াই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার যথার্থ লক্ষ্য যে, মোক্ষপ্রদ সার ব্রহ্মবিন্দু-পরিদর্শন ও তজ্জনিত পরমানন্দ লাভ, তাহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। সাধক, তারা-সাধনায় বিভূতি-মুগ্ধ হইয়া পাছে আবদ্ধ হইয়া যাও, সেই আশঙ্কাতেই দেবাদিদেব শঙ্কর পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন যে, এই 'তারাসাধনা' যত সত্বর সম্ভব সম্পন্ন করিয়া লইবে। কোনরূপ আলস্য বা অবহেলা করিয়া, অথবা সামান্য কোন শক্তিপ্রাপ্তে তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া, কালাতিপাত করিবে না। তোমার লক্ষ্যস্থল 'অভ্রান্ত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি,' তাহাতেই তীক্ষ্নদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সাধনাপথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাও। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও শঙ্করাচার্য্যদেব প্রভৃতি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই 'তারা-সাধনা' করিয়াছিলেন।

যাহা হউক অষ্টাভিষেকান্তর্গত যোগদীক্ষার অভিষেককালে, মন্ত্রযোগসহ হঠ ও লয়-যোগের যে সকল বিষয় সাধককে অভ্যাস করিতে হয়, পূর্ণাভিষেকের সময় হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়া থাকে এবং ক্রমদীক্ষার সাধনাকালে সেই সকল ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কিছু প্রত্যক্ষভাবে অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে 'যোগ-ক্রিয়াসাধনা' বলিয়াও তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রথমে 'ইচ্ছাশক্তির' বিকাশ, পরে 'ক্রিয়াশক্তির' পুষ্টি, অনন্তর 'জ্ঞানশক্তিতে' স্থূল-মন্ত্র-ক্রিয়ার একপ্রকার নিবৃত্তিই এই সাধনার ক্রম। এই 'ক্রমদীক্ষা' বা ক্রিয়াসাধনা তাহারই মধ্যস্থলস্থিত অপূর্ব্ব অবস্থার প্রকাশক। এই দীক্ষায় যে সকল মন্ত্রাদি যোগ-ক্রিয়া, পূজ্যপাদ গুরুদেবকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা সকলের পক্ষেই যে একরূপ নহে, সে কথা অনেক সিদ্ধ সাধকও সহসা গুরুর আসনে বসিয়া সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন না। তিনি স্বয়ং যে ক্রিয়াটীতে সিদ্ধ হইয়াছেন, বা যে প্রণালীর সাধনায় সম্যক্ ফলানুভব করিয়াছেন, সেই সাধনায় অন্য সকলেই যে সিদ্ধ হইতে পারিবেন, এমন ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণপ্রধান, অথবা বায়ু, কফ কিম্বা পিত্ত-প্রকৃতি-প্রধান জীব, যেমন বিভিন্ন রসাস্বাদী, অর্থাৎ কেহ লবণ-রস, কেহ মিষ্ট-রস, কেহ বা অম্ল কিম্বা তিক্ত বা কটু রসযুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ লইতে ভালবাসে; * সত্ত্বাদি গুণ-নির্ব্বিশেষেও সাধক, সেইরূপ বিভিন্ন ক্রিয়ামোদী বা তাহাদের আধিক্য-গুণানুকূল ক্রিয়া-সাধনা করিয়া আনন্দ উপভোগ করে।

আমার জ্বর বা অন্য কোনরূপ ব্যাধি হইয়াছে, বৈদ্য বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পারদর্শী যে কোন ব্যক্তি ঔষধ দিলেন, আমি

* 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'—৪। পঞ্চভবাশ্রগত মানবের প্রকৃতি অংশ' দেখ।

সেই ঔষধ সেবন করিয়া অবিলম্বে সুস্থ হইলাম। ঘটনাক্রমে সেই ঔষধটী হয় ত আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি প্রস্তুত করিয়া দিলেন, সুতরাং তাহার প্রস্তুতিপ্রণালীও আমার অবিদিত রহিল না; আমি পরে অন্যান্য ব্যক্তির সেইরূপ কোনও ব্যাধি হইয়াছে, জানিতে পারিলেই, অবিলম্বে সেই ঔষধটী প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি। আমি কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যায় যথার্থ পারদর্শী নহি, কেবলমাত্র সেই ঔষধটীই আমার পরিজ্ঞাত বা সেই ধরণের আরও দুই একটী 'টোট্‌কা ঔষধ' আমার হয় ত জানা আছে, আমার রোগ-মুক্তিকল্পে সে ঔষধটী বস্তুতই তখন অব্যর্থ হইয়াছিল। সকল রোগ নিরূপণ করিবার বিদ্যা আমার আদৌ নাই, ফলে দৈবক্রমে সে ঔষধ দ্বারা কাহারও হয় ত উপকার হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত রোগ কি, তাহা নিরূপিত না হইবার কারণ, তাহাতে হয় ত কুফল প্রদানই অধিকতর সম্ভবপর; এ কথা আমি বুঝিয়াও—বুঝি না। বিশেষ কোন স্বার্থের আশায় অথবা বিনা আয়াসে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লালসায়, এবং মূলে আমার বা অন্য দুই এক জনের বিশেষ উপকার হেতু ঔষধের উপর কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের কারণ, নিজেই ঔষধের অজস্র প্রশংসা করি এবং সেই উপকৃত দুই একজনকে সম্মুখে রাখিয়া আমার উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করি, এবং অন্যকে তাহা জোর করিয়া ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ইহা যেন আমাদের বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত "পেটেণ্ট ঔষধেরই" অনুরূপ বলিতে হইবে। অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকগণ বা সুবিজ্ঞ গৃহস্থগণও এরূপ 'পেটেণ্ট ঔষধের' উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান নহেন, কারণ তাঁহারা জানেন, চিকিৎসাবিদ্যা সম্পূর্ণ উচ্চবিজ্ঞানসম্মত বা পবিত্র আয়ুর্ব্বেদানু-

মোদিত; সুতরাং তাহা সামান্য বিদ্যার কর্ম নহে! একই ব্যাধিতে অবস্থা ও পাত্রনির্বিশেষে শতবিধ বিভিন্ন ঔষধের ব্যবহার আবশ্যক হইতে পারে, যিনি সেই বিভিন্ন ঔষধের গুণাগুণ ও যথাযথ ব্যবহার-বিধিতে অভিজ্ঞ, তিনিই তাহা রোগীবিশেষে ঠিক ঠিক প্রয়োগ করিতে সমর্থ; নতুবা ঔষধালয় বা 'ডিস্পেনসারির' চারি-দিকে আলমারিগুলি নানা ঔষধপূর্ণ থাকিলেও, তোমার আমার মত চিকিৎসা-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা যে কোনও রোগীর প্রতি ব্যবস্থা-প্রয়োগে সামর্থ্য কোথায়? এক মকরধ্বজ বহু ব্যাধিতেই কবিরাজগণ সর্ব্বদা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু অবস্থাভেদে তাহারও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনুপানের নির্ণয় করিয়া দিতে হয়।

যাহা হউক ক্রিয়া সাধনার বিধি-ব্যবস্থাও কতকটা সেইরূপ বলিয়াই বিবেচনা করা যাইতে পারে। 'শ্রীগুরুর মাহাত্ম্য'-বর্ণনায় শ্রীসদাশিবও বলিয়াছেন:—

"যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং নমামি।"

সাধনানির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রোক্ত অসংখ্য ক্রিয়াবলীর মধ্যে হয় ত কোন মহাপুরুষ কোনও একটী ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ ফল তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া যে সকলের পক্ষেই সমান ফল প্রদান করিবে, এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। তিনি আজন্ম কঠোর সাধন-ভজন ব্যপদেশে যে সমুদায় ক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজেরই ভবব্যাধি নিরাময় করিবার পক্ষে হয় ত অনুকূল, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যের বিষয় তিনি হয় ত তেমন ভাবিবার অবসর পান নাই বা এরূপ প্রশ্ন তাঁহার মনোমধ্যে

কখন উদিতও হয় নাই। আমার বিদ্যাবুদ্ধি বা ভূতপঞ্চক ও গুণত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টার আধিক্যজাত উপাদান-সমষ্টিতে আমার যতটুকু মেধা অথবা যে পরিমাণ সাধন-ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য আছে, অন্যের তাহা অপেক্ষা হয় ত অনেক অধিক অথবা অনেক অল্প সামর্থ্য থাকিতে পারে, সুতরাং একই ক্রিয়া-বিধান সকলের পক্ষে কেমন করিয়া উপযোগী? সেই কারণ ভগবান ক্রিয়ার বিবিধ-প্রণালী যোগ-গ্রন্থগুলির মধ্যে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছেন। মন্ত্র, হট, লয় ও রাজ এই চতুর্ব্বিধ যথাক্রম যোগপ্রক্রিয়া সমগ্র যোগশাস্ত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের এক একটীর মধ্যে আবার কত বিভিন্ন আসন, কত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণায়াম, কতবিধ মুদ্রাদির বিষয় বর্ণিত আছে, কিন্তু এই ক্রিয়াগুলির সমস্তই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধন করিতে হইবে, 'শাস্ত্র' সে কথা বলেন নাই। বরং তাহাতে এমন কথা আছে যে, উপযুক্ত গুরু—শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়া, অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্ববিচারসহ তাহার প্রবৃত্তি, চিত্ত, মেধা ও শারীরিক সামর্থ্য আদি সমস্ত বিষয়েই প্রকৃত সুচিকিৎসকের ন্যায় বিচার ও বিবেচনা করিয়া, তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী ক্রিয়োপদেশসমূহ প্রদান করিবেন। তাহা হইলে, শিষ্য পরিশ্রম-পূর্ব্বক অদম্য সাধনা করিয়া যথাসময়ে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। অন্যথা 'ভস্মে ঘৃতাহুতির' ন্যায় সমস্তই তাহার নিষ্ফল-প্রযত্ন হইবে।

আত্ম জীবন বিনাশ করিতে হইলে, একটী সামান্য সূচীকা-দ্বারাও সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে নিধন করিবার আবশ্যক হইলে, যেরূপ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র বা শস্ত্র-সংগ্রহের প্রয়োজন হয়,—আত্মজ্ঞানানুসারে যে সকল বিষয় যে ভাবে

আপনিই বুঝিতে পারা যায়, সেই বিষয়গুলিই ভিন্ন ব্যক্তিকে ঠিক আমার বুঝার মত বুঝাইতে হইলে যে, সেই বিষয়ের সহিত আরও নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতালব্ধ বিপুল জ্ঞান-সংগ্রহের আবশ্যক হয়, তাহা যে কোনও বিষয়ের শিক্ষকতা-কার্য্যে সুনিপুণ ব্যক্তিমাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই সকল কারণেই ক্রিয়া-সাধনাংশের প্রথম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান গুরুমণ্ডলীর প্রত্যেকেরই স্ব স্ব শিষ্যগণের প্রতি প্রখরদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ক্রিয়োপদেষ্টা মহাত্মা-গুরু সেই জন্যই শিষ্যের সত্ত্ব-রজাদি গুণাধিক্য বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন; ('পুরশ্চরণপ্রদীপে'র— 'পরিশিষ্ট'-মধ্যে— ৪। 'পঞ্চতত্ত্বানুগত মানবের প্রকৃতি' অংশে 'সত্ত্বাদি গুণ-প্রাধান্যে মানবের লক্ষণ' দেখ।) কারণ 'মন্ত্র', 'হট্', 'লয়' ও 'রাজ'—এই চতুর্ব্বিধ যোগ-বিধি হইলেও, উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আবার তিনটী করিয়া ভাব বিদ্যমান আছে। তাহা 'ভক্তি', 'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞান'যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা বিভিন্ন বোধ হইলেও, মূলতঃ তিনটীর মধ্যেই এক সুন্দর অপূর্ব্ব সমন্বয় আছে। তাহাই পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, অথবা বায়ু, পিত্ত ও কফের ন্যায় আধিক্য-গুণানুকূল কোন কোনও বিশেষ 'রসানন্দ-প্রদায়ক'। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, সে হিসাবে কেহই কোনও রসে একেবারে বঞ্চিত নহেন। সেই কারণেই কেহ 'ভক্তিপ্রধান-মার্গ', কেহ 'ক্রিয়াপ্রধান-মার্গ' এবং কেহবা 'জ্ঞানপ্রধান-মার্গ'ই ভালবাসেন। কারণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসংখ্য জন্মের সাধনফলে, বর্ত্তমান 'দেহ' ও তাহার উপাদানপার্থক্যে সেই সেই 'ক্রিয়াই' উপযোগী, এবং সাধনাকালে সেই জন্যই কেহ—বাহ্যানুষ্ঠান-বহুল 'পূজা-যাগ-যোগ-প্রিয়,' কেহ

—মানসপূজা ও অন্তর্হোমাদিবহুল 'জপাদির অভ্যাস-যোগ-নিরত', এবং কেহবা—বিচার ও বিশ্লেষণবহুল উচ্চ 'ব্রহ্ম-ধ্যানপরায়ণ' দেখা যায়। ('জ্ঞান-প্রদীপের' ১ম ভাগে,—'চতুর্ব্বিধ যোগানুষ্ঠান বর্ণনা' এবং 'পূজা-প্রদীপে'—'দর্শনমূলক উদার উপাসনা ও যোগতন্ত্র-বিজ্ঞান' দেখ।) ফলতঃ এ সকলের মধ্যেই ভক্তি, ক্রিয়া এবং জ্ঞান-লিপ্সা অল্পাধিক পরিমাণে অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। অবস্থা ও অনুকূল উপাদানভেদে তাহাই কাহারও অল্প, কাহারও বা অধিক ফুটিয়া উঠে। সুতরাং পূর্ব্বকথিত 'মকরধ্বজের অনুপান-ভেদের' ন্যায় সাধনার ক্রিয়া অনেক স্থলে এক হইলেও, শিষ্যদিগের মধ্যে এমন ভাবে 'ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞানের' আধিক্যসহ উপদেশ প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে সেই শিষ্যের অপুষ্ট-তত্ত্ব ও উপাদানসমূহ পূর্ব্বোক্ত ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির পরিপুষ্টিসহ ভবিষ্যতে প্রকৃত মুক্তিপ্রদ যোগ-ক্রিয়া-সাধনার উপযোগী হইতে পারে। এ সকল বিষয় আর অধিক বিস্তৃত করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই, গুরু-ব্যবসায়ী উদার ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যে, সহজেই এক্ষণে ইহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। তবে অনভিজ্ঞ বা অল্পশিক্ষিত গুরুগণ কখনও ক্রমদীক্ষাদি উচ্চতর সাধনক্রিয়া প্রদান করেন না, চিন্তাও করেন না, সুতরাং এ সকল বিষয় তাহাদের না বুঝিবারই কথা, কিন্তু সাধারণ 'দীক্ষা' বা যে কোনও 'মন্ত্র-প্রদান' সম্বন্ধেও কতকটা এইরূপ বিধান তাঁহাদিগকেও অবলম্বন করিতে হয়। কারণ সিদ্ধমন্ত্র-প্রদানের অধিকার সকলের না থাকিলেও, সাধারণ মন্ত্র-দীক্ষার জন্যও তাঁহাদের মন্ত্র-বিচার, তাহার 'কুলাকুল', 'লাভালাভ', বা 'ফলাফল'

সম্বন্ধে তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সাধারণ চক্রবিচার, কতকটা 'স্থূর্তি' বা 'লটারি' খেলার মত নিয়মে গুরুকে 'মন্ত্রকোষ' হইতে মন্ত্র বাছিয়া শিষ্যকে প্রদান করিতে হয়। যাহাহউক এক্ষণে সাধক-মাত্রেই এই ক্রমদীক্ষার সাধন-সময়ে শ্রীগুরুদত্ত যোগানুষ্ঠানের ভিত্তিস্বরূপ প্রাথমিক ক্রিয়াগুলির যথারীতি অভ্যাসদ্বারা নিজের চিত্ত পরিপুষ্ট করিতে কখনই বিরত হইবে না। "ও আর কি", "ও কথা সবই বুঝিয়া লইয়াছি", এইরূপ মনে করিয়া সহসা কেহই সাধন-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। এখন যাহা শুষ্ক ও কষ্টকর, বা বৃথা সময়-নষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে, পরে তাহাই যোগ-সাধনায় প্রীতিপ্রদ বলিয়া প্রভূত আনন্দ অনুভব করিবে। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট জপাদির অনুষ্ঠানগুলি * গুরুকৃপায় যতদূর সম্ভব সত্বর সম্পন্ন হইলেই, যথা সময়ে সাধক, গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক 'পুরশ্চরণাদি'র দ্বারা তাহার পরীক্ষা প্রদান করিবে এবং গুরুদেবের চরণপ্রান্তে প্রণত হইয়া তৎপরবর্ত্তী সাধনা বা তৃতীয় অধিকার অর্থাৎ 'সাম্রাজ্যাভিষেক' গ্রহণের প্রার্থনা করিবে। ওঁ সদাশিব ওঁ॥

চতুর্থ উল্লাস

সাম্রাজ্যদীক্ষাভিষেক।

সাধক, এই সাম্রাজ্যাভিষেক-অধিকারে যে শক্তি বা যে ক্রিয়ার অভিজ্ঞানেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইবে, তাহাকে জ্ঞানশক্তির

* 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'—'জপাদির বিধি ও পুরশ্চরণ-প্রক্রিয়া'ও ভাল করিয়া দেখিয়া কার্য্য করিবে।

পূর্ব্বাভাস বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ এই সময় হইতেই সাধনা-পথে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস অনুভূতি হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত সেই মহাবাক্য "ইচ্ছা ক্রিয়া তথাজ্ঞানং তৎপরে জ্যোতিরোমিতি" পাঠক আবার তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, "সাম্রাজ্যাভিষেক" জ্ঞানশক্তিরই উদ্বোধন-উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। সাধক, ব্রহ্মজ্ঞ-গুরুর শ্রীচরণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কামনা জ্ঞাপন করিবে। গুরু, শিষ্যের পূর্ব্বানুষ্ঠিত ক্রিয়া-শক্তির কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা লইয়া উপযুক্ত বোধ করিলে, যথাবিধি এই জ্ঞানাধিকার প্রদান করিবেন। ক্রমদীক্ষার ন্যায় ইহারও অভিষেকবিধি বিশেষ অনুষ্ঠান-বহুল নহে। প্রথম অভিষেকের অনুষ্ঠান-বিধিই অধিক, উচ্চতর অভিষেকের সময় তাহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে। তবে দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে, অথবা নূতন শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান কালে, গুরুদেব ইচ্ছা করিলে, সেরূপ ব্যবস্থাও করিতে পারেন। ফলতঃ এই অধিকারে ক্রমেই মানসিক চিন্তা ও ক্রিয়াদিরই প্রত্যক্ষ উপদেশ অধিক দৃষ্ট হয়। যাহাহউক এই সাম্রাজ্য-দীক্ষার সময় গুরু দেব ইচ্ছা করিলে, প্রসন্নচিত্তে ঘটস্থাপনা করিয়া তাহাতেই জগদম্বার তৃতীয়-শক্তির আরাধনা করিবেন। শিষ্যের সঙ্কল্পাদি অনুষ্ঠান-বিধিগুলিও যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া, সেই ঘটস্থিত মন্ত্রপূত সিদ্ধবারি-সহযোগে প্রধানতঃ তৃতীয়শক্তির মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শিষ্যের সাম্রাজ্যাভিষিঞ্চন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। ইচ্ছা করিলে, পূর্ণাভিষেকের মন্ত্রও সেই সঙ্গে উচ্চারণ করিতে পারেন। অনন্তর শিষ্যকে 'সাম্রাজ্যদীক্ষা' প্রদান করিবেন।

সাম্রাজ্যদীক্ষা পঞ্চস্তরে বিভক্ত। এই মন্ত্রের নিম্নলিখিত

'কূটপঞ্চক' ক্রমে ক্রমে পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণ-সহযোগে সাধককে সম্পন্ন করিতে হয়। (১) বাগ্‌ভবকূট, (২) কামরাজকূট, (৩) শক্তিকূট, (৪) স্বপ্নাবতীকূট ও (৫) মধুমতীকূট। গুরুদেব ক্রমে ক্রমে শিষ্যকে এই 'পঞ্চ-কূটের' দীক্ষা প্রদান করিবেন।

এই দীক্ষাভিষেক-গ্রহণকালে—শিষ্য, প্রথমে গুরুদেবকে, পরে উচ্চাধিকারী কৌল-সাধকগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

সাম্রাজ্যাদিকারের দেবতা যে 'শ্রীবিদ্যা,' 'সুন্দরী', বা 'ত্রিপুরসুন্দরী' অথবা তৃতীয়া মহাবিদ্যা শ্রীশ্রীমৎ 'ষোড়শী'দেবী, তাহা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। ইনি ত্রিপুর বা ভুবনত্রয়-মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী অথবা পরমাত্মা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ 'শ্রী' বা বিভূতি, কিম্বা যোগমায়ারূপিণী 'তুরীয়া'দেবী। ইঁহাকে রাজরাজেশ্বরী 'মহামায়া'ও বলা হয়। ইহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও তদীয় শক্তিত্রয় যথাক্রমে 'মহাসরস্বতী', 'মহালক্ষ্মী' ও 'মহাকালী, মহারুদ্রী অথবা মাহেশ্বরী'রূপে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। শ্রীমদ্-দক্ষিণকালিকার ধ্যানমধ্যে যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের সুস্পষ্টভাব—সাধক, তাঁহার 'ত্রি-অঙ্গে' ব্যষ্টিভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছ, আজ তাহারই সমষ্টিরূপ এই 'তুরীয়া' মহাশক্তিতে অনুভব করিতে হইবে। এই অনুভবই সাধকের 'জ্ঞান'; সুতরাং সেই জ্ঞান-নেত্র বা 'উপ-নয়ন'-সাহায্যে, সেই পরমা-প্রকৃতিকে এক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য "মণ্ডন-পত্নী 'উভয় ভারতী' বা অবতার-ভূতা 'সরস্বতী'দেবী" কর্ত্তৃক এই 'শ্রীবিদ্যা-যন্ত্র'-প্রতিষ্ঠার আদেশ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবোপদিষ্ট ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীযন্ত্র' এখনও 'খড়দহ'ধামে অতিযত্নে ও গোপনে রক্ষিত

আছে। নিত্য তাঁহার পূজা ও ভোগারতি প্রথমেই হয়।

যাহাহউক সমস্ত বিশ্বের এককালীন বিলয় বা মহাপ্রলয়ের পর, 'পরাপ্রকৃতি' যে ভাবে 'পরব্রহ্ম' হইতে অভিন্না হইয়াও ভিন্ন-রূপে প্রতীয়মানা হইয়া থাকেন, তাহাই 'তুরীয়া'-শব্দবাচ্য, বা তাহা অপেক্ষাও প্রকট ভাষায় ও ভাবে তিনি সর্ব্বলোকবরেণ্যা 'ত্রিপুরসুন্দরী.' অথবা স্ব-প্রকৃতি-সুলভ কল্পান্তে যেন নূতনভাবে ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবমানসে প্রথম গর্ভধারণ-শক্তি-সমর্থা স্থির-যৌবন অবস্থার পরিচায়ক ষোড়শী-রূপিণী ভগবতী বলিয়া উক্তা হইয়া থাকেন।

মহাপ্রলয়ের পর বিশ্বের পুনর্বিকাশ—মনুষ্যজ্ঞানের অতীত!* সে লীলা-রহস্য সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-নিরত—বিধি, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও অবগত নহেন। যিনি সেই নিত্যলীলার আদিভূতা, যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সেই লীলা-সমূহের এককালীন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে, তিনি ব্যতীত আর কে'ই বা সে কথার পরিচয় দিবেন? তাই শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস একদিন মুনীশ্বর নারদকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। দেবর্ষি নারদ, তদুত্তরে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণন করেন। যদিও সে সকল কথা বহু বিস্তৃত, এবং সকল-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের অনেকেই তাহা অবগত আছেন; তথাপি সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এইস্থলে বর্ণিত হইলে, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

* 'জ্ঞানপ্রদীপে'—'জ্ঞানতত্ত্ব বিচার' অংশে 'সৃষ্ট্যাদি জ্ঞানতত্ত্ববিচার' এবং 'তন্ত্রে সৃষ্টির ক্রম ও তন্মাত্রাদি বিচার' দেখ।

"এক সময় সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মযোনি স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, প্রলয়ান্তে নূতন কল্পের পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, অনাদি ও অনন্ত একার্ণব-মধ্যে অচৈতন্য অবস্থাযুক্ত-বিষ্ণুর নাভিকমলোপরি নিজেকে সহসা দেখিতে পাইলেন, তখন সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাদি গ্রহমণ্ডল, অথবা বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, প্রস্রবণাদি কিছুই তাঁহার নয়নগোচর হইল না। কতকাল ধরিয়াই তিনি তেমনই অবস্থায় থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি কোথা হইতে আসিলাম এবং কেই বা আমার সৃষ্টিকর্ত্তা ? বহু চিন্তা ও আলোচনা করিয়াও যখন তিনি তাহার কোনও মীমাংসা করিতে পারিলেন না, তিনি ক্রমে কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন আকাশ-বাণী হইল—"তপস্যা কর"। তিনি অগত্যা সেই ভাবেই কমলোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। আবার কতকাল অতীত হইল—এক দিন তিনি কি জানি কি চিন্তা করিয়া, সেই আশ্রয়-কমলের মৃণালদণ্ডটী অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে নিম্নে অবতরণ করিয়া দেখিলেন, ঘোর মেঘের ন্যায় নীলকান্তি-বিশিষ্ট এক বিরাট পুরুষ (যিনি জগতের পালনকর্ত্তারূপে নিয়োজিত হইবেন) সেই মহাবিষ্ণু যোগযুক্ত বা যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া 'পদ্মনাভি'রূপে * অনন্তশয্যায় শয়িত রহিয়াছেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মা সেই যোগেশ্বরী বা যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী যোগমায়া, তাহাতে প্রসন্না হইয়া, বিষ্ণু-দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অবস্থান

* বিষ্ণুর এইরূপ 'যোগযুক্ত' অবস্থাকেই 'পদ্মনাভ' বলে। তিনি এই যোগযুক্ত-অবস্থায় অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া, "গীতা-মাহাত্ম্যে"—"পদ্মনাভস্য মুখ-পদ্মবিনিঃসৃতা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'গীতাপ্রদীপ' দেখ।

করিতে লাগিলেন। এদিকে বিশ্বপ্রতিপালক বিষ্ণুও জাগরিত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণুকে তদবস্থায় দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, —"তুমি কে মহাপুরুষ?" বিষ্ণু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,— "দেখিতেছ না—আমি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা,—'বিষ্ণু', আমারই নাভিকমল হইতে তোমার উদ্ভব হইয়াছে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "অসম্ভব, তুমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা কিসে? আমি ত দেখিয়াছি, তুমি আমার আসনপীঠরূপে এতকাল অবস্থান করিতেছিলে, তাহার পর আজন্ম যোগনিদ্রাতেই অভিভূত ছিলে, আমি সেই যোগ-মায়ার কত স্তব-স্তুতি করিয়া, তোমার সেই ঘোর যোগনিদ্রার অপনোদন করিয়াছি।" এইরূপে উভয়ের মধ্যে ঘোর বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এমন সময় সহসা সেই অনন্ত একার্ণব-মধ্যে শুদ্ধ-স্ফটিকসদৃশ এক বিরাট 'শিবলিঙ্গ' কোথা হইতে আবির্ভূত হইলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁহারই মধ্য হইতে কে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ব্রহ্মা-বিষ্ণু! তোমরা আর বৃথা বাগ্বিতণ্ডা করিও না, নিরস্ত হও, তোমরা কেহই শ্রেষ্ঠ নহ, আমিই জগতের মধ্যে সকলের প্রধান।" উভয়ের মধ্যে প্রথমে যখন তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল, তখন সহসা একজন তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা চকিত নেত্রে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বাস্তবিকই সে বিরাট-পিণ্ড অনাদি ও অনন্ত! সেই অর্ণবমধ্য হইতে সহসা উত্থিত হইয়া একেবারে আকাশ-অম্বর ভেদ করিয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, অতঃপর স্থির করিলেন, "ইঁহার আদি ও অন্তের নির্ণয় করিতে হইবে।" তাঁহাদের এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার জন্য একটী 'হংস-বাহন' ও বিষ্ণুর

জন্ত একটী 'কূর্ম্ম-বাহন' তথায় উপস্থিত হইল। উভয়ে সেই বাহনদ্বয় অবলম্বন করিয়া উভয়দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কেহই কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ব্রহ্মা ভাবিয়াছিলেন, "বিষ্ণু তাঁহার কূর্ম্ম-বাহন সাহায্যে কোনকালেই ত উপরে উঠিতে পারিবেন না, সুতরাং আমি উপরে যে কিরূপ কি দেখিলাম, তাহা জানিবার পক্ষে তাঁহার কোনই উপায় নাই। অতএব আমি তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, এমন এক অদ্ভুত বর্ণনা করিব, যাহাতে বিষ্ণু একেবারে চমকিত হইয়া যাইবেন।" এদিকে বিষ্ণু, কূর্ম্ম-বাহনে অতল জলধিমধ্যে প্রদক্ষিণ করিয়া, কোন স্থলেই তাঁহার আদি বা মূল কিছুই দর্শন করিতে না পারিয়া, যথাকালে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও ব্রহ্মাকে বলিলেন, "আমি বহু অনুসন্ধানেও এ বিরাট পিণ্ডের 'মূল' যে কোথায়, তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না, তুমি কি ইহার 'অন্ত' পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছ?" ব্রহ্মা পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে, প্রকৃত কথা গোপন করিয়া, তাহাই অর্থাৎ সেই বিরাট পিণ্ডের উপরিস্থিত এক পরমাদ্ভুত বিচিত্র দৃশ্যের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ইতঃমধ্যে পুনরায় আকাশ-বাণীর ন্যায় গম্ভীরস্বরে উক্ত হইল—"ব্রহ্মা, তুমি ত আমার অন্ত পরিদর্শন কর নাই!" ব্রহ্মা এই আকাশবাণীর বিষয়, ইতঃপূর্ব্বে মায়া-মোহে যেন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অতঃপর সেই বিরাট লিঙ্গ ভেদ করিয়া সহসা 'রুদ্রের' আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের পরস্পর অভিনব সম্মিলন হইল! দেখিতে দেখিতে অন্তরীক্ষে সেই যোগমায়া এক অপূর্ব্ব বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। বিধি, বিষ্ণু ও রুদ্র তাঁহার সেই

জ্যোতির্ম্ময় অপরূপমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া চমকিত হইলেন ও তিনজনেই মিলিত-কণ্ঠে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এ দিকে তাঁহারই ইচ্ছায় অন্তরীক্ষ-পথে এক খানি অতি বিচিত্র বিমান তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেই দেবীর ইঙ্গিতমাত্রে তাঁহারা বিমানে আরোহণ করিলেন। বিমানবর, দেবীর আদেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়াই অদম্য গতিতে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট-পথে যে চলিতে লাগিল, তাহার স্থিরতা নাই। সেই অনন্ত জলরাশি কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, ক্রমে কত ব্রহ্মাণ্ড, কত কোটি কোটি সূর্য্য,তাহাদের প্রত্যেকের আবার কত শত শত গ্রহ-মণ্ডল-পরিশোভিত স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল; কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্ব স্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় চিরনিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহার যেন সীমা নাই, সংখ্যা নাই। সেই অনির্ব্বচনীয় ধারণাতীত ধারাবাহিক দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া সেই বিমান-শ্রেষ্ঠ ক্রমাগতই পবনবেগে চলিয়াছে—এইরূপে কতকালই যে তাঁহাদের অতি-বাহিত হইল, তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে! একদা যেন সেই অনন্ত ব্রহ্ম-পিণ্ডের কেন্দ্রস্থলে তাহাদের বিমানের গতি সহসা যেন মন্দীভূত হইল, ক্রমে তাহা রুদ্ধও হইল। বিধি, বিষ্ণু ও শিব চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন,—সম্মুখে মধুর তরল তরঙ্গ-প্লাবিত এক অতীব সুন্দর অপূর্ব্ব সুধা-সাগর, তাহারই মধ্যে এক অপরূপ মণিময় দ্বীপ, তাহাতে মন্দার-পারিজাতাদি বিবিধ স্বর্গীয় কুসুম-পরিশোভিত বৃক্ষাদি, অভিনব মুক্তাদাম-বিমণ্ডিত অশোক, বকুল, কেতকী ও চন্দনসম সুরভি তরুরাজি-সমন্বিত দিব্য-কানন, তাহাতে কত বিচিত্র বিহঙ্গম বসিয়া মনের আনন্দে চারিদিক মুখরিত করিতেছে, সে স্বরও অনির্ব্বচনীয়, সকলেই

সুস্পষ্ট 'হ্রীঁ বীজ' উচ্চারণে গান করিতেছে! তাহারই মধ্যে নানা রত্নরচিত পরমাদ্ভুত শিবাকারসদৃশ একখানি সুদৃশ্য পর্য্যঙ্ক অবস্থিত, তাহার উপরিভাগে বিচিত্র রক্তবস্ত্র-পরিধানা রক্তমাল্য-পরিশোভিতা রক্তচন্দন-চর্চ্চিতা এক পরমাসুন্দরী দিব্যাঙ্গনা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। তাঁহার নয়নত্রয় শুভ্রোজ্জ্বল রক্তোৎপল-সদৃশ, সেই বিম্বাধরা রমণী, কোটি-বিদ্যুৎ-রশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্টা, কোটি-লক্ষ্মীসদৃশা শোভাময়ী, সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী পাশাঙ্কুশ শর ও চাপ বা বরাভয়-পাশাঙ্কুশ করে ধারণ করিয়া বিরাজিতা রহিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এমন অদ্ভুত বিশ্ববিমোহিনী-মূর্ত্তি এই প্রথম দর্শন করিলেন। তাঁহারা এই অরুণবর্ণা স্থিরযৌবনা সরোজবদনা ষোড়শী-সুন্দরী কুমারীকে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই চতুর্ভুজা দেবী, ক্রমে সহস্র-চক্ষু, সহস্র-বদন ও সহস্র-সহস্র-হস্তপদবিশিষ্টা-রূপে প্রতীতা হইতে লাগিলেন। তাঁহারা এই অধিদৈব অদ্ভুত-ভাব পরিদর্শন করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন। বিষ্ণু, স্বীয় বুদ্ধিবলে বলিতে লাগিলেন—"বোধ হয়, ইনিই সেই সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়ারূপিণী অব্যয়া 'পরা-প্রকৃতি' মহাবিদ্যা হইবেন। আমাদের সকলের কারণভূতা ইনি সেই দেবী আদ্যা-ভগবতীই হইবেন। ইনি সাধারণের দুজ্ঞেয়া, কেবল যোগিগণই যোগবলে ইঁহার দর্শন করিতে পারেন। ইনি যুগপৎ নিত্যা ও অনিত্যা, অর্থাৎ ওতপ্রোতজড়িত ব্রহ্ম ও মায়ারূপিণী, অথবা পরমাত্মার মূল ইচ্ছা-শক্তিস্বরূপিণী" ইত্যাদি। তাঁহারা দেবীর এইরূপ কতই গুণকীর্ত্তন করিয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বিমান হইতে অবতরণ করিলে, দেবী তাঁহাদের প্রতি

সপ্রেম-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহাদের প্রতি দেবীর দৃষ্টি পতিত হইবামাত্রই তাঁহারা যেন কি মায়াবলে তিনটী পরমাসুন্দরী কুমারীরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন। দেবী-ষোড়শী ত্রিপুরসুন্দরী, তপঃ-নিরত বিধি, বিষ্ণু, শিব, ঈশ্বর ও সদাশিবরূপ পঞ্চপদ-বা খুরবিশিষ্ট পরশিবাকার-সিংহাসনোপরি সেই স্বয়ম্ভুর নাভিসম্ভূত মৃণাল-সংলগ্ন কমলের অন্তর্গত বীজকোষশোভিত ষট্‌কোণাকার যন্ত্ররাজের মধ্যে উপবিষ্টা আছেন। * তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে 'হৃল্লেখা' প্রভৃতি দেববালা, কুমারীবৃন্দ, সখীগণসমারূপে ছত্র, চামর ও ব্যজন-হস্তে অবিরত তাঁহারই সেবা স্তব করিতেছেন। নবাগত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও কুমারীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, দেবীর সমীপ-বর্ত্তী হইলে, তাঁহারাও এক একটী ছত্র, চামর ও ব্যজন গ্রহণের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, যাহা স্বচক্ষে দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পুরাকালে দেবর্ষি নারদকে তাহাই যথাযথ বর্ণন করেন। অনন্তর ব্রহ্মা বলিলেন, 'হে নারদ! তথায় আর একটী অদ্ভুত ব্যাপার যাহা সন্দর্শন করিয়াছি, তাহাই এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

---

* অন্তর্জগতে অর্থাৎ যোগীর উচ্চতর যোগাবস্থায় সূক্ষ্ম ভাবে এই পঞ্চ-দেবতারূপ পঞ্চ-পদবিশিষ্ট সিংহাসন যে ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা যথার্থই অপূর্ব্ব বস্তু। সাধক, তখন আর লৌকিক ভাবের সাধারণ সিংহাসনের পদ বা খুরা-রূপে তাহা দেখেন না, তখন তাঁহাদিগকে তদীয় আসন-পদরূপে 'মূলাধার' হইতে উপর উপর পঞ্চ-চক্রে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই পঞ্চ-দেবতার পরিদর্শনপূর্ব্বক তদুপরি অর্থাৎ ষষ্ঠ-সংখ্যক চক্র বা 'আজ্ঞাচক্রের' মধ্যে ষট্‌কোণা-কার যন্ত্রের উপর, পর-শিবের আকারবিশিষ্ট সিংহাসন-আধার দেখিতে থাকেন এবং তাঁহারই নাভিকমলের কোরকস্থিত শ্রীযন্ত্রের উপর সেই পরা-প্রকৃতির দর্শন করেন।

যখন দেবীর পাদপদ্মস্থিত নখ-দর্পণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হইল,—আমরা দেখিলাম, তাহারই মধ্যে আমি, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, বরুণ, ও কুবেরাদি দেবতাগণ, অপ্সরাবৃন্দ, গন্ধর্ব্বগণ, সমস্ত নদ-নদী, সাগর ও পর্ব্বতসমূহ, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই তাহার মধ্যে বিঘূর্ণিত হইতেছে; তাহার পর সে সকলের পুনরায় লোপ হইল। তখন দেখিলাম,—অনন্ত সমুদ্র, তাহার মধ্যে অনন্ত-শয্যায় যোগ-নিদ্রাভিভূত ভগবান 'জগন্নাথ' 'বিষ্ণু' শয়িত, তাঁহারই নাভি-মৃণালসংলগ্ন এক কমলাসনে আমারই মত চতুর্ভুজ 'ব্রহ্মা' উপবিষ্ট, 'মধুকৈটভ'ও তথায় বিদ্যমান! এই সকল দেখিয়া আমরা তিন জনেই নিতান্ত শঙ্কান্বিত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি? অনন্তর বুঝিতে পারিলাম, ইনিই সেই পরা-প্রকৃতি বিশ্বজননী।"

এইরূপে শত বর্ষ তাঁহাদের অতিবাহিত হইলে, সেই সুদীর্ঘ-কালমধ্যে তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, নারদসমীপে ব্রহ্মা তাহা সুবিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিযাছেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এইরূপ যে,—"নিত্যই তাঁহাদের মত এক এক প্রস্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র বিমান-সাহায্যে তথায় নীত হইয়া থাকেন ও পূর্ব্বকথিত ভাবে কুমারীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া শত বর্ষকাল সেই দেবীর সেবায় অতিবাহিত করেন। বর্ষ-শতক পূর্ণ হইলে,

আবার সূক্ষ্মতর ভাবে অধিকতর উচ্চকোটীর যোগাবস্থায়, যোগী-সাধক—তাঁহাকে সহস্রারের অন্তর্গত শ্বেত দ্বাদশদল কমলমধ্যে ষট্‌কোণ-যন্ত্রের পাঁচটী কোণে ব্রহ্মাদি উক্ত পঞ্চ-দেবতা এবং ষষ্ঠকোণে পর-শিবাকার স্বয়ম্ভূর নাভিকমলমধ্যে বিরাজিতা সেই পরা-শক্তির অনুভব করিয়া থাকেন। এই সকল কথা যোগী তাঁহার উচ্চাবস্থায় স্বয়ংই অনুভব করিয়া থাকেন।

আবার সেই কুমারীরূপী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র স্ব-রূপে স্ব স্ব ব্রহ্মাণ্ড-পরিচালনার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকেন। একদা ইঁহাদেরও কালপূর্ণ হইল; ইঁহারা পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া—দেবীর চরণপ্রান্তে আসিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। রাজরাজেশ্বরী মহামায়া, গণনাতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জনয়ত্রী, তখন তাঁহাদিগকে সস্নেহে বলিলেন,—"হে বিধি, বিষ্ণু, রুদ্র! তোমাদের নিজ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রয়োজন মত সংহারকার্য্য সম্পাদন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হও।" এই কথা বলিয়াই অম্বিকা, তাঁহাদিগকে স্বীয় দক্ষিণ-নাসাপথে নিশ্বাস বায়ুসহ আকর্ষণ করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, তিন জনেই সেই আকর্ষণ-প্রবাহে পরিচালিত হইলেন। 'ব্রহ্মা' সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, 'বিষ্ণু' সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় দেবীর অন্তর-মধ্যস্থিত অনন্ত অর্ণব-মধ্যে বটপত্র-আশ্রয়ে শয়িত আছেন, অনুভব করিলেন; দৃঢ়-হৃদয় 'রুদ্র'ই কেবল সচেতন অবস্থায়, দেবীর অন্তরের অব্যক্ত ভাবসমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎপরে বাম-নাশা-পথে দেবী তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিয়া স্থাপন করিলে তাঁহারা দেবীর কতই স্তব করিতে লাগিলেন। বাহুল্যভয়ে সেই সকল স্তব বা তাহার মর্ম্মার্থও এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুতা হইয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা বিবিধ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিতা হইয়া, মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে বিধি, বিষ্ণু, রুদ্র! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়াছি, তোমরা যে, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমাদের অবগতির জন্যই তাহা আমি বলিতেছি,

তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। তোমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিতেছিলে যে, একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম, যিনি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নিরুপাধি, নিরংশ পরমপুরুষ ও জগতের আদিভূত, সেই পরব্রহ্মের সহিত আমার সর্ব্বদাই ঐক্যভাব, তাঁহাতে ও আমাতে কোন ভেদ নাই। যে আমি, সেই সে পুরুষ—আবার যে সেই পুরুষ, সেই আমি। যিনি আমাদের সূক্ষ্ম-ভেদ জানিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত 'জ্ঞানী', তিনিই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এক অদ্বিতীয় নিত্য সনাতন ব্রহ্মবস্তুই সৃষ্টিকালে দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। একমাত্র দীপ যেমন উপাধিভেদে 'আলোক ও ছায়া', বা 'জ্যোতিরাবরণে কৃষ্ণবিন্দু' * এই দ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হয়; একই বস্তু উপাধি বা দর্পণ-সাহায্যে প্রতিবিম্বরূপে যেমন দ্বিধা হয়; একমাত্র পুরুষও, সেইরূপ তাঁহার প্রকৃতি বা মায়ার কার্য্য অন্তঃকরণরূপে উপাধি ভেদে আমাদের অখণ্ড-মণ্ডলাকার বিন্দু বা 'বিম্বই'—'প্রতিবিম্ব'রূপে বহুবিধ হইয়া থাকেন। জীবের কর্ম্মসমূহের মধ্যে যে গুলি অভুক্ত অবস্থায় থাকে, প্রকৃত প্রলয়ের পর সেই অভুক্ত কর্ম্মসমূহের জন্য পুনর্ব্বার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। 'ব্রহ্ম' উক্ত বিবর্ত্তসমূহের উপাদান, 'ব্রহ্ম' ব্যতীত মায়ার সত্তাই স্ফুরিত হয় না, সুতরাং মায়া এবং মায়ার কার্য্যে ব্রহ্ম সদাই অনুস্যূত রহিয়াছেন। সেই কারণ যতগুলি 'মায়া-ভেদ', ততগুলি 'ব্রহ্ম-ভেদ'ও কল্পিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ও মায়ার এইরূপ দ্বৈত-ভাব হওয়ায়, বিশ্বমধ্যে দৃশ্যাদৃশ্যরূপ ভেদ রহিয়াছে। কেবল সৃষ্টিকালেই এইরূপ ভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু যখন সর্ব্বক্ষয়

* 'পূজাপ্রদীপে'—'শক্তিতত্ত্ব' দেখ।

বা মহাপ্রলয় হয়, তখন আমি আর স্ত্রীও নহি, পুরুষও নহি, অথবা ক্লীবও নহি। আমি তখন কেবল মায়াবিশিষ্ট-ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিয়া থাকি।"

"হে বিধি, বিষ্ণু, রুদ্র! মহাপ্রলয়ান্তে আবার নূতন কল্পের সূত্রপাত হইতেছে, এখন নূতন বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি-ব্যপদেশে আমিই শ্রী, বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষমা, কান্তি, শান্তি, পিপাসা, নিদ্রা, জরা, অজরা, বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি, অশক্তি, বসা, মজ্জা, ত্বক, দৃষ্টি ও সত্যাসত্য বাক্য; আমিই পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীরূপা নাদ-চতুষ্টয়, * আমিই অসংখ্য নাড়ীরূপিণী। তোমরা এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, আমি এখন কোনও বস্তু হইতেই আর পৃথক নহি। সংসারে আমা হইতে অসংপৃক্ত বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, তেমন বস্তুর অস্তিত্বও থাকিতে পারে না। আমি সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বময়ী, আমিই নানারূপে নানা নাম ও উপাধি-ধারণ করিয়া সমস্ত দেবতাদিগের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছি। হে বিধাতঃ! আমিই গৌরী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, বারাহী, শিবা, বারুণী, কৌবেরী, নারসিংহী ও বায়বী-শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছি। আমি প্রত্যেক সৃষ্টি-কার্য্যে প্রত্যেক বস্তুতে প্রবিষ্ট রহিয়াছি। সেই পরব্রহ্ম বা পরমপুরুষকে নিমিত্ত করিয়া আমিই নিখিল কার্য্য সাধন করিতেছি। সলিলে শৈত্য, অনলে উগ্রতা, অনিলে শোষকতা সূর্য্যে জ্যোতিঃ, চন্দ্রে শীতরশ্মি, সে সমস্ত আমারই প্রভাব প্রকাশ

* 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'—(চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনী ও পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নাদ-বিজ্ঞান' দেখ।)

করিয়া থাকে। এ সংসারে আমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কোন বস্তুই সম্পাদিত হইতে পারে না। এমন কি তোমরাও স্ব স্ব সৃজন, পালন ও প্রলয়-কর্ত্তারূপে ত্রি-জগতে পরিচিত, কিন্তু আমার অভাবে কোন কার্য্যই তোমরা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। আমার শক্তি-যুক্ত হইলেই, তোমরা সতত ক্রিয়াবান, নতুবা অকর্ম্মণ্য হইবে। তাই আজ তোমাদের নিজ ব্রহ্মাণ্ডে পাঠাইবার পূর্ব্বে আমার ত্রিধা-শক্তি যথাক্রমে তোমাদের অর্পণ করিতেছি।

"হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার এই শুদ্ধ রজোগুণাত্মিকা চারুহাসিনী মহাসরস্বতী নাম্নী মহতী শক্তিকে গ্রহণ কর। এই শ্বেত-বস্ত্রপরিহিতা, বিদ্যালঙ্কার-ভূষিতা, বরাসনোপবিষ্টা শক্তি, সর্ব্বদা তোমার ক্রীড়াসহচরী হইবে। ইহাকে আমারই বিভূতি-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিবে। তোমার এই পরমপ্রিয়া সহচরীকে সঙ্গে লইয়া তুমি অবিলম্বে 'সত্য-লোকে' গমন কর, এবং তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্ব বীজ হইতে চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টি করিতে থাক। লিঙ্গ-শরীরসমূহ জীব ও কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া আছে, তুমি যথাকালে তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক করিও। তুমি তোমার ব্রহ্মাণ্ডের চরাচর জগৎকে পূর্ব্বের ন্যায় কাল, ধর্ম্ম ও স্বভাব-সহযোগে স্বগুণ অর্থাৎ গুণত্রয় দ্বারা সংযুক্ত কর; কিন্তু ব্রহ্মন্, তোমার এই বিচিত্র ক্রিয়াকৌশল কেহই অবগত হইতে পারিবে না। তুমি তোমার আত্মভাব গোপন করিয়া পূর্ব্বে বিষ্ণুর নিকট অনন্ত-লিঙ্গের উপরিস্থিত যে, মিথ্যা-কল্পনা-প্রসূত অদ্ভুত-দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিলে, তাহারই ফলে, তোমার কল্পনা-জাত-প্রপঞ্চক বা সৃজনলীলা গুপ্তই থাকিবে। কেমন করিয়া বীজ

হইতে তাহার অঙ্কুর উদ্গত হয়, কেমন করিয়া জীব হইতে জীবের সৃষ্টি হয়, তাহা নিখিল জগতে সকলেরই অবিদিত থাকিবে। এই হেতু তুমি নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও কেবল শুদ্ধ রজোগুণাত্মক ব্রহ্মাগ্নিরূপে * যজ্ঞস্থল-ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে জীবের পূজা প্রাপ্ত হইবে না। হে বিধাত, তুমি জীবের গুণ ও কর্ম্মানুসারে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সকল কর্ম্মের যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, সকলের অলক্ষ্যে তাহাই তাহাদের অদৃষ্ট বা বিধিলিপি হইবে," ইত্যাদি—বিবিধ উপদেশ দিয়া, দেবী, বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"হে বিষ্ণো, তুমি এই মনোরমা. মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ কর। এই সর্ব্বার্থদায়িনী, মঙ্গলময়ী, শক্তিকে তোমার সহায়ার্থ অর্পণ করিলাম। ইঁহাকে কখন অবজ্ঞা করিও না। শুদ্ধ সত্বগুণ-প্রধান বলিয়া তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি সত্যবাদী, অনাদিলিঙ্গের আদি অন্বেষণকালে তুমি ব্রহ্মার ন্যায় মিথ্যা-কল্পনার সাহায্য গ্রহণ কর নাই, সেই কারণ, অপক্ষপাতে জগৎ প্রতিপালন করিবার ভার তোমাকেই অর্পণ করিতেছি। তুমি লক্ষ্মী-সমভিব্যাহারে সেই কার্য্যের জন্য স্বীয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রতিপালনে তৎপর হও। যদিও তুমি সত্বগুণ-প্রধান, কিন্তু রজঃ ও তমোগুণ তোমাতে গৌণভাবে থাকিবে। আবশ্যক হইলে অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে লক্ষ্মীর সহিত তুমি মিলিত হইয়া সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিবে। সাধারণ সকল মানুষই তোমায় ব্রহ্মসদৃশ বিবেচনায় ভক্তিভরে পূজা করিবে।"

* 'পূজাপ্রদীপে'—'উপাসনা-ভেদ' অংশে—আনন্দ প্রতিবিম্ব বা লৌকিক আনন্দ বিন্দুস্বরূপ 'ব্রহ্মা' ও 'ব্রহ্মাগ্নির' বিষয় দেখ।

অনন্তর জগজ্জননী দেবী, দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি সুধাময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"হে শঙ্কর, তুমি আমার স্বরূপপ্রকৃতি এই অতি মনোহারিণী মহাকালী গৌরীকে গ্রহণ কর। তোমাতে শুদ্ধ তমোগুণ মুখ্যভাবে এবং রজঃ ও সত্ত্বগুণ গৌণভাবে অবস্থান করিবে। আবশ্যক হইলে, তুমি রজঃ ও তমোগুণ অবলম্বনে মহারুদ্ররূপে জগৎপালনার্থ বিষ্ণুর সহায়তা করিবে। হে নিষ্পাপ মহাজ্ঞানী শঙ্কর, তুমি পরমাত্মার স্বরূপ, তুমি সূক্ষ্ম বিচার-দ্বারা যেমন সৃষ্ট বিশ্বের সংহার বা লয় কার্য্যে নিরত থাকিবে, (যথার্থ লয় মুক্তিরই নামান্তর মাত্র) তেমনই তপশ্চরণের নিমিত্ত তুমি পরম শান্তিপূর্ণ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আদর্শ অবলম্বন করিবে। যখন আমি আকর্ষণদ্বারা তোমাদিগকে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন একমাত্র তুমিই সজ্ঞানে আমার অন্তরের সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছ। সুতরাং তোমায় আর অধিক কি বলিব, যোগমার্গের সকল জ্ঞানই তোমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে; অতএব তুমি যোগিগণের শ্রেষ্ঠ ও আরাধ্য হইবে। তুমিই জগতে জীবের মুক্তির উপায়, উপাসনা ও যোগাদি সাধন-ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিবে। আমি বেদপ্রসূ ও বেদবাদিনী হইয়া ঋষিমুখে নিগম বা বেদ প্রকাশ করিব, তুমি তাহারই গুঢ় সাধনক্রিয়া তন্ত্র বা আগম উপদেশ প্রদান করিয়া মুমুক্ষু জীবের মুক্তির উপায় প্রকাশ করিবে। প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধনোপদেশ প্রত্যেক গুরুমুখে তোমাদ্বারাই প্রকাশিত হইবে।"

"হে বিধি, বিষ্ণু, শিব! তোমরা সংসারের সৃজন, পালন ও লয় এই ত্রিবিধ কার্য্যের সাধনজন্য আমার ত্রি-শক্তি বা

ত্রিগুণসমন্বিত হইয়া স্ব স্ব লোকে অবস্থান কর। তোমাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াধীন যাহা কিছু হইবে, তৎসমুদায়ই ত্রিগুণাত্মক। সংসারের কোন বস্তুই ত্রিগুণ-বিহীন হইতে পারে না। কেবল একমাত্র পরমাত্মাই তাহার অতীত নির্গুণ, গুণসমূহ তাহার অন্তরে লুপ্ত বা নিমজ্জিত থাকিলেই নির্গুণ, আবার তাহা হইতেই গুণত্রয় নির্গত হয় বলিয়াই তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয়। তাঁহাতে গুণত্রয় বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাকে সগুণ বলা হয়। তাঁহার সেই সগুণ অবস্থায় "আমি" হইয়া প্রকাশিত হই। সেই কারণ আমি আবার তিনি হইয়া যাইলে, আর কাহারই দৃষ্টিগোচর নহে। হে শঙ্কর, তুমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছ, তথাপি আবার বলিতেছি, আমি এখন নির্গুণ নহি। সগুণেই তোমাদের দর্শন-যোগ্যা হইয়াছি; কিন্তু আমার ইচ্ছা অনুসারে আমি 'সগুণ' 'নির্গুণ' দুইই হইতে পারি। আমি সেই পরাপ্রকৃতি কারণরূপিণী, আমি কোনও সময়েই কার্য্যরূপিণী নহি। যখন আমি 'কারণরূপিণী,' তখনই 'জ্ঞানময়ী' বা সগুণা, নতুবা পরম-পুরুষ-সঙ্গে অন্য সময়ে আমি নির্গুণা। আবার 'কার্য্যরূপিণী' হইলে আমি 'শক্তিস্বরূপিণী' হইয়া থাকি। হে শম্ভো, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং শব্দাদি গুণ-সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়া কার্য্য-কারণরূপে জগতের সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে; সচ্চিৎ বা ব্রহ্মের সত্ত্ব হইতে 'অহং,' আমি বা অহঙ্কার * অর্থাৎ 'মায়ারূপে' আমিই প্রথম কারণস্বরূপা।

* 'জ্ঞানপ্রদীপে'—'তন্ত্রে সৃষ্টির ক্রম ও তন্মাত্রাদির বিচার' অংশের মধ্যে ইহার বিস্তৃত আলোচনা দেখ।

অহঙ্কার আবার ত্রিগুণান্বিত, সুতরাং উহা পরোক্ষে আমারই কার্য্য বা শক্তির মূল কারণ বলিয়া যোগিগণ অনুভব করিয়া থাকেন। সেই 'অহঙ্কার' হইতেই 'মহত্তত্ত্বের' উৎপত্তি মহত্তত্ত্ব আবার 'বুদ্ধি' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। সেই কারণ মহত্তত্ত্বই—'কার্য্য', অহঙ্কার তাহার—'কারণ'। মহত্তত্ত্ব বা কার্য্যসম্ভূত আরও একটী অহঙ্কার বা প্রতিবিম্বরূপ দ্বিতীয় অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইতেই পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়। সর্ব্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি-সময়ে সেই অপঞ্চীকৃত-পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চীকৃত-পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন ঐ পঞ্চতন্মাত্রের 'সাত্ত্বিকাংশ' হইতে—'পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়', 'রজঃ-অংশ' হইতে—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়,' উহার পঞ্চী-করণদ্বারা—'পঞ্চভূত' এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে—'মনঃ,' এই ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে এই জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি কার্য্য সকল, মহাভূতরূপ কারণে মিলিত হইয়া ষোড়শাত্মক একটী 'গণ' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; আমি সেই সকলের কারণস্বরূপা "ষোড়শী" বলিয়া যোগিগণের নিকট পরিচিত হইয়াছি। বস্তুতঃ আদিপুরুষ পরমাত্মা, তিনি কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন; তিনি নির্লেপ, নিরহঙ্কার ও নির্বিশেষ জানিবে।"

"হে বিধি, বিষ্ণু, শম্ভো, তোমরা এক্ষণে ঐ বিমানারোহণে গমন কর ও আমায় স্মরণ করিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাক। আমার শক্তিত্রয় তোমাদের সহিত সর্ব্বদা ওতঃপ্রোত মিলিত থাকিবে। মহাপ্রলয়ের সময় আবার আমাতেই

তোমরা এই শক্তিতেই লীন হইবে। কারণ তোমরা তিনজনেই এক, বা একেই তিন, এবং আমা হইতেই সমুদ্ভূত, সাধারণ লোকে তোমাদের স্বতন্ত্র ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া চিন্তা করিলেও, যোগিগণ কখনই তোমাদের ভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করিবেন না।" এইরূপ উপদেশ দিয়া দেবী তাঁহাদিগকে স্ব স্ব লোকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও ভক্তিভরে সেই কারণভূতা ত্রিপুরাসুন্দরী ষোড়শী শ্রীবিদ্যাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।"

কমলযোনি ভগবান ব্রহ্মা, প্রথমে মুনিসোত্তম নারদকে, নারদ পরে শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসকে সবিস্তারে এই সকল কথা বর্ণন করিয়াছিলেন।

সাধক, এই সাম্রাজ্যাভিষেক-অধিকারে পূর্ব্বকথিত যে অপূর্ব্ব জ্ঞানশক্তির আভাস পাইলে, তাহা এই জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধির আর একটী সোপানস্বরূপ জানিবে। এই সোপানোপরি কিরূপে আরোহণ করিলে, সেই অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, গুরুকৃপায় এই পরাপ্রকৃতি বা শ্রীবিদ্যা ষোড়শী-সাধনায় তাহাই অবগত হইতে পারিবে। সাধক, ইহাও দেখিবে যে, ইতঃপূর্ব্বে যে সকল মন্ত্র ইহজন্মে বা জন্মজন্মান্তরে সাধনা করিয়া আসিয়াছ, সেই সমস্তই এই সাম্রাজ্যাধিকারে রাজরাজেশ্বরী সাধনায় সমষ্টিভূত হইয়া আসিবে, অর্থাৎ দুর্গা, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণপতি, কালী, তারা প্রভৃতি সকল মন্ত্র বা মূর্ত্তিই তাঁহাদের আদিভূত মূল প্রকৃতিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মহাপ্রলয়ের সময় নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যেমন পরাপ্রকৃতিতে আসিয়া মিলিয়া থাকে, সাধক-হৃদয়ও তেমনি বিভিন্নমুখী হইলেও সাধনাফলে ক্রমে তাহা সমষ্টীভূত হইয়া ব্রহ্মসাধনার মহাপ্রলয়ে

এই আদি প্রকৃতিতে, পরে উচ্চতম সাধনায় সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত পরব্রহ্মে সংযুক্ত হইবে।

অনেক অদূরদর্শী ব্যক্তি এখন মনে করিতে পারেন যে, ষোড়শী-সাধনাই যদি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অব্যবহিত-পূর্ব্ব উপায় হয়, তবে পূর্ব্বকথিত ভিন্ন ভিন্ন সাধনার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে, গুরুমণ্ডলী বলিয়া থাকেন,—"বৎস, মুখের কথায় এগুলি সহজে মোটামুটীভাবে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু প্রকৃত সাধনাপথে না পড়িলে, অর্থাৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে তাহার গুরুত্ব ঠিক অনুভব করিতে পারিবে না। তীর হইতে অনেককেই নদী বা পুষ্করিণীতে সন্তরণ করিতে দেখা যায়, কেহ কেহ সন্তরণ-সাহায্যে পরপারে উঠিতেও পারে, তাহাও দেখা যায়, কিন্তু তোমার সন্তরণে ভালরূপ অভ্যাস না থাকিলে, তুমি কখনই তাহাদের ন্যায় অবলীলাক্রমে পরপারে উঠিতে পারিবে না। প্রথমে তোমার সন্তরণ কৌশল অবগত হওয়া চাই, তাহা না হইলে জলে নামিলেই ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তাহার পর যদি সে কৌশলও আয়ত্ত হয়, তথাপি বারংবার অভ্যাস দ্বারা শক্তি সঞ্চয় ব্যতীত নদী বা কোন বৃহৎ পুষ্করিণীর পরপারে একেবারেই উপস্থিত হইতে পারিবে না। হয়ত কিছুদূর যাইয়াই তোমার হস্তপদ অবশ হইয়া পড়িবে, ফলে কাহারও সাহায্য না পাইলে সেই স্থানেই হয়ত তোমার সন্তরণ-সাধ ইহজীবনের মত মিটিয়া যাইবে। সেই কারণ সাধনসলিলেও ক্রমে ক্রমে অধ্যবসায় সহ বৈরাগ্য-ও অভ্যাসযোগ-রূপ সন্তরণ দ্বারা পুষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব

অধিকারে সাধকের সেই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বিভুবনের কর্ণভূমি হইতে বৈদিক বা তান্ত্রিক সন্ধ্যানির্দ্দিষ্ট সৃষ্টি, পুষ্টি ও লয়াত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ক্রমে তাঁহাদেরই অন্তরঙ্গ শক্তি—সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতীরূপা 'গায়ত্রীত্রয়'। পরে মহাবিদ্যা অর্থাৎ কালী, তারা ও ত্রিপুরা আদি সাধনায় সোপানস্বরূপ পর পর সাধনাগুলি যাহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই সকলের দ্বারাই সাধকের চিত্ত ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে। যিনি যেমন পরিশ্রম ও বিধি অনুসারে অগ্রসর হইতে থাকিবেন, গুরুকৃপায় তিনি তেমনই ক্রমোন্নত ক্রিয়া-সাধনার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভগবদানন্দ লাভ করিতে পারিবেন। সকল সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়ার অসংখ্য বিধিনিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, ইতঃপূর্ব্বে তাহা অনেকবার বলা হইয়াছে। সদ্‌গুরুর কৃপায় সাধক তাহাই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ যথাক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধক এই সময়, "কামকলা"-রহস্যও * গুরুর নিকট অবশ্য অবশ্য জানিয়া লইবে। ('পূজা-প্রদীপে'—'পূজা ও উপাসনা বিজ্ঞান' ভাল করিয়া দেখিলে, সাধনার বহু গুপ্তরহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।)

সাম্রাজ্যাধিকারের ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে, যথাসময়ে পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র-পুরশ্চরণ ও আনুষ্ঠানিক জপাদি † যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া সাধক গুরুচরণসন্নিধানে উপস্থিত হইবে ও তদীয় আদেশ অনুসারে উঁহার পরবর্ত্তী অধিকার 'মহাসাম্রাজ্যাভিষেক' গ্রহণ করিবে। ও সদাশিব ওঁ॥

* ভগবান শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনপত্নী উভয় ভারতীর নিকট উপদিষ্ট হইয়া 'কামকলা-রহস্য পরিজ্ঞানের জন্য ভিন্ন শরীরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

† 'পুরশ্চরণপ্রদীপ' দেখিয়া এই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া লও।

পঞ্চম উল্লাস

মহাসাম্রাজ্যাভিষেক।

বর্ত্তমান সময়ে সনাতন সাধন-প্রথা সমস্তই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কোনও ক্রিয়ারই বিশেষ ক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। গুরুর উপদেশ ব্যতীত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ-পাঠে যাঁহার যে অংশটী ভাল বোধ হইয়াছে, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তিনি সেই অংশমাত্র অবলম্বন করিয়াছেন বা তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্তপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। হয়ত সেই অংশমাত্রই আবার সর্ব্বসাধনার সার বলিয়া শিষ্য-দিগের মধ্যেও অসঙ্কোচে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। যখন আমাদের বৈদিক বিদ্যাপীঠ বা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, অথবা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-সময়েও 'নালন্দা,' ক্রমে তাহারই অনুকরণে আজ সমস্ত সভ্য জগতে এবং পুনরায় ভারতেও পাশ্চাত্য-শক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের যেমন 'ইউনিভার্সিটী' বা 'বিশ্ববিদ্যালয়ের', প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, পূর্ব্বে 'নৈমিষারণ্য' প্রভৃতি প্রধান প্রধান তপোবনের মধ্যে "নানা মুনির নানা মত" এই প্রসিদ্ধ প্রবচন সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ-যোগাদি সাধনার একটী উদার সাধন ক্রমসহ সাধারণ বা 'মহাসাধনপীঠ' নির্দ্দিষ্ট ছিল। জ্ঞানস্বরূপিণী গঙ্গার সাগর-সঙ্গমের নিকট সংসারের আদি-জ্ঞানী মহর্ষি কপিলের প্রতিষ্ঠিত আদি নিত্য কুম্ভ (জ্ঞানকুম্ভ) প্রতিবৎসর পৌষ বা মকর সংক্রান্তিতে সম্পন্ন হইত এখনও

তাঁহারই স্মৃতি পূজা উপলক্ষে তথায় প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানকুম্ভও আদিযুগে বিশেষ সাধনপীঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। * সকলেই সেই পীঠ-নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিয়ম অবনত মস্তকে তখন পালন করিতেন। তবে সেই সকল ক্রিয়ার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি যেমন ভাবে তাহা অনুভব করিতেন, স্ব স্ব শিষ্যগণমধ্যে তাহার তেমনি অকপট ভাবেই তাঁহারা শিক্ষা দিয়া যাইতেন। কালপ্রভাবে সেই শিক্ষাপ্রভাব মন্দীভূত হইলেও অনেকেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া বিভিন্ন মত প্রচারে সাধনপীঠ ক্রমে বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, তখন শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাস প্রভৃতির আদেশে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভু সেই প্রাচীন নিয়ম অবলম্বন করিয়া ভারতের বিভিন্নকেন্দ্রে কুম্ভমেলারূপে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাহাও আজ শিথিল-মূল হইয়া পড়িয়াছে। সাধুসজ্জন গৃহস্থ সকলেই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছে। এখন চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত সাধারণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের অনেকেই যেমন রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া বা সামান্য কিছু পড়িয়া শুনিয়া, কোনরূপ পরীক্ষা প্রদান না করিয়াও অনায়াসে স্ব স্ব অভিমত উপাধি-ভূষণে ভূষিত হন; কেহ স্মৃতিরত্ন, কেহ ন্যায়রত্ন, কেহ ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার বা বাচস্পতি প্রভৃতি স্বকপোলকল্পিত উপাধি গ্রহণ করিয়া যজমানের বাড়ী বিদায় গ্রহণ করিবার এক একটী উপায় নির্দ্দেশ করেন, বাস্তবিক কোন শিক্ষাপীঠ বা পরীক্ষাকেন্দ্র হইতে পরীক্ষাপ্রদান-ফলে তাহা সংগৃহীত নহে, সুতরাং সে বিদ্যার একটা পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যেরূপ সুকঠিন, সাধনমার্গে সেইরূপ উক্ত

* 'জ্ঞানপ্রদীপের' (দ্বিতীয় ভাগে)—কপিল ও গঙ্গাসাগর প্রসঙ্গ দেখ।

মহাসাধনপীঠের অভাব হওয়ায়, সাধকদিগেরও অধিকার নির্দ্দেশ করাও এক্ষণে নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; এখন বাজে উপাধিধারী পণ্ডিতদিগের ন্যায় যে কেহ ইচ্ছামাত্রই সামান্য গৈরিক মৃত্তিকা সাহায্যে নিজ বস্ত্র গেরুয়া করিয়া, নিজেই মনোমত একটা আনন্দ-সংযুক্ত নামের সহিত স্বামী, ব্রহ্মচারী অথবা পরমহংসরূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। যিনি আদৌ দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই অথবা সাধনার প্রথম পাঠও যাঁহার আয়ত্ত হয় নাই, আজ তিনিও স্বয়ং 'স্বামী,' আবার পরমগুরু ঠাকুর সদানন্দ স্বামী ও তৈলঙ্গস্বামীও 'স্বামী'; পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণও 'পরমহংস', আবার নাম করিব না, এমন অনেক মহাপুরুষও (?) 'পরমহংস,' ঋষি, রাজর্ষি ও মহর্ষি নামে পরিচয় দেন। সুতরাং সেই মহাসাধনপীঠের অভাবে এবং ধর্ম্মান্তর-বিশ্বাসী, অথবা কেবল ইহলৌকিক ধর্ম্মানুরাগী ভারতের বর্ত্তমান নরপতির সনাতন পারলৌকিক ধর্ম্মে জ্ঞান, বিশ্বাস ও সহানুভূতি-শূন্যতার ফলে, সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃতই যেন ভীষণ যথেচ্ছাচার অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষ সনাতন-ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ এদেশের আধুনিক শাসক-সম্প্রদায় আমাদিগের আচার, নীতি ও সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সদসৎ বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহার ভালমন্দ কোনটীতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। সেই কারণ, এই বিরাট সনাতন-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, গোপনেও প্রত্যক্ষভাবে কত অনাচার অপকর্ম্ম, ও অধর্ম্ম যে, দেশমধ্যে প্রচলিত হইতেছে, তাহার নির্ণয় নাই; আবার ক্রিয়াবিহীন বেদান্তাদির শুষ্ক শব্দজ্ঞানী এবং অধর্ম্মাচারী বা যথেচ্ছাচারীর সংখ্যা বাহুল্যে ও তাহাদের পীড়নে প্রকৃত সদ্ধর্ম্মও অনেক নষ্ট হইতেছে। বেদান্ত সূত্রকার ব্যাস

ও তাহার ভাষ্যকার ও শঙ্করের নির্দ্দিষ্ট যথাক্রম যোগাদি ক্রিয়ার উপদেশ এখন আর কেহ দেখেন না। তাহার শিক্ষা ও সাধনোপদেশ আর কেহই গ্রহণ করেন না, কাহাকেও উহার যথাবিধি উপদেশ প্রদান করিতেও দেখা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া সাধনভূমি 'ধর্ম্মক্ষেত্র' ও 'কর্ম্মক্ষেত্র' ভারতের অঙ্গ হইতে সাধন-বিটপীর মূল একেবারে উন্মূলিত হয় নাই। এখনও বাহ্যাড়ম্বরহীন বহু উন্নত সাধক ও উদার মহাপুরুষগণ অনুসন্ধিৎসু সাধকবৃন্দকে যথেষ্ট কৃপা করিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই উপদেশ ও আদেশক্রমে মন্ত্রাদি বিভিন্ন অঙ্গ বিশিষ্ট যোগ সাধনার ক্রম যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

যাহাহউক পূর্ব্ববর্ণিত সাম্রাজ্যাভিষেকের পর, গুরুদেব, শিষ্যের সাধনাবস্থা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবেন, পরে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, 'মহাসাম্রাজ্যাভিষেকের' অধিকার প্রদান করিবেন। এই অধিকার উপলক্ষেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিষেকের অনুরূপ সঙ্কল্প ও ঘটস্থাপনাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া, তাহাতে ওতপ্রোতজড়িত অর্দ্ধাঙ্গকেশ শিবশক্তির বা 'অর্দ্ধনারীশ্বর' দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিবেন, এবং তাঁহার যথাশক্তি উপচার সহযোগে পূজা করিবেন, পরে অর্দ্ধনারীশ্বর-মন্ত্রে ঘটস্থিত সিদ্ধ-সলিলদ্বারা শিষ্যের মহাসাম্রাজ্যাভিষিঞ্চন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন ও ইচ্ছা করিলে এই সঙ্গে পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের দ্বারাও গুরুদেব শিষ্যের মস্তকে অভিষিঞ্চন করিতে পারেন। অনন্তর যথাবিধি মূলমন্ত্রের দীক্ষা প্রদান করিবেন।

* 'জ্ঞানপ্রদীপ' ও 'পূজাপ্রদীপে' ও সাধনার গুপ্তক্রম বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—তাহাও বারবার দেখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিও।

অতঃপর শিষ্য, প্রথমে গুরুদেবকে, পরে উচ্চাধিকারী সাধকদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া প্রণাম ও সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন। এখন হইতে গুরুপ্রদত্ত নূতন ক্রিয়া-সাধনায় সাধক বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিবেন। কারণ পূর্ব্বোক্ত সাম্রাজ্য-সাধনা পর্য্যন্ত সাধক, গুরুদত্ত ক্রিয়ার সহিত সাধারণতঃ বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রজপ ও অধিককাল বাহ্য-পূজা-অর্চ্চনাই করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, বাহ্যপূজাবহুল মন্ত্রজপের সে কঠিন নিয়ম আর পালন করিতে হইবে না, তবে প্রথম হইতেই সেরূপ জপানুষ্ঠান একেবারে পরিত্যাগ করাও নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে। ব্যায়াম অভ্যাসী, শরীর পুষ্ট হইয়াছে বলিয়া একেবারে ব্যায়াম পরিত্যাগ করিলে অবিলম্বে যেমন কঠিন বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন অনেক সাধকও সেইরূপ মহাসাম্রাজ্য-দীক্ষার পরই পূর্ব্বসাধিত বিধিতে পূজা ও জপাদির অনুষ্ঠান একেবারে পরিত্যাগ করিবার ফলে সহসা হীনবীর্য্য ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। সাধকমাত্রেরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, এক একটী অধিকার যেমন উচ্চমার্গে উঠিবার এক একটী সোপানপাদ, সেইরূপ তাহা হইতে পদস্খলিত হইবার পক্ষেও এই নূতন নূতন অধিকারগুলিও তেমনই নানা আশঙ্কাপ্রদ। সাধনার সমগ্রপথই সতত পিচ্ছিল, সেই কারণ একটী পদ উত্তোলন করিবার পূর্ব্বে অন্য পদে যথেষ্ট বল আছে কিনা, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা ও পরীক্ষা করিতে হইবে। নতুবা একটী পদ তুলিয়া অব্যবহিত উচ্চ সোপানে রাখিতে না রাখিতে হয়ত অন্য পদ সহসা সরিয়া যাইতেও পারে। এইহেতু পূর্ব্ব সাধনায় পূজা-জপাদিলব্ধ প্রবল শক্তি সঞ্চিত না হইলে, সহসা বাহ্যপূজা ও জপ একেবারে পরিত্যাগ করা কোন

ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনা-পুষ্ট বায়ু-ভূতশুদ্ধির ফলে শূন্যময় বিশ্বের চিন্তা বা ধারণা ভালরূপে অভ্যাস না হইলে যে, অভীষ্টদেবতার যোগাঙ্গীভূত মূর্ত্তি ধ্যান বা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ চিন্তার কার্য্য আদৌ স্ফুরিত হইবে না। এ সকল বিষয় আর বৃথা বাক্যের সাহায্যে বুঝান সম্ভবপর নহে, ক্রমেই গূঢ় অনুভাব্য বিষয়ের জটিলতা আসিয়া পড়িতেছে; সাধক ভক্তিবিশ্বাসযুক্ত অবিরত ও অদম্য ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে তাহা আপনা আপনিই অনুভব করিতে পারিবেন। আবশ্যক হইলে, নিজ সংশয় ও অভাব-বোধানুসারে গুরু-প্রসাদ-লব্ধ তাহার প্রতিক্রিয়াসমূহ জানিয়া লইবেন। এই সাধনায় সাধক যাহা উপলব্ধি করিবেন তাহার স্থূলমর্ম্ম—একাধারে পুরুষ-প্রকৃতি শিব-শক্তি বা ব্রহ্ম ও মায়ার অলৌকিক মিলন জ্ঞান। কথাটী বেশ সহজ, দুই চারিটী অক্ষরে বেশ লিপিবদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু উহার জ্ঞান বড়ই দুরূহ, বড়ই কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ। এই সকল বিষয় আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র ভাষা জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। দৃঢ় সাধনা সাপেক্ষ। যদি পূর্ব্বোক্ত ভাবে সাধনক্রিয়ার ফলে, দেহাত্ম-বুদ্ধিনাশান্তে বিশ্বচরাচর শূন্যময় চিন্তা করিবার অধিকার না আইসে, তাহা হইলে, বর্ত্তমান সাধনায় কোনও ফলই অনুভব করিতে পারিবে না। প্রথমে স্থূলভূতশুদ্ধিসহ ক্রমসাধনালব্ধ শূন্য-ধারণা ও তারিণীময় আত্মচিন্তা, পরে তাহারই সাধন সামর্থ্যের ফলে সাম্রাজ্য-সাধনালব্ধ পরাপ্রকৃতির উপলব্ধি, অনন্তর পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মের এই মূল দ্বৈতভাবের মধ্যে একাঙ্গেই দ্বৈতাদ্বৈত বা 'অর্দ্ধনারীশ্বরের' চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে।

সাধক, জীবই 'প্রকৃতি' এবং ঈশ্বর বা অভীষ্ট দেবতাই 'পুরুষ', এখন তোমার এই বিচিত্র প্রকৃতি পুরুষ সাধনাতেই মনোযোগী হইতে হইবে।

সাধনশাস্ত্রে 'ধ্যান' চতুর্বিধ নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রথম স্থূল-ধ্যান বা মূর্ত্তিধ্যান; তদনুরূপ 'বৈখরী' তথা 'মধ্যমা'-নাদাত্মক 'মন্ত্রধ্যান' ও ইহার অন্তর্গত বা অঙ্গস্বরূপ, ইহার পর দ্বিতীয় প্রকার ধ্যান—সূক্ষ্মধ্যান বা 'পশ্যন্তী'-নাদাত্মক কূটস্থচৈতন্যরূপ 'জ্যোতিঃ ধ্যান'; অনন্তর সূক্ষ্মতর ধ্যান বা 'পরা'-নাদের অব্যবহিত নিম্নবস্থায় 'বিন্দুধ্যান'। ইহার পর চতুর্থ পরা-নাদানুভূতিরূপ ব্রহ্মধ্যান। * একেবারেই কাহারও সূক্ষ্ম জ্যোতির্ধ্যান ও বিন্দুধ্যান করিবার অধিকার জন্মে না, সেই কারণ পূর্ব্ববর্ণিত ক্রমোন্নত বিবিধ সাধনা প্রত্যেক সাধককেই যথাবিধি অবলম্বন ও অভ্যাস করিতে হয়, তাহা হইলেই সময়ে সাধকের আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যাহাহউক এক্ষণে যে ধ্যানের কথা বলা হইতেছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত স্থূল ভূতশুদ্ধি, ষড়ঙ্গ, করাঙ্গ ও ব্যাপক ন্যাস এবং 'পূজাপ্রদীপ' নির্দ্দিষ্ট পূজা-ধ্যানাদি সাধনা-লব্ধ ধারণাবিধির অভ্যাসের ফলেই সহজে উপলব্ধ হইবে। নতুবা কেবল সাধনার ভণ্ডামি বা বৃথা পণ্ডশ্রম হইবে, প্রকৃত অর্দ্ধনারীশ্বরের ধ্যান কিছুতেই হইবে না। 'অর্দ্ধনারীশ্বর' অর্থে—একটী দেহের অর্দ্ধ অংশ ঈশ্বর বা পুরুষ ও অপরার্দ্ধ নারী বা প্রকৃতি;

* মন্ত্রযোগের মূর্ত্তিধ্যান বা স্থূলধ্যান, হঠযোগের সূক্ষ্মধ্যান বা জ্যোতির্ধ্যান, লয়যোগে বিন্দুধ্যান এবং রাজযোগে ব্রহ্মধ্যান।

'জ্ঞানপ্রদীপ' দেখ। 'পুরশ্চরণপ্রদীপে' চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনী ও পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নাদবিজ্ঞান দেখ।

হরগৌরী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতির যেরূপ চিত্র সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয়, ইহা ঠিক তাহা নহে; পুরুষাংশে পুরুষানুরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব এবং স্ত্রী-অংশে স্ত্রীজন-সুলভ অঙ্গচিহ্ন ও আভরণাদি ইহা স্থূল অথবা সাধারণ সাধকের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ('পূজা-প্রদীপে'—৬৪ ও ৬৫ পৃষ্ঠায় ইহাঁর ধ্যান ও স্তোত্র দেখ) উন্নত সাধক শূন্যমার্গে বা মহাশূন্যে যখন স্বীয় পঞ্চভূতাত্মক দেহ পর্য্যন্তও বিলীন করিতে সমর্থ হইবে, যখন স্থূল দেহের অহঙ্কার বা দেহাত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিতে লয় করিতে পারিবে, তখনই সাধনার উন্নত অবস্থায় সেই পরাপ্রকৃতির মধ্যে মধ্যে বিশ্বপুরুষের এক অলৌকিক ও অস্পষ্ট ক্রমে সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে পারিবে। অতি স্থূলভাবেও বলিতে হইলে—তখন সেই প্রকৃতি যথার্থই প্রকৃতি অথবা পুরুষ, তাহা যেন সহসা স্থির করিতে পারা যাইবে না। এই মনে হইতেছে—আহা, কিবা বিশ্বনাথমনো-মোহিনী বিরাট প্রকৃতি, আবার পরক্ষণেই মনে হইতেছে—কৈ প্রকৃতি কোথায়? উনি যে, শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ অনিন্দ্য-সুন্দর বিরাট বিশ্বের ঈশ্বর স্বয়ং পরমপুরুষ! যেন দুইখানি অতি স্বচ্ছ স্ফটিকময়ী মূর্ত্তি, তাহার একটী প্রকৃতি, অন্যটী পুরুষ, উভয় মূর্ত্তি অগ্র-পশ্চাতে রক্ষিত ও ক্ষণে ক্ষণে বুঝি স্পন্দিত বা আন্দোলিত, যেন চম্পক পীতাভ শ্বেত ও শুদ্ধ শ্বেতবর্ণের দুইটী জ্যোতিঃপ্রভার কিবা অপরূপ সম্মিলন! স্থূল নেত্রে সাধারণ-মস্তিষ্কে তাহা সহজে ধারণা করিতে পারা যায় না, সুতরাং সেই অদ্ভুত ও অলৌকিক 'অর্দ্ধাম্বিকেশ'বা 'অর্দ্ধনারীশ্বর'-মূর্ত্তির ধ্যান করিবে কে? গুরুপরম্পরা-নির্দ্দিষ্ট ক্রমোন্নত-সাধনা-পদ্ধতির অভ্যাসফলেই তাহা সাধকপুঙ্গবের অধিগম্য হইয়া থাকে। সাধক, স্থির, ধীর ও

বিশ্বাস ভক্তিসহযোগে কায়মনে যথাবিধি সেই পথে অগ্রসর হও, প্রভূত আনন্দ পাইবে। কেবল "জয় গুরুদেব," "গুরুদেব যা করেন, তাই হইবে," ইহা খুবই বিশ্বাসপুষ্ট গুরুভক্তির কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বীয় সাধন-কর্ম্মের পথে সে ধারণা এখন কতকটা ভুলিয়া যাইতে হইবে। গুরুদেব, কিসে বা কি করিয়া তোমার গুরুদেব হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই চিন্তা করিতে হইবে। তিনি যেরূপ কঠোর ও ক্রমোন্নত সাধনা-পথ ধরিয়া আজ এতটা উন্নত বা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এবং তোমার গুরুপদবাচ্য হইয়া সাধারণের পূজনীয় হইয়াছেন, তোমাকেও সেইরূপ কঠিন ক্রমোন্নত সাধনা পথই অবলম্বন করিতে হইবে, এবং সেই পথে অদম্য উৎসাহের সহিত অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। কেবল নয়ন মুদ্রিত করিয়া বা উচ্চরোলে তাঁহার গুণকীর্ত্তণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে এখন আর চলিবে না, তাহার সহিত ব্রহ্মদৃষ্টির পক্ষে অনুকূল পরম প্রীতিপ্রদ একমাত্র সাধনার ক্রমোন্নত পথ গুরুমুখাগত হইয়া বিধিমত প্রকারে অবলম্বন কর। কারণ সাধনার যে স্তরে এখন উপস্থিত হইয়াছ, তাহা সাধারণ সাধক হইতে যে অনেক উচ্চে, তাহা বলাই বাহুল্য। এ অবস্থার বিষয় নিম্ন বা প্রাথমিক সাধকদিগের সম্পূর্ণ অনধিগম্য। বিজ্ঞাপন বা সংবাদপত্রে উচ্চ সমালোচনা দেখিয়া, হয়ত যথেষ্ট মূল্য দিয়াই একখানি গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছ, কিন্তু ক্রয় করিয়া তাহা সাবধানে তুলিয়া রাখিয়া দিলে বা গ্রন্থকর্ত্তার সর্ব্বদা জয়কীর্ত্তন করিলে, গ্রন্থান্তর্গত জ্ঞানবার্ত্তা বা তাহার অন্তর্নিহিত ভাবসমূহ যেমন তোমার আয়ত্ত বা উপলব্ধ হইবে না, তাহা মনোযোগ ও পরিশ্রম-সহকারে পাঠ

করিতে পারিলেই সেই সমালোচনা ও বিজ্ঞাপনের যাথার্থ্য তোমার অনুভূত হইবে; হয়ত তাহা হইতে তোমার কোন বিশেষ জ্ঞান বা শিক্ষা লাভ হইতেও পারে। তাই বলিতে-ছিলাম, সাধনাবস্থায় তেমনই গুরুর উপদেশগুলি কেবল কানে শুনিয়া রাখিলে বা কণ্ঠস্থ করিলেই চলিবে না, যাহাতে তদনুসারে সাধনাদ্বারা তাহার আনন্দ অনুভব করিতে পার, প্রাণপণে তাহার জন্যই যত্নবান হও।

এই পঞ্চম-সাধনার বা অভিষেকের পরই, অথবা ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ষষ্ঠসাধনা বা প্রকৃত 'যোগদীক্ষাভিষেক' সাধকের অবলম্বনীয়। সাধনার সেই প্রাথমিক দীক্ষাভিষেক হইতে যোগের যে সকল প্রাথমিক ক্রিয়া ও মুদ্রাদি সাধককে করিয়া আসিতে হইতেছে, তাহা এতদিন অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপই ছিল, এক্ষণে তদানুসঙ্গিক বহিরঙ্গ ক্রিয়া কতক কতক পরিত্যাগ করিয়া যোগের অন্তরঙ্গ ক্রিয়া বিশেষভাবে সাধকের অবলম্বনীয়। পরবর্ত্তী উল্লাসে তাহাই যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে। ওঁ সদাশিব ওঁ॥

ষষ্ঠ উল্লাস

যোগদীক্ষাভিষেক।

সাধক, কত জন্মজন্মান্তরের মহাপুণ্যফলে এইবার সেই পরমানন্দপ্রদ মন্ত্রযোগ-সাধনার অপূর্ব্ব অন্তিম ক্রিয়াসহ হঠাদি ক্রিয়াবহুল যোগ-দীক্ষা গ্রহণ কর। এতদিন "যোগ যোগ"

বলিয়া যে কথামাত্র শুনিয়া আসিয়াছ, আজ তাহাই বর্ণে বর্ণে অনুভব করিতে অগ্রসর হও। প্রাণের সকলজ্বালা দূর হইবে, সংসারের অশান্তিকর যাতনাসমূহের লাঘব হইবে, তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য এখন হইতে কার্য্যে পরিণত হইবে।

"সাধনপ্রদীপে" "আগমে-পূজাতত্ত্ব" শীর্ষক চতুর্থ উল্লাসে 'যোগ কি?' ও 'অষ্টাঙ্গ যোগ' সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং 'জ্ঞানপ্রদীপে'—সরলভাবে চতুর্ব্বিধ যোগ রহস্যই বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। সাধনাভিলাষী পাঠক, এখন তাহাও বারবার পাঠ করিয়া দেখ। তাহা হইলে পরবর্ত্তী অংশে লিখিত, যোগ-সাধনা বিষয়ক উপদেশগুলি, যাহা চিরদিন সাত্ত্বিক বা সদ্গুরুগণগুলিদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। তাহাতে একস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে,

"অভ্যাসাৎকাদি বর্ণোহি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথাযোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে॥"

অর্থাৎ ক-কারাদি বর্ণমালার অভ্যাস দ্বারাই যেমন কালে বেদতন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিতে পারা যায়, সেইরূপ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পূজা অর্চ্চনা হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম যোগবিধির অভ্যাস সহযোগেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তাহার পরই বলা হইয়াছে :—

"ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ॥"

অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, কোনও স্থলেই 'যোগ' বলিয়া

কোনও বিশেষ বস্তু নাই, যোগবিশারদ সিদ্ধ সাধকগণ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিবার কর্ম্মরূপ কৌশল বা প্রণালী-কেই * 'যোগ প্রক্রিয়া' শব্দে অবিহিত করিয়াছেন। যে শাস্ত্রে এই যোগ-ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকেই গুপ্ত শাম্ভবীবিদ্যা বা যোগশাস্ত্র বলে। শিবোক্ত সেই সকল শাস্ত্র অতি গোপনীয়। ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন :—

"যোগশাস্ত্রমিদং গোপ্যমস্মাভিঃ পরিভাবিতম্।
সুভক্তায় প্রদাতব্যং ত্রৈলোক্যেঽস্মিন্ মহাত্মনে॥"

মৎকথিত এই যোগশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে গোপন রাখা কর্ত্তব্য, কেবল এই ত্রিলোকমধ্যে যে মহাত্মা পরম ভক্তিমান তাঁহাকেই ইহা প্রদান করা যাইতে পারে। অন্যত্র ভগবান 'জ্ঞানসঙ্কলিনী' তন্ত্রে বলিয়াছেন।

"বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্যা গণিকাইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবীবিদ্যা গুপ্তাকুলবধূরিব॥"

গণিকাগণের মুখমণ্ডলে যেমন কোনও অবগুণ্ঠন নাই, দর্শনাভিলাষী ইচ্ছা করিলেই তাহাদের মুক্তরূপ-মাধুরী দর্শন করিতে পারেন, বেদ-তন্ত্র, দর্শন ও পুরাণাদি আমাদিগের পবিত্র শাস্ত্র-সমূহও সেইরূপ অবগুণ্ঠন-পরিশূন্য, অর্থাৎ শিক্ষিত ভক্ত অভক্ত কর্ম্মী অকর্ম্মী আদি ব্যক্তি-সাধারণের নিকট তাহার মর্ম্মরাশি সততই সম্যক্ উন্মুক্ত ; যে কেহ অভিলাষ করিলে নিজে নিজেই বা ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদিগের নিকট সেই সকল গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিয়া তাহার সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কিন্তু শাম্ভবীবিদ্যা অর্থাৎ শম্ভুপ্রোক্ত—গুপ্তসাধনতন্ত্র বা 'যোগশাস্ত্রসমূহ'

* "যোগ :—কর্ম্মসুকৌশলম্।" গীতা ২য় অধ্যায় ৫০ শ্লোক।

ঠিক সেরূপ নহে, ইহা প্রকৃতই কুলবধূর ন্যায় যেন অসূর্য্যম্পশ্যা ও অপূর্ব্ব সাধনবস্ত্র দ্বারা সমাবৃতা। সাধন-পথে নিতান্ত আত্মীয়রূপে তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে না পারিলে, সেই স্নিগ্ধ কোমল জগন্মোহিনীরূপের আদৌ সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ, ভগদ্ভক্তির প্রস্রবণ-স্বরূপ বিশ্বময় প্রবাহিত হইতেছে, সেই প্রবাহ-সলিলে অবগাহন করিতে করিতে ভক্তের হৃদয় ক্রমে সেই মাতৃরূপ সন্দর্শন করিবার অভিলাষ করে, তখন সিদ্ধগুরুর কৃপায়, সাধনায় পরিপুষ্ট হইলে করুণাময়ী মায়ের অপার কৃপালাভ হয়; তখন বিশ্বজননী যেন বিশ্ববিমোহিনী যোগমায়া মূর্ত্তিতে ভক্ত সন্তান-সমক্ষে বরাভয়-প্রদা পরা-শক্তিরূপে আবির্ভূতা হন। মুক্ত ও গুপ্ত বিভিন্ন-মুখী আর্য্যশাস্ত্রসমূহ সতত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। একটী তাহার বাহ্য, তাহাই মুক্ত বা ব্যক্ত এবং অন্যটী তাহার অন্তর, তাহাই সাধনা দ্বারা অনুভাব্য, তাহাই গুপ্ত। সেই কারণ শ্রীসদাশিব, শাস্ত্রের সেই বাহ্যরূপ বা ব্যক্ত শক্তিসমূহকে যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহাকেই "গণিকাইব" বলিয়াছেন, এবং তাহার গুপ্ত-অন্তবিদ্যা যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কেবল সাধনা সহযোগে অন্তরেই অনুভব হয়, সেই যোগ-শাস্ত্রকে "কুলবধূরিব" শাম্ভবীবিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত অধিকারী না হইলে, এই বিদ্যা কাহাকেও প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। করিলেও সকলের তাহা অনুভবে আসিবে না। যাহা হউক, এই সর্ব্বশাস্ত্রের সার সমগ্র যোগ-শাস্ত্র যে, পরমোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন :—

"আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রং পরংমতম্॥"

অতএব গুরুদেব শিষ্যের অবস্থা পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহার শ্রদ্ধা, আকাঙ্ক্ষা ও উপযুক্ততা উপলব্ধি করিলে, তবেই তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রাণ-স্বরূপ এই 'যোগশাস্ত্রের' উপদেশ প্রদান করিবেন; নতুবা যোগাধিকার প্রাপ্ত হইলেও যে কেহই সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণিত ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ যোগের সমাহার ব্যতীত প্রকৃত যোগী পদবাচ্য হইতে পারা যায় না। ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান-সাধনায় অর্থাৎ পূর্ণাভিষেক হইতে সাম্রাজ্যা-ভিষেক বা তাহার যথার্থ অধিকার লাভ পর্য্যন্ত, অথবা কালী, তারা ও ত্রিপুরাসাধনায় সিদ্ধিলাভ অবধি স্বতন্ত্রভাবে এই ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান-যোগের মন্ত্রাত্মক ক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছে; সাধক, মহাসাম্রাজ্য-সাধনায় তাহারই কথঞ্চিৎ সমাহারের লক্ষণ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছ, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বা তদীয় যোগের কথা, যাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মহাসাম্রা-জ্যাধিকার বর্ণিত প্রকৃতি পুরুষ বা দ্বৈতাদ্বৈত চিন্তার অনুষ্ঠানে সাধকের সেই ভাবস্রোতের আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। সাধক সেই স্বচ্ছ মণিসদৃশা প্রকৃতি-রূপিণী যোগমায়ায় সমাহারে পুরুষের বা পরমাত্মার নির্গুণ সত্তাও যে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, বর্ত্তমান অধিকারে ভূতপঞ্চক-বিমুক্ত জীবাত্মার সহিত সেইভাবে পরমাত্মার মিলন সাধন করিতে হইবে। মায়া ও প্রকৃতি-সম্ভূত এই বিশ্ব বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থই সময়ে

কারণভূত পরাপ্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে, কেবল একমাত্র অনির্ব্বচনীয় নিত্য অবিনাশী পরব্রহ্ম অর্থাৎ মূল আত্মা বা পরমাত্মাই পরাপ্রকৃতিযুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দময় হইবেন। তাই শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"আত্মানমাত্মনো যোগী পশ্যত্যাত্মনি নিশ্চিতম্।
সর্ব্ব সঙ্কল্প সন্ন্যাসীত্যক্ত মিথ্যা ভবগ্রহঃ॥
আত্মনাত্মনি চাত্মানং দৃষ্টানন্তং সুখাত্মকম্।
বিস্মৃত্য বিশ্বরমতে সমাধেস্তীব্রতস্তথা॥"

যিনি মিথ্যাভূত সংসার এবং সমস্তকল্প ও বাসনার সম্যক্‌-রূপে হ্রাস বা পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আপনাকে' অর্থাৎ 'জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনি নিশ্চয়ই আপনাতে আপনাকে দর্শন করিতে পারিবেন। কেবল সেইরূপ সাধক বা যোগী তীব্র সাধনাবলে বিশ্বসংসার বিস্মৃত হইয়া অনন্ত-সুখাত্মক আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আপনাতে-আপনি-রমণ করিতে থাকেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ হইয়া নিত্যানন্দ-সম্ভোগ করিতে পারেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া হইতেই এই মিথ্যাভূত চরাচর জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত সাধনকালে যখন সমস্তই বিশ্বজননী মায়ায় মিলাইয়া নিজেকে শূন্যময় চিন্তা করিতে পারিবে, তখনই সাধক মায়ামুক্ত জীবাত্মাকে নির্লেপ পরমাত্মার সহিত মিলনদ্বারা প্রকৃত যোগানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন। শ্রীগুরুদেবের মুখারবিন্দপ্রাপ্ত আদেশক্রমে তাহাই এই যোগাধি-কারে যথাসম্ভব আলোচিত হইবে।

'সাধনপ্রদীপ' ও জ্ঞানপ্রদীপাদি গ্রন্থের অনেক স্থলেই

পতঞ্জলি-নির্দ্দিষ্ট, যোগের প্রথম সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

অর্থাৎ চিত্তের স্বভাববিক্ষিপ্ত বৃত্তিসকলের নিরোধের নাম যোগ। সাধনার মূল ভাবাত্মক শৈশব-ক্রীড়া, সেই সাধারণ বাহ্য পূজা, অর্চ্চনা, কীর্ত্তন, ব্রত, ও উপবাসাদি নিত্য-নৈমিত্তিক গার্হস্থ্য বা প্রাথমিক তপশ্চরণ ও তাহার ফলস্বরূপ 'মহাভাব' সমাধি হইতে ক্রমে 'মহাবোধ', মহালয় ও ব্রহ্ম-সমাধি পর্য্যন্ত যত কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। বীজের অঙ্কুর হইতে সমগ্র বৃক্ষের পূর্ণপরিণতি পর্য্যন্ত যেমন তাহার বিকাশকাল, সাধনার পক্ষে ভগবদ্বিশ্বাস ও তদুপলক্ষে প্রাথমিক পূজা বা ভগবদ্‌গুণানুগানও ক্রমে অন্যান্য বিবিধ সাধন হইতে চিত্তনিবৃত্তির উপাদান কারণ সংগ্রহসহ বর্ত্তমান যোগদীক্ষাগ্রহণ ও তাহার যথারীতি সাধনা পর্য্যন্ত যোগপুষ্টি বা যোগপ্রক্রিয়ার বিকাশকাল বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে যিনি যে ভাবে বা যে মতাবলম্বী হইয়াই ভগবানের আরাধনা করুন না, সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য একাগ্রভাবে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ। বিশেষ, যাহারা মন্ত্রযোগ ক্রিয়া-সাধনার পথে পূর্ণাভিষেকাদি অধিকার গ্রহণ পূর্ব্বক রীতিমত সাধন ভজন করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের ত কথাই নাই। তাহারা সেইকাল হইতেই মন্ত্র, হঠ ও লয় যোগাঙ্গীভূত অনেক মুদ্রা ও ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে। "সাধনপ্রদীপ" বা প্রথমখণ্ড তন্ত্ররহস্যে, সে সকলের অনেক কথা বলা হইয়াছে। সাধনাকাঙ্ক্ষী পাঠকবর্গকে তাহা আর পুনঃ পুনঃ বলিবার আবশ্যক হইবে না। প্রয়োজন বোধ করিলে, সাধন-

প্রদীপ, জ্ঞানপ্রদীপ ও পূজাপ্রদীপাদিতে যাগবিষয়ক সেই সেই অংশ তাহারা পুনরায় মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়া অপেক্ষাকৃত জটিল ও ক্রিয়া-সিদ্ধবিষয় বা সাধনতত্ত্ব যাহা এক্ষণে বর্ণিত হইবে, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে যত্ন করিবে।

যোগশিক্ষার উপযোগী হইলেই, যে কোন সাধক গুরুর উপদেশ অনুসারে রীতিমত যোগাভ্যাস করিতে পারিবে, যোগসাধনায় কাহারও বয়স বা শারীরিক অবস্থাভেদে কোনও প্রতিবন্ধক হইবে না। যোগশাস্ত্রে আদেশ আছে :—

"যুবাবৃদ্ধোঽতি বৃদ্ধো বা ব্যাধিতো দুর্ব্বলোঽপিবা।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি সর্ব্বযোগে স্বতন্দ্রিতঃ॥"

অর্থাৎ যুবা, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত বা দুর্ব্বল যে কোন ব্যক্তি অনলস হইয়া যথাশক্তি যোগাভ্যাস করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগ প্রধান-ভাবে যাহার যেমন অবস্থা তাহার পক্ষে যোগের তেমনই সাধনোপদেশ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

"ক্রিয়াযুক্তস্যসিদ্ধিঃস্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ।
নশাস্ত্র পাঠমাত্রেণ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
নবেশধারণং সিদ্ধেঃ কারণং নচ তৎকথা।
ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতন্নসংশয়॥"

অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া কেবল গুরূপদিষ্ট ক্রিয়া করিলেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, কিন্তু ক্রিয়া হইতে বিরত হইলে, বা পুনঃ পুনঃ ফলের দিকে লক্ষ্য করিলে কখনই যোগসিদ্ধি সম্ভবপর হইবে না। সেই কারণ শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া কেবল কর্ম্ম বা যোগমূলক সাধনারই

উপদেশ দিয়াছিলেন। যোগীর বা সাধুর বেশ মাত্র ধারণ করিলে, অথবা সর্ব্বদা যোগের কথা, যোগের সূত্র ও উপদেশ সমূহ মুখে উচ্চারণ করিলে, কেহ কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ একমাত্র ভক্তিযুক্ত যোগ ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ, ইহা অতি সত্য কথা, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। যোগোপদেশে উক্ত হইয়াছে :—

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষ বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যাব্রহ্মণি সংযোগো যোগইত্যভিধীয়তে ॥"

আত্মপ্রযত্ন অর্থাৎ যম ও নিয়মাদি ক্রিয়া সাধনা সাপেক্ষ যে, সত্ত্বগুণপুষ্টা মনোবৃত্তি, তাহারই সহিত পরব্রহ্মের যে সংযোগ ভাব তাহাই যোগশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং যে সাধক এইরূপ বিশিষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত, তিনিই যথার্থ যোগী হইতে পারেন। কিন্তু সাধনায় অবহেলা বা আলস্য, তীব্র ব্যাধি, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে সংশয়, অবিশ্বাস, প্রমাদ, স্থানসংশয়, অনবস্থিত-চিত্ততা, অশ্রদ্ধা, ভক্তিহীনতা, ভ্রান্তিদর্শন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, ধূমপানাদি মাদকদ্রব্য ব্যবহার ও বিষয়-লোলুপতা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত দূষিত হয়, সেই কারণ তাহা যোগের অন্তরায় বলিয়া জানিবে।

যোগের ও সাধনাসিদ্ধির বিঘ্নকর বিষয় সম্বন্ধে, শাস্ত্রে আরও উক্ত আছে :—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্যোগ বিনশ্যতি ॥"

অধিক ভোজন, পরিশ্রমজনক কর্ম্ম; বহুবাক্য প্রয়োগ, নিয়মগ্রহ (অর্থাৎ প্রভাতে শীতলজলে অবগাহন, রাত্রিতে

অধিক আহারাদি কার্য্য, ফল ভোজন) বহুজনসঙ্গ ও চাপল্য এই ছয়টীও যোগ বিঘ্নকর।

যোগাভ্যাসকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও যথাসাধ্য বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য :—

"বহ্নিস্ত্রী পথিসেবানামাদৌ বর্জ্জনমাচরেৎ।"

অন্যত্র লিখিত আছে—

"বর্জ্জয়েদ্দুর্জ্জনপ্রান্তং বহ্নিস্ত্রীপথিসেবনম্।
প্রাতঃ স্নানোপবাসাদি কায়ক্লেশ বিধিং তথা॥"

অর্থাৎ এই সময় অগ্নিসেবা, স্ত্রীসঙ্গ ও পর্য্যটন বর্জ্জন করা উচিৎ। দুর্জ্জনের সহিত প্রণয়, বহ্নি-সেবা, স্ত্রীসংসর্গ, পর্য্যটন, প্রাতঃস্নান ও উপবাস, বা ফল ভোজন, যে কোনও বিশেষ কষ্টকর শারীরিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয়। সাধক যত্নসহকারে এই যোগান্তরায়গুলি হইতে দূরে অবস্থান করিবেন।

বরং ইহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত যোগসিদ্ধিমূলক নিয়মে যত্ন করিবে।

উৎসাহাৎ সাহসাদ্ধৈর্য্যাত্তত্ত্ব জ্ঞানাচ্চ নিশ্চয়াৎ।
জনসঙ্গ পরিত্যাগাৎ ষড়্ভির্যোগঃ প্রসিদ্ধতি॥"

অর্থাৎ উৎসাহ, সাহস, ধৈর্য্য, তত্ত্বজ্ঞান, নিশ্চয়তা বা শাস্ত্র অথবা গুরূপদেশে অচঞ্চল বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং জনসঙ্গত্যাগ, এই ছয়প্রকার নিয়ম হইতে সত্বর যোগসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গপূর্ণ যোগমধ্যে 'যম' ও 'নিয়ম' নিরন্তর অবলম্বন করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মপ্রবণতার উপযুক্ত করা যোগাধিকারীর একান্ত কর্ত্তব্য। প্রথমখণ্ডে যম ও নিয়মের যে দশ দশ বিধ শাস্ত্রীয় উপদেশ কথিত হইয়াছে, পাঠকের তাহা

অবশ্যই স্মরণ আছে, কিন্তু সাধারণ গৃহী যোগাকাঙ্ক্ষীদিগের পক্ষে তাহা যথাযথ পালন করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে ; অবশ্য যাঁহারা বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসপথাবলম্বী তাঁহারা অনায়াসেই সেই সকল বিধি পালন করিতে পারেন। সেই কারণ গৃহস্থ সাধক-দিগের পক্ষে "যোগোপদেশে" লিখিত আছে :—

"এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতা।"*

অর্থাৎ 'যম' ও 'নিয়মের' পাঁচ পাঁচটী করিয়া বিশেষ বিধান উক্ত হইয়াছে। ১। ব্রহ্মচর্য্য, ২। অহিংসা, ৩। সত্য, ৪। অস্তেয় ও ৫। অপরিগ্রহ, অর্থাৎ বাসনাসহকারে ইন্দ্রিয়পঞ্চকদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাত্মক ভোগ্যবস্তুসমূহ গ্রহণ না করা, কায়মনবাক্যে কাহারও প্রতিহিংসা না করা, সদা সত্যপথে চলা, অন্তরে সত্যপ্রতিষ্ঠা করা, অপহরণ ও অসৎ অভিপ্রায়ে অথবা অসৎ লোকের প্রদত্ত দান গ্রহণ না করাই যম বা সংযম সাধনার উপায় বলিয়া শাস্ত্রের আদেশ। এই সংযমের অভ্যাস বা নিষ্কামভাবে এই বিধি অবলম্বন করিয়া, ক্রমে চিত্ত ব্রহ্মপ্রবণতার উপযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মসম্বন্ধে নিত্য একই সময়ে ১। গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধনক্রিয়া, যে কোনও ভগবদ্ ২। পাঠ, ৩। শৌচ, ৪। সন্তোষ ও ৫। ভগবচ্চিন্তা এই পাঁচটী নিয়ম পালন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। মোট কথা, যোগাভ্যাস-কালে সাধক সাধ্যমতে সংযমী হইবে ও যথাসম্ভব আলস্যাদি পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তির গুণ ও বিভূতি চিন্তায় চিত্ত নিয়োজিত রাখিবে। ('পূজাপ্রদীপে'—৪র্থ উল্লাসে 'ব্রহ্মের গুণ ও

* 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'—(অষ্টাঙ্গ যোগ বিধির অন্তর্গত—'যম,' 'নিয়ম' ও শিবোক্ত—'যম,' 'নিয়ম') অংশ দেখ।

বিভূতি পূজা' দেখ।) দিবা রাত্রির মধ্যে স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থায় সকল বিষয় ও সকল বস্তুর মধ্যে সতত: সেই মহাপ্রকৃতির লীলা-রহস্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্থাবর, জঙ্গম, জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, সকলের মধ্যেই মহামায়ার যে অব্যক্তলীলা নিয়ত সংঘটিত হইতেছে, মনোযোগসহকারে তাহা উপভোগ করিতে হইবে। জীবের সুখ, দুঃখ, হাসি, ক্রন্দন, ভয়, ভ্রান্তি, ক্রোধ, শান্তি, দয়া ও ক্ষমাদি সকল ভাবের মধ্যেই যে, লীলাময়ীর অপূর্ব্ব লীলা নিত্য প্রকটিত হইতেছে, মনোযোগ-সহকারে তাহা পরিদর্শন করিতে হইবে। একবারমাত্র নহে—সতত: তদ্গত-ভাবে সেই সপ্তসতী চণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া তদ্পদে মনে মনে প্রণত হইতে হইবে। এই কথাগুলি, কথায় বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে, তবে নিতান্ত কঠিনও নহে, কেবল একাগ্রভাবে অভ্যাস-সাপেক্ষ; কারণ মানব-চিত্ত সতত: নানাভাবে উন্মত্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত—একভাবে চিত্ত প্রায় স্থির থাকে না। ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের অবিরোধপথে কত বিভিন্ন ভাব যে, চিত্তের সমীপবর্ত্তী হইতেছে, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যম বা সংযমের বলে যদি সেই সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যভাব নিষ্কামভাবে চিত্তের নিকট লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা চিত্তের সহসা বিকার কখনও সম্ভবপর হইবে না। মোট কথা, যম ও নিয়মরূপী দুইটী বল্গা চিত্তের মুখে আবদ্ধ করিতে হইবে, তাহা হইলেই চিত্ত সাধকের আয়ত্ত হইবে, নতুবা চিত্ত উদ্দাম অশ্বের ন্যায় যদৃচ্ছা গমন করিবে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণে পুনরায় বলিতেছি, চিত্তটীকে সর্ব্বক্ষণ যম ও নিয়ম-সহযোগে ঠিক একটী দিগ্‌নির্ণয়যন্ত্র বা "কম্পাসের"

কাঁটার ন্যায় প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। "কম্পাসের" কাঁটা যেমন সামান্য আন্দোলন মাত্রেই নড়িয়া যায়, এদিক ওদিক ঘুরিতে থাকে, কিন্তু একটু স্থির হইলেই তাহার নিজ-ধর্ম্মে অমনি উত্তরমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, সাধক সাংসারিক-আবর্ত্তে চিত্ত-বিক্ষেপক উপাদান-সংঘর্ষে যখনই বিচলিত হইবে, তখনই তাঁহার মনোময় কাঁটাকে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে স্থির করিবার জন্য সেই চিত্ত-বিক্ষেপক উপাদান্-বস্তু বা তাহার ক্রিয়ার মধ্যে মহামায়ার লীলা-বৈচিত্র্য চিন্তা করিবে। সেই ভাব-প্রবণ উপাদান যেমনই হউক না কেন, সৎ, অসৎ, যাহাই হউক না কেন, তাহার গুণাগুণ বা ক্রিয়ার মধ্যেও যে, মহামায়ার ক্রীড়া স্পষ্টীভূত রহিয়াছে, তাহারই ভাবনা করিবে, তাহারই মধ্যে প্রত্যক্ষ ভগবচ্ছক্তি অনুধাবন করিবে, মনকে ব্রহ্মপ্রবণতার ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে। চিত্ত তাহাতেও সংযত না হইলে, করুণভাবে মহাপ্রকৃতির নিকট তখনই চিত্তের সদেচ্ছা প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলে, চিত্ত আর বিচলিত হইবে না। ক্রমে এইরূপ প্রকৃতিসাধনাসহযোগের চিত্ত সহজে বশীভূত ও ব্রহ্ম-প্রবণতা লাভ করিবে। সাধকের এই বিচিত্র সাধনা, যোগদীক্ষা-ভিষেকের শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। এইভাবে বহির্মুখী চিত্তকে ক্রমে অন্তর্মুখী করিয়া আনিতে পারিলে, তবে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা সহজসাধ্য হইবে, তবেই চিত্ত একাগ্র হইয়া জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনসাধনে সমর্থ হইবে; নতুবা কেবল নাক টিপিয়া বা দম-আটকাইয়া বসিয়া থাকিলেই যোগ হইবে না, অপিচ চিত্ত কখন ঘরে, কখন বাহিরে, কখন মধুভাণ্ডে, কখনও বা অন্যত্র অবাধে বিচরণ করিবে।

সুতরাং সাধক, ব্রহ্মশক্তি জগন্মাতার এই গুণ ও বিভূতি সাধনায় কখনই অবহেলা করিবে না। পুনরায় বলি—"পূজা-প্রদীপে"—'ব্রহ্মের গুণওবিভূতি পূজা' ভাল করিয়া বুঝিতে যত্ন কর। এ সকল কেবল পুঁথীগত বিদ্যা নহে,—সাধনার ক্রিয়া-সিদ্ধ-তত্ত্ব, ব্রহ্মমণ্ডলীর সিদ্ধ ও গুপ্ত উপদেশ। "ও সব জানা কথা" বলিয়া উড়াইয়া দিবে না, উহাই এখন কায়মনে সাধককে প্রতিপালন করিতে হইবে। "মাতৃবৎ পরদারেষু" ইহাও শুধু কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই 'ঠাকুর' বলিতেন প্রত্যেক রমণীমূর্ত্তি দেখিয়াই কি তোমার গর্ভধারিণী জননীকে স্মরণ পড়ে? যদি তাহা হয়, তবে নিশ্চয়ই তুমি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছ বলিতে হইবে, তোমার চিত্ত ব্রহ্মপ্রবণতার দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, এখন যোগসমাধি তোমার সহজ-লভ্য হইবে; আর যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা, সে মূর্ত্তি স্বরূপা, কুরূপা বা যেমনই হউক, সে হিন্দু, যবন বা অতি হীনবর্ণসম্ভূতা অথবা সতী কিম্বা সমাজের চিরঘৃণ্য কুলটা হউক—তাহাকে বিশ্বপ্রসবিনী জগজ্জননী মাহামায়ারই এক বিভূতি, মায়া বা রূপ বলিয়া চিন্তা করিবে ও মাতৃজ্ঞানে মনে মনে তাহাকে প্রণাম করিবে। মাতৃ-সাধনায় কেবল ভোগ্যা কামিনী অনেক সময় পরিত্যজ্যা হইলেও, সকল কামিনীই সর্ব্বদা মাতৃবৎ পূজ্যা, বিশ্বপ্রকৃতির এই 'বিভূতি' এবং পূর্ব্ববর্ণিত তাহার 'গুণের' উপাসনা সততই মনোমধ্যে জাগরুক রাখিয়া সংসারের যে কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলে, দেখিবে, অচিরকাল মধ্যে চিত্তের সেই বহির্ম্মুখী ভাব ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্ম্মুখী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত যম-নিয়ম ও এই 'গুণ-বিভূতি'

সাধনায় চিত্ত যত সহজে ব্রহ্ম-প্রবণ হইয়া যোগাঙ্গের পরবর্ত্তী অন্যান্য ক্রিয়া সকলের সহায়তা করে, তেমনটী আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং গৃহী, সাধু বা সন্ন্যাসী সকলেরই এই সকল নিয়ম অতি মনোযোগসহকারে পালন করা কর্ত্তব্য।"

আসনের কথা 'সাধনপ্রদীপ' ও 'জ্ঞানপ্রদীপের' মধ্যেও বলা হইয়াছে, পূর্ণাভিষেকের সময় হইতেই সাধক সেইরূপ যে কোন আসনের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছে, এখনও সেই সকল আসন বিশেষ উপযোগী হইবে, তবে যোগ সম্বন্ধে আরও উচ্চ অধিকার পাইবার অনুকূল দুই একটী আসনের কথা বলিবার আছে। তাহা যথাসময়েই উক্ত হইবে, কারণ সে সকল বিধি বিভিন্ন মুদ্রারূপে সাধকের অন্তর-ক্রিয়ার সহিত অনেকটা সংজড়িত এবং যোগানুষ্ঠানের সহায়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া-সহযোগে রচিত।

যোগমার্গ যে, চারিভাগে বিভক্ত, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ, যোগের এই চতুর্ব্বিধ প্রক্রিয়া। "জ্ঞানপ্রদীপের" ১ম ভাগে মন্ত্রযোগাদি চতুর্ব্বিধ যোগের বিভিন্ন স্বরূপ বা অঙ্গ ও বিস্তৃত রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। সাধক তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে। এ স্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে, জীবের অন্তঃকরণ সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত। তাহা যথাক্রমে 'মন' 'বুদ্ধি', 'চিত্ত' ও 'অহঙ্কার' নামে কথিত। জীব বা সাধকমাত্রেই অন্তঃকরণের এই চারি অঙ্গের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ আত্মোন্নতি দ্বারা চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধ বা লয় বিধান পূর্ব্বক পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই অন্তঃকরণ আবার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের সহিত এমন নিগূঢ়

সম্বন্ধযুক্ত যে, যোগপুষ্ট দৃষ্টি ব্যতীত তাহা সহজে বোধগম্য হয় না, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি চিন্তাদ্বারাও তাহার কথঞ্চিৎ আভাস অনুভব করিতে পারে। সাধারণ জীব সর্ব্বক্ষণই স্থূলদেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন, স্থূলদেহ ব্যতীত সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহও যে, তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে, তাহা তাহারা ভাবিতে পাবে না বা সে জ্ঞান তাহাদের নাই। কিন্তু যোগাভিলাষী ব্যক্তির সে জ্ঞান থাকা আবশ্যক বা গুরুকৃপায় তাহার জ্ঞানানুশীলনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে মন্ত্রাদি যোগতত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

যাহা হউক মন্ত্রযোগ যে প্রধানতঃ জীবের মন লইয়াই সাধনার বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা দ্বারা মন ত্রাণ বা লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই 'মন্ত্র'। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"মন্ত্রজপান্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ।"

অর্থাৎ মন্ত্রজপ করিতে করিতে যে বিধানের দ্বারা মন সেই মন্ত্রাত্মক দেবতায় বা নামরূপময় ভগবানে লয় হইয়া যায়, তাহাই 'মন্ত্রযোগ'। নানারূপাত্মক লৌকিক বিষয়েই জীবকে বন্ধনযুক্ত করে বা অবিদ্যাপ্রধান নামরূপাত্মক প্রকৃতি-বৈভব বশতঃ জীব সতত অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া থাকে; সুতরাং সাধক নিজ নিজ সূক্ষ্মপ্রকৃতি বা প্রবৃত্তির গতি অনুসারে অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত সেই নামময় শব্দ বা মন্ত্র এবং ভাবময় রূপ অবলম্বন করিয়া যে যোগক্রিয়ায় অবিদ্যাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহাই যোগচতুষ্টয়ের মূলরূপ 'মন্ত্রযোগ'। এই যোগ কেবলই ভাবময়। সেই ভাবযোগেই অভীষ্টদেবতার নাম বা মন্ত্র ও তাহার অলৌকিক 'বিশ্বা'ত্মক স্থূলরূপের ধ্যানদ্বারা যে সমুদয়

সাধন করিতে হয়, তাহাতেই সাধকের মনোবৃত্তি লয় হয়, তাহাই 'মন্ত্রযোগ'।

এইরূপ উচ্চ অধিকারের সাধক নিজ স্থূল দেহের উপর মুদ্রাদির হঠক্রিয়া বা বলপ্রয়োগপূর্ব্বক সূক্ষ্ম বা 'তৈজস' দেহের বোধ সহ অভীষ্ট দেবতার সূক্ষ্মতেজাত্মক বা জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপের ধ্যানদ্বারা যে সমুদয় ক্রিয়া সাধন করিতে থাকে, তাহাতেই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি লয় হয়, তাহাই হঠযোগ।

এই ভাবে উচ্চতর সাধক নিজ সূক্ষ্ম দেহের অন্তর্গত অভীষ্ট দেবতাত্মক 'তেজোচৈতন্যময়' সত্তার কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দুর সূক্ষ্মতর স্বরূপের ধ্যান দ্বারা যে সকল লয়াদি ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাতেই তাহার চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা কারণদেহে তাহা লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই 'লয়যোগ'।

অনন্তর উচ্চতম সাধক নিজ কারণ দেহের অভিমানী আত্মা 'প্রাজ্ঞ'রূপের সূক্ষ্মতম স্বরূপ প্রকৃত অহঙ্কার বা যাহা অবিদ্যা-সলিলে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বিত অহংভাবরূপ 'অস্মিতাত্মক' অভিমান-যুক্ত জ্ঞান, পরমাত্মায় বা 'তৎ' বস্তুতে সম্পূর্ণ মিলাইয়া দিবার উদ্দেশে যে সকল অন্তিম ক্রিয়া বিধান করিয়া থাকেন তাহাই রাজযোগ।

"ষড়াম্নায়-তন্ত্রে" শ্রীসদাশিব পঞ্চানন বলিয়াছেন,—"আমার পঞ্চ-আনন বা পাঁচমুখের প্রত্যেকটী হইতে দুই দুইটী করিয়া যোগ কথিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—মন্ত্র, হঠ, ভক্তি, লয়, লক্ষ্য, ক্রিয়া, উর বা রাজ, জ্ঞান, বাসনা ও পরা, এই দশপ্রকার যোগ"। এ সকলের পরস্পরের মধ্যেই কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে, তবে

এই দশেরই স্থূল ও মূল বিভাগ পূর্ব্ববর্ণিত সেই চারিটী। সাধকের অবস্থা, শরীরের উপাদান ও গঠনভেদে তাহা অবলম্বন করিতে হয়। উপযুক্ত যোগী-গুরুর কৃপায় তাহা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীসদাশিব অন্যত্র বলিয়াছেন:—"যোগ যেমন চতুর্ব্বিধ, যোগী সাধকও অবস্থাভেদে সেইরূপ চারি প্রকার; 'মৃদু সাধক', 'মধ্য সাধক', 'অধিমাত্র সাধক' ও 'অধিমাত্রতম সাধক'।" ইঁহাদের লক্ষণালক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—"যিনি মন্দোৎসাহী, অর্থাৎ যিনি অল্প বা সামান্যমাত্র উৎসাহশীল সুসংমূঢ়; অর্থাৎ উচ্চ-প্রতিভাবিহীন, কোনরূপ অসুস্থ বা শারীরিক পীড়াগ্রস্ত, গুরুদূষক, লোভী, পাপাসক্ত, বহুভোজনশীল, স্ত্রীজিত, চপল, পরিশ্রম-কাতর, রুগ্ন, পরাধীন, নিষ্ঠুর, মন্দাচার ও মন্দবীর্য্য, তাহাদিগকে মৃদুসাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। সাধারণ গৃহী ও সাধুর মধ্যেই এই সকলের কোন না কোনও লক্ষণ সংক্রামক দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং সাধারণভাবে অধিকাংশই 'মৃদুসাধক' বলিতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তি ইচ্ছা ও নিয়মিত পরিশ্রম করিলে দ্বাদশবৎসরে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। গুরুপদাভিষিক্ত যোগীর জানিয়া রাখা আবশ্যক, এই মৃদুলক্ষণবিশিষ্ট সাধক, মন্ত্র-যোগের নিম্ন অঙ্গেরই অধিকারী। সুতরাং সাধনার প্রথম অবস্থায় শিষ্যকে কেবল সেইরূপ কোন মন্ত্রযোগই প্রদান করা বিধেয়। এক্ষণে বলা বাহুল্য, শিবোক্ত শাক্তাভিষেক হইতে সাম্রাজ্যাভিষেক-দীক্ষা পর্য্যন্ত ক্রমোন্নত কেবল মন্ত্রযোগেরই ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কাল পর্য্যন্ত সাধক বাতিমত স্থূল ধ্যানমূলক পূজা, অর্চ্চনা, জপ ও হোমাদি

দ্বারা ক্রমোচ্চ মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিবে। গুরুদেবের নিকট প্রত্যেক 'মন্ত্রের রহস্য' ও তাহা 'জপ করিবার বিধি' বা 'জপ-রহস্য' * সমস্ত অবগত হইয়া মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিলে, কালে সাধকের সিদ্ধি বা উন্নত যোগাধিকার জন্মিবে।"

মধ্যসাধক সম্বন্ধে শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এইরূপ:—"যিনি সমবুদ্ধি বা পরিমিত-বুদ্ধি অর্থা যিনি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী নহেন, অথচ নিতান্ত অল্প বুদ্ধিমানও নহেন, যিনি স্বাভাবিক ক্ষমাশীল, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়দর্শী, প্রিয়বাদী, কোন কার্য্যেই বিশেষভাবে লিপ্ত নহেন, তাঁহাকেই 'মধ্যসাধক' বলা হইয়া থাকে। ঈদৃশ সাধকবৃন্দকে মন্ত্র সাধনার পর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া 'মন্ত্র ও আংশিক লয় যোগ-যুক্ত হঠযোগের' অধিকার প্রদান করিবেন, অর্থাৎ আবশ্যক হইলে মন্ত্রযোগের সঙ্গে সঙ্গেই লযযোগের প্রাথমিক বা কোন কোন মুদ্রাদি ও হঠযোগ সাধনার অভ্যাস করাইবেন, এবং উপযুক্তবোধে উত্তরোত্তর হঠপ্রধান লয়যোগের উচ্চতম অনুষ্ঠান প্রদান করিবেন।"

অনন্তর অধিমাত্র-সাধকের লক্ষণ বর্ণনায় শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—"যিনি স্থিরবুদ্ধি, মহাশয়, দয়াশীল, ক্ষমাবান, সত্যনিষ্ঠ, শৌর্য্যশালী, লয়যোগ শ্রদ্ধাযুক্ত, গুরুপাদপদ্ম-পূজা-পরায়ণ ও সতত যোগাভ্যাসনিরত, এইরূপ ব্যক্তিকেই অধিমাত্র সাধক বলা হইয়া থাকে। ছয়বৎসর কঠোর ও রীতিমত পরিশ্রম করিলে এরূপ ব্যক্তি যে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ক্রিয়াবান বিচক্ষণ গুরু এইরূপ ব্যক্তিকে সাঙ্গোপাঙ্গ

* 'পুরশ্চরণপ্রদীপ' ও 'পূজাপ্রদীপাদি' গ্রন্থ দেখ।

হঠযোগ সহ উন্নত লয়যোগ প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু হঠযোগ সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপ যেরূপ কঠিন, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ের অনেক ব্যক্তিই তাহা সাধন করিতে অসমর্থ হইবে বলিয়া বোধ হয়। যথেষ্ট কঠোর পরিশ্রমী, তপঃপরায়ণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত ইহার সাধনা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশেষ বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহারা ব্রহ্মচারী, সাধু বা সন্ন্যাসাশ্রমী, জিতেন্দ্রিয় ও যোগনিরত, তাঁহারাই হঠযোগের সম্পূর্ণ অধিকারী বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহাদের স্থূল শরীর বশীভূত করিয়া সূক্ষ্ম শরীরেরই সাধনোন্নতি করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত গুরু শিষ্যের অবস্থা ও সাধন-সামর্থ্য বুঝিয়া অন্যান্য যোগক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠযোগের কোন কোন বিশেষ ক্রিয়া যাহা অন্য যোগত্রয়ের বিশেষ লয়যোগের সহায়ক ও সম্পর্কযুক্ত তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন।*

অতঃপর 'অধিমাত্রতম' সাধকের লক্ষণ-বর্ণনায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"যিনি মহাবীর্য্য, মহোৎসাহসম্পন্ন, মনোজ্ঞ, শৌর্য্যশালী, শাস্ত্রবিদ্, অভ্যাসশীল, মোহশূন্য, নিরাকুল, নব-যৌবনসম্পন্ন, মিতাহারী, বিজিতেন্দ্রিয়, নির্ভীক, বিশুদ্ধাচার, সুদক্ষ, দাতা, সকলের প্রতি অনুকূল, সর্ব্ববিষয়ে অধিকারী, স্থিরচিত্ত, ধীমান, যথেচ্ছ স্থানাবস্থিত, ক্ষমাগুণসম্পন্ন, সুশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ, গুপ্তচেষ্ট, প্রিয়ম্বদ, শান্ত, বিশ্বাস-সম্পন্ন, দেব-গুরু-পূজাপরায়ণ, জনসঙ্গ-বিরক্ত, মহাব্যাধি পরিশূন্য, অধিমাত্র অর্থাৎ সকল বিষয়েই সকলের অগ্রণী এবং ব্রতজ্ঞ, এইরূপ ব্যক্তিই

* "জ্ঞানপ্রদীপ" ১ম ভাগে "হঠ ও লয় যোগ" দেখ।

অধিমাত্রতম সাধক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। এরূপ সাধক যে, সর্ব্বযোগ সাধনেই সমর্থ বা ক্রমোন্নত যোগসাধনাপথে উচ্চতম সকল যোগেরই অধিকারী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে অনেকস্থলে উক্ত হইয়াছে, সাধক জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় মুক্তিলাভ করিতে পারে। প্রথম মন্ত্রযোগ, পরে হঠ-যোগ, ক্রমে লয়যোগ ও অন্তে রাজযোগের অধিকারী হইয়া সকল সাধকই একদিন জীবন্মুক্ত ভাবে ব্রহ্মসন্দর্শন লাভদ্বারা কৃত-কৃতার্থ হইতে পারেন। কোন যোগ-সাধনায় আশুই ফল লাভ হইল না বলিয়া ব্যতিব্যস্ত, যোগানুষ্ঠানে সন্দেহ বা তাহাতে আংশিক বা একেবারে বীতশ্রদ্ধ হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। ধীর শান্তভাবে কেবল গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধনার কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সাধনা যেমন বা যতটুকুই হউক না কেন, তাহার ফল অবশ্যই আছে, সাধকের এ ধারণা যেন চিরদিন বদ্ধমূল থাকে, নতুবা সিদ্ধির-পক্ষে অন্তরায় হইবে।

যোগের অন্তরায় বা চতুর্ব্বিধ বিঘ্নকর-বিষয়সমূহও যোগীর পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখা আবশ্যক। 'সাধনপ্রদীপ' ও 'পুরশ্চরণ-প্রদীপে' সাধনানুকূল আহার্য্যাদি বর্ণনা এবং ইতঃপূর্ব্বেও বহুবিষয় উক্ত হইয়াছে। মোক্ষকামার্থী সাধক তাহা পুনরায় মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবেন। তদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী শিবোক্ত বিষয় পাঠকগণের অবগতির জন্য এ স্থলেও উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীঈশ্বর বলিতেছেন :—

"হে দেবি! মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে সাধকের যে চতুর্ব্বিধ বিঘ্ন

সচরাচর উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,—

(১) ভোগবিঘ্ন :—এই বিঘ্নগুলির মধ্যে বিষয় সম্ভোগই মুক্তিপথের প্রধান কণ্টকস্বরূপ জানিবে, বিশেষতঃ নারীসম্ভোগ, উত্তম শয্যা, মনোরম আসন, রমনীয় বস্ত্র ও ধন সঞ্চয়, এইগুলি মুক্তিপথের বিড়ম্বনাস্বরূপ। তাম্বুল, যে কোন মাদক দ্রব্য, ভোক্ষ্যভোজ্যাদি, যান, বাহন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, স্থবর্ণ ও রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতু, রত্ন ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ, নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণ; পাণ্ডিত্য এবং বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান; স্ত্রী, পুত্র আত্মীয় প্রভৃতি পূর্ণ সংসার ও আসক্ত-ভাবে লৌকিক বিষয়কার্য্য পরিদর্শন, এই সকলও মুক্তিপথের বিঘ্নকর। স্থতরাং সাধ্যমতে এই সকল ভোগ্য বস্তু হইতে সদাই নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে। কারণ এই সমস্তই সাধকের প্রথম 'ভোগরূপ বিঘ্ন'। অতঃপর ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর।

(২) ধর্ম্মবিঘ্ন :—প্রাতঃস্নান প্রভৃতি বেদবিহিত স্নান, স্থূলপূজাব্রতাদি অনুষ্ঠানাধিক্য, নিয়ত অতিথিসেবা প্রবৃত্তি, হোম, যজ্ঞ, সকাম ব্রত, উপবাস, নিয়ম-ধারণ, মৌন, সতত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-কর ক্রিয়াদি, ধ্যেয়তা, সর্ব্বাবস্থায় স্থূলধ্যান, সতত-সকাম মন্ত্রজপাদি, দান, সর্ব্বত্রখ্যাতির ইচ্ছা, বাপী, কূপ, তড়াগ, সরোবর, প্রাসাদ, উদ্যান, কেলিমণ্ডপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ বা তাহার নির্ম্মাণ-কল্পনা, তীর্থপর্য্যটন ও বিষয়-পর্য্যবেক্ষণ. এই সমস্ত ধর্ম্মবিঘ্নরূপে বিরাজমান হইলেও অর্থাৎ ধর্ম্ম বা পুণ্য-সঞ্চয়ের অভিলাষে এই সকল বিষয়ে বাহুল্য বা বাড়াবাড়ি করা, মোক্ষকামার্থীর পক্ষে দ্বিতীয় 'ধর্ম্মবিঘ্নকর' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(৩) জ্ঞানবিঘ্ন :—হে বরাণনে, মুক্তি বিষয়ে যে সকল জ্ঞানরূপ বিঘ্ন সঞ্চারিত হয়, তাহাও শ্রবণ কর। গোমুখাসন বা অন্য যে কোন আসন করিয়া, ধৌতীযোগ দ্বারা সতত নাড়ী প্রক্ষালনে প্রবৃত্ত হওয়া, নাড়ী-সঞ্চার-বিজ্ঞান অর্থাৎ দেহের মধ্যে কোথায় কোন নাড়ী আছে, কেবল তাহারই অনুসন্ধান, প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিরোধ ও লৌহশৃঙ্খল দ্বারা উপস্থবন্ধন বা লৌহকণ্টকাদি দ্বারা চক্ষু ও উপস্থ বিদ্ধ করা, বিনা প্রয়োজনে বায়ু চালনার উদ্দেশে কুক্ষি-সঞ্চালন উপস্থাদি দ্বারা দুগ্ধপান ও নাড়ীকর্ম্ম অর্থাৎ বায়ু দ্বারা সততই নাড়ী প্রক্ষালন এবং ধর্ম্ম বা শাস্ত্রের খুটীনাটী বিষয় লইয়া সর্ব্বদা বৃথা আলোচনা, আত্মপ্রাধান্য বৃদ্ধি বা রক্ষার জন্য কেবল তর্ক-বিতণ্ডা এই সকল তৃতীয় 'জ্ঞানরূপ-বিঘ্ন'। এক্ষণে ভোজন-রূপ বিঘ্নের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

(৪) ভোজনবিঘ্ন :—যাহাতে শরীরে অবিরত নূতন নূতন রসের সঞ্চার হয়, এরূপ বস্তু ভোজন করা বিধেয় নহে, অর্থাৎ রসবৃদ্ধিকর যে কোনও আহার্য্য বস্তু সাধনার চতুর্থ বিঘ্নস্বরূপ; কারণ তদ্দ্বারা জিহ্বামূলে স্ফীতি ও বেদনা অনুভূত হয়, সুতরাং তাহাতে যোগ-সাধনায় ব্যাঘাত হইতে পারে।

সাধনাভিলাষী পাঠক, যোগবিঘ্নকর এই সকল বিষয়ে সতত চিন্তা করিয়া সংসারমধ্যে যথাসম্ভব নির্লিপ্তভাবে আপনার গুরূপদিষ্ট কার্য্য করিয়া যাইবে। সর্ব্বদা দুর্জ্জনসঙ্গ বিবর্জ্জিত হইয়া সাধুসঙ্গে অবস্থান করিবে। যিনি পিণ্ডস্থ বা দেহস্থ হইয়া সকল রূপের আধার বা সকল রূপেই যিনি অবস্থান করিতেছেন, অথচ যিনি আবার রূপ-বিবর্জ্জিত, তিনিই ব্রহ্ম;

সেই পরম লক্ষ্য বস্তুতে চিত্ত স্থির করিয়া অর্থাৎ সেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনসম্ভূত, যোগ সাধনাই সাধকের একমাত্র প্রীতিকর, এতদ্ব্যতীত সংসারের অন্য যাহা কিছু পরিলক্ষিত হয়, সমস্তই মায়া-বিলসিতমাত্র বুঝিতে হইবে। এই কারণ শরীর, ধন, ঐশ্বর্য্য ও তাহার ভোগ অথবা লৌকিক সুখাত্মক বস্তুসমূহ যোগীর আদৌ প্রীতিকর হইতে পারে না। শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন:—এই জগৎপ্রপঞ্চ, অরি, মিত্র ও উদাসীন এই ত্রিবিধ ভাবাপন্ন। ব্যবহার দ্বারা সকল বস্তুতেই এই ত্রিবিধভাব উৎপন্ন হইতে পারে। যে বস্তুটী সুখদায়ক, তাহাই প্রিয়; এবং যেটী সুখদায়ক নহে, সেইটী নিশ্চিতই অপ্রিয় বা 'অরি' অর্থাৎ শত্রু বলিতে হইবে; আর যে বস্তুটী সুখদায়ক নহে, অথবা দুঃখদায়কও নহে, তাহাই উদাসীনভাব বিশিষ্ট। প্রত্যেক বস্তুই একের পক্ষে মিত্র বা সুখদায়ক, অন্যের পক্ষে অরি বা দুঃখদায়ক, আবার কাহারও পক্ষে অরি-মিত্র কিছুই নহে, অতএব উদাসীন হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে— যেমন এক বিজয়ী রাজা নিজ সৈন্যের পক্ষে সুখদায়ক, শত্রু সৈন্যের পক্ষে দুঃখদায়ক ও ভিন্নদেশীয় জনের পক্ষে উদাসীন, এই ত্রিবিধভাব ধারণ করে। অথবা যেমন এক পরমাসুন্দরী রমণী তাহার পতির পক্ষে সুখদায়িকা, কিন্তু স্বপত্নীর পক্ষে দুঃখদায়িকা এবং অন্যান্য নারীর পক্ষে উদাসীনা। এইরূপ জগতের সকল বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে সুখ, দুঃখ অথবা উদাসীনভাব অবলম্বন করিয়া থাকে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই (মিত্র) প্রিয়, (অরি) অপ্রিয় ও উদাসীন ত্রিবিধভাব সকল বস্তুতেই নিয়ত অবস্থান করিতেছে। এমন কি আত্মস্বরূপ

পুত্রও উপাধিভেদে উক্ত ত্রিবিধভাব ধারণ করিয়া থাকে, কখনই ইহার অন্যথা দেখা যায় না। "মায়াবিলসিতং বিশ্বং" এই শ্রুতি-যুক্তি অনুসারে আধ্যারোপ (অর্থাৎ সৎবস্তু বা ব্রহ্মের উপর অসৎবস্তু বা এই জগৎকে আরোপ করা) এবং অপবাদ (অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুতে অবস্তুরূপ অজ্ঞান ভ্রম নাশ হওয়া) দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা বা মায়াকল্পিত জানিয়া পরমাত্মাতে আপনাকে অর্থাৎ জীবাত্মার লয়-করণই যোগী-সাধকের প্রধান কার্য্য। তাহাতেই যোগীর চিদানন্দরূপ 'অপরোক্ষানুভূতি' হইতে থাকে। সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত অরি বা অপ্রিয়, মিত্র বা প্রিয়, এবং উদাসীন—প্রিয়াপ্রিয়বর্জ্জিত ভাবাত্মক যোগ-বিঘ্নকর সকল বস্তুই, যোগী-সাধকের নিকট যাহাতে উদাসীনভাবে প্রতীত হয়, তাহারই অভ্যাস করিতে হইবে, অর্থাৎ সকল কর্ম্মই যাহা সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে, তাহা এমনই নির্লিপ্ত বা উদাসীনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে তজ্জনিত কোনরূপ সুখ বা দুঃখের ছায়া যোগীর চিত্তে স্পর্শ করিতে না পারে। ইহাই আসক্তি-বিরক্তি বর্জ্জিত প্রকৃত বৈরাগ্য, ইহারই যথাক্রম অভ্যাসদ্বারা চিত্ত পুষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত যোগ-বিঘ্নকর কোন বস্তুদ্বারাই যোগীর হৃদয়ে আর সুখ দুঃখের অনুভূতি হইবে না। ভগবান অর্জ্জুনকেও দৃঢ়ভাবে এই উপদেশই দিয়াছিলেন। তবে সাধনার সময় সেই সকল বিঘ্নকর বিষয় হইতে সাধ্যানুসারে যথাসম্ভব দূরে আসিতে পারিলেই যোগীর যোগসিদ্ধি পক্ষে কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না। সেই কারণ ভগবান শ্রীগুরুমুখে পুনঃ পুনঃ সাধকের মঙ্গলার্থে এই সকল তত্ত্ববাণীর উপদেশ দিয়াছেন। যাহাহউক সাধনকালে

প্রত্যেকেই এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ সাবধান ও মনোযোগী হইবে। এমন কি সাধন ভজনের বিশেষ কোনও ক্রিয়ার প্রতিও সাধক ক্রমাগত সম্পূর্ণ অনুরক্ত হইবে না। সাধক-মাত্রেরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্যে 'ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ', সুতরাং ক্রিয়াগুলি তাহার অবলম্বনস্বরূপ বা গৌণউদ্দেশ্যসাধকমাত্র, এইহেতু যথাসাধ্য অনাসক্ত ভাবেই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। যাহাতে সেই ক্রিয়া-লব্ধ জ্ঞানের প্রতি সাধকের কেবল লক্ষ্য থাকে, তাহাই করিতে হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পূর্ণাভিষেক হইতেই মন্ত্রযোগের ক্রিয়া আরব্ধ হয়; সুতরাং 'মন্ত্রযোগ' যোগচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম বা নিম্নস্তর নির্দ্দিষ্ট। ভগবান দত্তাত্রেয়দেব বলিয়াছেন :—

"মন্ত্রযোগশ্চ যঃপ্রোক্তো যোগানামধমঃস্মৃতঃ।
অল্পবুদ্ধিরয়ং যোগঃ সেবতে সাধকাধমঃ॥"

এস্থলেও মন্ত্রযোগ অধম বলিয়া কথিত এবং মন্ত্রযোগ-পরায়ণ সাধক অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট ও অধম সাধক বলিয়া উচ্চতর সাধক-গণের নিকট পরিচিত হয়েন। এই কারণ অনেকে মন্ত্রযোগের প্রতি সহসা শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়েন। সকলেই নিজেকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলিয়াই মনে করেন। নিজে নিজে কেহই যে অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট বা নির্ব্বোধ নহেন; তাহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ কথা; কিন্তু তাহা বলিয়া গুরুসন্নিধানে বা উচ্চ সাধকমণ্ডলীর সম্মুখে (তুমি যতই কেন নানাশাস্ত্রজ্ঞ বা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হও না) সাধনবিহনে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবোধরূপ বুদ্ধির বিকাশ যতক্ষণ আদৌ না হইবে, ততক্ষণ তুমি নিশ্চয়ই অল্পবুদ্ধি বা নির্ব্বোধ্ ব্যতীত আর কি বলিব! সে দিনও ত অনেকে প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন যে, নিরক্ষর সাধকপ্রবর পরমহংসদেবের সম্মুখে কত দেশমান্য বড় বড় পণ্ডিত অবনতমস্তকে তাঁহার মুখে তাঁহার অনুভবসিদ্ধ দুইটী ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইতেন! সেস্থলে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, দত্তাত্রেয়দেব-কথিত 'অল্পবুদ্ধি' এই শব্দ পাণ্ডিত্যের অভাব অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানাভাব-জনিত অল্প-বুদ্ধি, সুতরাং প্রথম অবস্থায় সাধক মাত্রেই এই শব্দ সহজ-প্রযুজ্য, এবং সেই কারণ 'মন্ত্রযোগ' প্রত্যেক যোগাভিলাষীর পক্ষে সাধনার প্রথম স্তর। তাই ভক্তের মনস্কাম পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীভগবান পূর্ণাভিষেকের সময় হইতেই মন্ত্রযোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় সাধক তথা হইতে যথাক্রমে সাম্রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত নামরূপাত্মক অপূর্ব্বভাবময় সেই মন্ত্রযোগেরই অভ্যাস করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও ধ্যান ও লয়যোগের ক্রিয়া এমনভাবে বিজড়িত আছে, যাহার অভ্যাসফলে পূর্ব্বোক্ত যোগাবলীর অনেক কার্য্য আপনাপনি সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ যোগাভিষেকের পর লয়যোগের অনেক কার্য্যই আর নূতন করিয়া সাধনের প্রয়োজন হয় না। সাধকগণের সুবিধা এবং অবগতির জন্য গুরুমণ্ডলীর আদেশে ক্রমে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। আধুনিক কৌলিক-গুরুসম্প্রদায় অর্থাৎ যাঁহারা কোন সিদ্ধ গুরুবংশসম্ভূত এবং বংশপরম্পরায় কেবল শিষ্যকরণ ও 'দীক্ষা-প্রদানই' যাহাদের একমাত্র উপজীবিকা, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তির যোগাদি ক্রিয়ার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা সেই পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্য বা গুরুপরম্পরাগত এই সকল সিদ্ধ ও গুপ্ত উপদেশসমূহ সাধনাসহযোগে হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক স্ব স্ব

উপযুক্ত শিষ্যকে প্রদান করিতে পারিবেন। তাহা হইলে জগ-জ্জননী যোগমায়ার কৃপায় গুরু-শিষ্য উভয়েরই পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"সুপ্রসন্না মহাবিদ্যা জপাৎসিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
জপাদ্ভক্তির্জপাদ্ভুক্তির্জপান্মুক্তির্জপাৎক্রিয়া॥
জপাত্তন্ত্রং জপান্মন্ত্রং জপাদ্যন্ত্রং সুরেশ্বরি।
জপাৎকান্তির্জপাৎশান্তির্জপাৎশ্রদ্ধা-জপাদ্দয়া॥
জপাত্তুষ্টির্জপাৎপুষ্টির্জপাদ্দাতির্জপান্মতিঃ।
জপাদ্বুদ্ধির্জপাল্লক্ষ্মীর্জপাজ্জাতির্জপাৎস্থিতিঃ।
জপাচ্ছান্তির্জপাচ্ছান্তির্জপাচ্ছান্তির্নসংশয়॥"

যথাবিধি ক্রমাগত জপ করিলেই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে; কিন্তু বহু সাধক মন্ত্রযোগ অভ্যাসদ্বারা কোনরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। তাহার কারণ তাহারা অভিজ্ঞ গুরুর অভাবে জপরহস্য, তাহার ক্রিয়া ও ক্রমসাধনা আদৌ জ্ঞাত হইতে পারে নাই। পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত অভিষেকগুলির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিয়া অবশ্যই আরম্ভ করা বিধেয়। পূর্ব্বোক্ত ভূতশুদ্ধি, ষট্চক্র-জ্ঞান ('পূজাপ্রদীপ' দেখ) ও তাহার সাধন, ত্রিলক্ষ্য প্রভৃতি মন্ত্রযোগেরই অন্তর্গত এবং ইহা কিয়ৎপরিমাণে সম্পন্ন না হইলে, 'লয়যোগ' ও 'উরযোগ' সহজে বোধগম্য হইবে না। সুতরাং দেহস্থিত সমস্ত দেবতা ও তীর্থাদি বিষয়ে জ্ঞান ব্যতীত এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যোগস্বরোদয়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"ত্রিতীর্থং যত্র নাড়ীকাস্ত্রীপুণ্যাঃ পরমেশ্বরি।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নাম ধারকঃ॥"

যে সাধক নিজ দেহস্থিত তিনটী তীর্থরূপী নাড়ীত্রয় সম্বন্ধে অবগত নহেন, তিনি নামধারী যোগীমাত্র। সেইরূপ যাঁহার দেহস্থিত 'নবচক্র', 'কলাধার', 'ত্রিলক্ষ্য' ও 'ব্যোমপঞ্চক' সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই, তিনিও নামধারী যোগী। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ॥"

এই সকলের প্রত্যক্ষ অবগতি ব্যতীত যোগের কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থতরাং যোগাভ্যাসীদিগের তাহা জানা আবশ্যক।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, 'সাধনপ্রদীপে' বা 'তন্ত্র-রহস্যের' প্রথম খণ্ডে ইড়া, পিঙ্গলা ও স্থষুম্না এই নাড়ীত্রয়ের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাই 'গঙ্গা', 'যমুনা' ও 'সরস্বতী' নামক তিনটী তীর্থ এবং সেই তীর্থত্রয়ের সঙ্গমস্থলকে 'ত্রিবেণী' বা 'তীর্থরাজ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ষট্‌চক্র সাধনায় তাহার বিশদ জ্ঞান অবগত হইতে পারিবে। সাধারণ লোকে 'ষট্‌চক্র' বলিয়াই জানে, কারণ সকল যোগ-শাস্ত্রে ষট্‌চক্রেরই বিশদভাবে উল্লেখ আছে, কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত শিববাক্য হইতে জানিতে পারা যায়, সাধনকালে নব-চক্রের অভিজ্ঞতা ব্যতীত সাধক পূর্ণকাম হইতে পারিবে না। সে নবচক্র কোনও শাস্ত্রমধ্যে বিশদভাবে বর্ণিত নাই। গুরুমুখ-পরম্পরায় তাহা প্রচলিত রহিয়াছে। পরে বর্ণিত ষট্‌চক্রের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইবে। 'জ্ঞানপ্রদীপে'—'লয়ক্রিয়া ও ব্যাসের সাধনক্রম' দেখ। তাহাতে 'নবচক্রের সাধনক্রম' বর্ণিত হইয়াছে।

'কলাধার' বা 'ষোড়শাধার'—পূর্ণচন্দ্রের যেমন ষোড়শী কলা, চিত্ত একাগ্র করিবার জন্যও তেমনি 'ষোলটী আধার' জানিতে হইবে। তন্মধ্যে—১ম। পদাঙ্গুষ্ঠ, ২য়। পাদপার্ষ্ণি, ৩য় হইতে ১১শ পর্য্যন্ত মূলাধারাদি নয়টী চক্র, ১২শ। জিহ্বাগ্র, ১৩শ। দন্তমূল, ১৪শ। নাসাগ্র, ১৫শ। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশ, এবং ১৬শ। নেত্রত্রয় এই ষোড়শ আধার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

'ত্রিলক্ষ্য' সম্বন্ধে যোগিগণের মধ্যে এইরূপ পরিজ্ঞাত আছে যে,—মূলাধার চক্রস্থিত 'স্বয়ম্ভুলিঙ্গ' প্রথম লক্ষ্যের বিষয়, দ্বিতীয়—অনাহত চক্রস্থিত 'বাণলিঙ্গ', এবং তৃতীয়— ভ্রূদ্বয়-মধ্যস্থ আজ্ঞা-চক্রস্থিত 'সদাশিবলিঙ্গ বা জ্যোতির্লিঙ্গ। সাধকের এই তিনটীই যথাক্রমে ত্রিলক্ষ্যের বিষয়।

ব্যোমপঞ্চক বা 'পঞ্চাকাশ', সম্বন্ধে যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে,—১ম। আকাশ, ২য়। মহাকাশ, ৩য়। পরাকাশ, ৪র্থ। তত্ত্বাকাশ এবং ৫ম। সূর্য্যাকাশ। পিণ্ড-মধ্যস্থিত 'ক্ষিতি', 'অপ', 'তেজ', 'মরুৎ' ও 'ব্যোম', এই পঞ্চতত্ত্বকেও পঞ্চাকাশ বলা হয়। আবার দেহস্থিত সুষুম্না-দণ্ডে 'মূলাধার', 'স্বাধিষ্ঠান', 'মণিপুর', 'অনাহত' ও 'বিশুদ্ধ' এই চক্রপঞ্চক, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ-ভূতের আশ্রয়স্থল বলিয়া তাহাকেও পঞ্চাকাশ বা ব্যোমপঞ্চক বলা যায়। উচ্চতর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এই গুলির সহিত সাধকের ক্রমেই অধিকতর পরিচয় হইবে।

ইতঃপূর্ব্বে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে, 'ভূতশুদ্ধি' সকল সাধনারই মূল ও যোগসিদ্ধির সহজ উপায়। গুরুপরম্পরাদিষ্ট সেই অতি গুহ্য ভূতশুদ্ধি বিষয় সাধকগণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে। সাধনাভিলাষী ব্যক্তি মনোযোগের

সহিত ইহার অনুশীলন করিলে, সাধনার প্রত্যক্ষ ফল ক্রমে অনুভব করিতে পারিবেন। এই ভূতশুদ্ধির সহিতই ক্রমে উন্নত ষট্‌চক্র সাধনার ক্রিয়া সংসাধিত হয়, ক্রমে সাধক তাহাও বুঝিতে সমর্থ হইবে। 'ষট্‌চক্র' বর্ণনা সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধনাকাঙ্ক্ষী পাঠক, তাহাও এই সঙ্গে একবার বুঝিয়া লইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সকল সাধনারই মূল বা আদ্যক্রিয়া চিত্তস্থিরতা। 'পূজাপ্রদীপের' প্রথমেই 'একাগ্রতা' মূলক চিত্তস্থিরতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সাধনাকাঙ্ক্ষী, তাহাও দেখিয়া বুঝিয়া লও। চিত্তের সেই স্থিরতা সম্পাদনের জন্য ইতঃপূর্ব্বে যম, নিয়ম ও আসনাদির অনেক কথা বলা হইয়াছে; সাধক, সেই সকল নিয়ম অনুসারে সাধনার প্রাথমিক কার্য্যদ্বারা কথঞ্চিৎ পুষ্ট হইয়া পূজা-অর্চ্চনা ও যোগসাধনার আদীভূত এই ভূতশুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ করিবে। যথারীতি 'আচমন', 'আসনশুদ্ধি' ও অঙ্গশুদ্ধি' প্রভৃতি সমাধান করিয়া শ্রীগুরুর 'ধ্যান' করিবে, মনে মনে শ্রীগুরুদেবকে অর্চ্চনা করিবে; * পরে ইষ্টদেবতার চরণ-চিন্তা করিয়া অতি কাতরভাবে তাঁহার নিকট সর্ব্বসিদ্ধির প্রার্থনা করিবে, অনন্তর 'তাঁহার কৃপায় নিশ্চিতই সিদ্ধি হইবে', এইরূপ দৃঢ়চিত্ত হইয়া "মণিপুর" চিন্তাসহ কামিনী দেবীর ধ্যান ('পূজাপ্রদীপে'—দেবীর ধ্যান-মূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে।) এবং তাহাতেই দৃষ্টিস্থাপন করিবে। মণিপুর ষট্‌চক্রান্তর্গত তৃতীয় চক্র। এই চক্রের মাহাত্ম্য প্রকৃতই বর্ণনাতীত। সাধনা ব্যতীত ইহার যথার্থ

* 'পূজাপ্রদীপে'—আচমনাদি উক্ত সমস্ত ক্রিয়ার তাৎপর্য্য ও বিধি দেখ।

অনুভূতি হওয়া অসম্ভব। সাধক, দৃঢ়ভক্তিযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা ক্রমে এই সকল বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। প্রথমেই মনস্থির করিবার যেমন সহজ উপায় মণিপুর চিন্তা, সেইরূপ ষট্‌চক্রান্তর্গত মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিবারও প্রথম সূত্র মণিপুর চিন্তা। ('পূজাপ্রদীপে' ও 'পুরশ্চরণ প্রদীপে' কুণ্ডলিনী জাগরণ বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ দেখ।) শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"মণিপুরে সদাচিন্তাং মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকং।"

সকল মন্ত্রের প্রাণস্বরূপ এই মণিপুর সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। নাভিকুণ্ডের সমসূত্রপাতে মেরুদণ্ডান্তর্গত গুপ্তস্থানকে 'মণি পুর' বলে। * তাই ভগবান আরও সরলভাবে বলিয়াছেন :—

"ত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ।"

সাধনাভিলাষী, নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় যত্নসহকারে নাভিকুণ্ডের পশ্চাতে মণিপুরে মনঃসংযোগ করিবে। 'সাধনপ্রদীপে' বা ("তন্ত্ররহস্যের" প্রথম খণ্ডে) 'মন্ত্ররহস্য' বর্ণনার প্রথমেই আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান বিষয়ে একটী ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠক, যদি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই নাভিকুণ্ডই সেই শব্দব্রহ্মের মূল যন্ত্র। দূরে ঘণ্টার শব্দ হইতেছে, যে কোন শ্রোতা সেই শব্দসূত্র বা তাহার রেশ ধরিয়া তাহার অনুসন্ধানে যাইলে, অবিলম্বে সেই ঘণ্টা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ঘণ্টায় আঘাত করিলেই সহসা 'ঢং' করিয়া এক প্রবল শব্দ উত্থিত হয়, ক্রমে সেই শব্দ বা স্বর বায়ুতরঙ্গে

* 'পূজাপ্রদীপে'—'ষট্‌চক্র-চিত্র' দেখ।

আন্দোলিত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রবণ-শক্তিসম্পন্ন জীবের শ্রুতি-গোচর হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান শ্রোতা সেই শব্দের বিচার দ্বারা অনুভব করিতে পারে যে, ঘণ্টার সেই শব্দ বিকাশ-মাত্রেই তখনই একেবারে নিস্তব্ধ হয় না। ঘণ্টা হইতে সেই স্বর যেমন সহসা প্রচণ্ডভাবে উত্থিত হয়, তেমনই বিপরীত পথে তাহা অতি ধীরে ধীরে হীন বা হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া সেই ঘণ্টার অঙ্গেই ক্রমে বিলীন হইতে থাকে। তাই শ্রোতা সেই শব্দসূত্র বা তাহার ধ্বনি অর্থাৎ শব্দরশ্মি বা 'রেশ' ধরিয়া ঘণ্টার নিকট উপস্থিত হইতে পারে। আত্ম-অনুসন্ধানেও সাধক সেইভাবে যত্ন করিলে শব্দ-উৎপত্তির প্রথম লক্ষ্যস্থান বা তাহার অপেক্ষাকৃত স্থূল আধারভূমি নাভিকুণ্ডে উপস্থিত হইতে পারে। এই নাভি-কুণ্ডই প্রাণক্রিয়া বা প্রাণের দ্বৈত ভাবময় প্রাণাপানের বা জীবন-মরণের সঙ্গমস্থল। জীব এই নাভি হইতেই জীবন ধারণ করে, বা গর্ভাবস্থায় এই নাভিপথেই পরিপুষ্ট হয়, এই নাভিই জীবদেহের দশম দ্বার। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই নাভিদ্বার দিয়াই বহির্গত হইয়া মৃত রাজ-শরীরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। আবার প্রাণ এই নাভি পরিত্যাগ করিলেই নাভিশ্বাস হইয়া তাহার দেহত্যাগ হয়। সুতরাং এই নাভিই যোগ সাধনার প্রথমস্থান। জীবভূতের জীবন-মরণ যে, নাভিতেই প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সকলেরই সর্ব্বদা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ব্রাহ্মণমাত্রেই গণ্ডুষ করিবার সময়—প্রাণক্রিয়া জ্ঞাপক প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই যে পঞ্চপ্রাণ * বা পঞ্চবায়ুতে

* 'জ্ঞানপ্রদীপে'—'তন্ত্রে সৃষ্টিক্রম ও তন্মাত্রাদি বিচার' মধ্যে ১৫৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকায়—পঞ্চ প্রাণের বিভিন্ন স্থান ও ক্রিয়া দেখ।

নিত্য ভোজনের পূর্ব্বে আহুতি প্রদান করেন, তাহার মধ্যে প্রাণ বা অপান বায়ুই প্রধান। দেহের উর্দ্ধঅঙ্গে ও উর্দ্ধপথে প্রাণবায়ুর স্থান ও ক্রিয়া, এবং দেহের নিম্নপথে ও নিম্নঅঙ্গে অপান বায়ুর ক্রিয়া ও স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। যে বায়ু উচ্ছ্বাস বা প্রশ্বাসপথে সর্ব্বদা বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহাই প্রাণবায়ু, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তাই প্রাণবায়ুর সহিত প্রাণের ক্ষয় হইতেছে। ঘড়ির যেমন 'দম্' দেওয়া হইলে, যতক্ষণ সেই 'দম্' বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ টিক্ টিক্' করিয়া এক এক দাঁতে সেই দম্ ক্রমে খুলিয়া যাইতে থাকে, অনন্তর সেই দম্ একেবারে শেষ হইলে, ঘড়ি আর টিক্ টিক্ শব্দ করে না, অর্থাৎ সে ঘড়ি আর চলে না, বন্ধ হইয়া যায়: জীবের জীবনবায়ু বা প্রাণবায়ুও সেইরূপ জীবের বিধি-প্রদত্ত প্রাণরূপ দম্ বা 'অজপা' ফুরাইয়া যাইলে দম্ আটকাইয়া জীব মরিয়া যায়। 'পূজাপ্রদীপে'—৬৬ পৃষ্ঠায় 'অজপামন্ত্র' বর্ণনার পাদটীকায় 'অজপার গতি' দেখ। প্রতিক্ষণে প্রশ্বাস সহযোগে সেই দম্ যেমন একটু একটু বাহির হইতে থাকে, ঘড়ির পুনরাবৃত্তি বৃত্তিরন্যায় অর্থাৎ 'পেণ্ডুলাম' বা দোলকের একবার এদিক একবার ওদিক যাইবার মত নিশ্বাস বা নিশ্বাস-সহযোগে প্রাণবায়ু অপান বায়ুর আকর্ষণে পুনরায় নাভিস্থলে ফিরিয়া আসে। প্রাণবায়ুর কার্য্য উর্দ্ধমুখী, অপান বায়ুর কার্য্য অধঃমুখী, প্রাণবায়ু যখনই উর্দ্ধ-মুখে বাহির হইয়া যায়, অপান বায়ু তখনই তাহাকে নিম্নমুখে আকর্ষণ করিয়া আনে, অপান বায়ুর নিম্নমুখী শক্তিদ্বারাই মলমূত্র ও অধঃবায়ু প্রভৃতি নিঃসারিত হয়। যাহাহউক নাভিস্থল হইতে প্রাণ ও অপানের এইরূপ আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলিতে থাকে। অপান অপেক্ষা প্রাণবায়ুর শক্তি নিশ্চয়ই অধিক, সেই কারণ

অপান বায়ুর সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাণ-বায়ুকে সম্পূর্ণ ধরিয়া বা আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না। প্রাণ প্রতিনিয়ত সবেগে নাসিকাপথে বাহির হইয়া সাধারণতঃ দ্বাদশঅঙ্গুলিদীর্ঘ গতি-বিশিষ্ট হয়, কিন্তু অপানের আকর্ষণে দশ অঙ্গুলির অধিক স্বাভাবিকভাবে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং প্রতি প্রশ্বাসে দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ গতিবিশিষ্ট প্রাণগতি ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। সাধক, যোগবলে প্রাণায়ামসাহায্যে তাহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া ক্রমে দীর্ঘজীবী হইয়া এবং সুপুষ্ট দেহ-প্রাণ লইয়া সাধনার পথে অধিকতর অগ্রসর হইয়া থাকে। নাভিকুণ্ড, এই সকল যোগ-সাধনার মূলীভূত অমূল্য মণিরত্নস্বরূপ, প্রাণা-পানের প্রধান আগার বা পুরী, সেই কারণ, ষট্‌চক্রমধ্যে ইহা 'মণিপুর' * বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাণ ও অপান জীবের দুইটী অমূল্য ধন, উভয়ের মধ্যে জীবের জীবন-মরণের সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিলেও পরস্পরে যেন ঠিক মিল নাই। যেন উভয়ের মধ্যে দুই জন প্রবল পরাক্রান্ত পালোয়ানের মত কেবল উহাদের 'পাঁইতাড়া' চলিতেছে, 'প্রাণ' যেমন গর্ব্বভরে বাহির হইয়া আসিতেছে, 'অপান' অমনি তাহার পশ্চাতে আক্রমন ও আস্ফালন করিতে করিতে উপরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, তাই প্রাণ যেন পুনরায় ক্রোধভরে নিম্নদিকে অপানের প্রতি যেন অনিচ্ছাতেই নাভি পর্য্যন্ত দৌড়িয়া আসিল, অপান তখন আরও দুই অঙ্গুলি নিম্নে 'নাভিদুর্গের' মধ্যে যেন আশ্রয় লইয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রাণ আবার আপনবেগে ঊর্দ্ধমুখে বাহির হইতেছে,

* 'গীতাপ্রদীপে'—'অর্জ্জুন' ও 'দ্রৌপদী' অংশ দেখ।

অপানও অবসর বুঝিয়া পুনরায় বাহির হইয়া অমনি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। এইভাবে প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহযোগে জীবের জীবন অতিবাহিত বা সামান্য সামান্য ক্ষয় হইতেছে। যখন বা যে মুহূর্ত্তে প্রাণ আর অপানের প্রতি ফিরিয়া চাহিবে না, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জীবের 'নাভিশ্বাস' আরম্ভ হইবে, ক্রমে প্রাণবায়ু নাভি হইতে দূরে সরিয়া আসিবে, তাই প্রথমে নাভিশ্বাস হইতে 'কণ্ঠশ্বাস,' ক্রমে 'কণ্ঠাগত' ও 'ওষ্ঠাগত' প্রাণ হইয়া, প্রাণবায়ু জীবদেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সাধনাভিলাষী যোগী এই নাভিকুণ্ডে অতি সাবধানে প্রাণাপানের মিলন সাধন করিতে পারিলেই যোগের প্রথম ক্রিয়া আরম্ভ হয়। রীতিমত কুম্ভকদ্বারা নাভিস্থানে কিয়ৎক্ষণ বায়ু ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেই প্রাণ-অপানের যোগ সহজেই সাধিত হইয়া থাকে। তখন নাভিপদ্মস্থিত মৃণালপথে সেই প্রাণাপান মিলিত বা যোগসিদ্ধ বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া 'কুণ্ডলিনী' নামক জীবের শ্রেষ্ঠ বা জীবনী-শক্তিকে স্পন্দিত করে। প্রকৃতিরূপা মহাশক্তি তখন জাগরিতা হইয়া বা চৈতন্যলাভ করিয়া সেই যৌগিক-বায়ুর সহযোগে সাধকের ষট্‌চক্র ভেদ করিতে অগ্রসর হন। ইহাই 'কুণ্ডলিনী-চৈতন্য' এবং ইহাই যোগসিদ্ধির প্রধান কার্য্য বা উপায় বলিতে হইবে। ('পুরশ্চরণপ্রদীপে'—কুণ্ডলিনী-চৈতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে; পাঠক, তাহাও বুঝিয়া লও।) 'মন্ত্র', 'হঠ', 'লয়' ও 'রাজ' এই চতুর্ব্বিধ * যোগসিদ্ধিরই মূলকার্য্য মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করা। তাহাই

* 'জ্ঞানপ্রদীপে' ১ম ভাগে চতুর্ব্বিধ যোগ বর্ণনা দেখ।

নাদসিদ্ধি বা মন্ত্রচৈতন্ত বলিয়া কথিত। সাধক, পরে তাহার রীতিমত অভ্যাসদ্বারা ইহার আরও গভীরতর রহস্য অনুভব করিতে পারিবে।

নাভিচক্রে উক্ত উভয় বায়ু সতত পরিভ্রমণ করিতেছে; সাধক, এই বায়ুর সহিত মনের ঐক্য স্থাপন কর, অর্থাৎ নাভিতে একাগ্রভাবে মনঃসংযোগ কর, তাহা হইলেই হঠাদি-যোগের ক্রিয়া সহজে আরম্ভ হইবে। নাভিস্থিত বায়ু 'সূর্যাস্বরূপ,' মন 'চন্দ্রাত্মিকা,' সেই কারণ নাভিচক্রেই 'চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলন-জনিত যোগ' সাধিত হয়। আবার ভগবান বলিয়াছেন,—নাভিচক্র রক্তবর্ণ 'মহাবজঃ' স্বরূপ, ইহার সহিত পাণ্ডুবর্ণ 'বিন্দু' শুক্রের মিলন হইলেই শিবশক্তির সংযোগ হইয়া থাকে, তাহাই যোগ-সাধনার মূলসূত্র। আসল কথা, নাভিচক্র-চিন্তাই এক্ষণে যোগীর প্রথম কার্য্য। শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

"নাভিমধ্যে স্থিতোব্রহ্মা হৃদিমধ্যে চ কেশবঃ।
শঙ্করঃ শিরসি জ্ঞেয় স্ত্রিস্থানং মুক্তিদায়কং॥"

নাভিতে বা মণিপুরচক্রে রক্তবর্ণ ব্রহ্মা, হৃদয়ে বা অনাহত-চক্রে নীলমণিসদৃশ বিষ্ণু, এবং শিরসি বা সহস্রারচক্রে স্বচ্ছ স্ফটিকসদৃশ শঙ্কর অবস্থিত রহিয়াছেন। এই তিন স্থানই সাধকের মুক্তি-প্রদায়ক। তাই 'গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বররূপে' চিন্তা ও প্রণাম করিবার সময় উক্ত স্থানত্রয় লক্ষ্য করিবার বিধি আছে। 'পূজাপ্রদীপে'—২১ পৃষ্ঠা দেখ। মহা-প্রকৃতির আদি গুণসঞ্জাত সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্য দিয়াই সকল জিনিসের মূল অন্বেষণ করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে যোগ-শক্তির উদ্বোধনের জন্যও প্রথমে সেই রজোগুণাত্মিকা সুমনোহর রক্তোৎপলরূপ

নাভিমধ্যে কুণ্ডলিনীরূপিনী রক্তবর্ণা কামিনীদেবীকে চিন্তা করিতে হইবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধক, তাহা হইলেই অনতিকাল মধ্যে তাহার প্রত্যক্ষফল অনুভব করিতে পারিবে। তাহা হইলেই প্রথম মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী-শক্তি ক্রমে জাগরিতা হইয়া সুষুম্নাপথে প্রবাহিতা হইবেন, তখন সাধক তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। জীবের মেরুদণ্ড-মধ্যস্থিত সুষুম্নাপথে মৃণালসদৃশ একটী অতি সূক্ষ্ম তন্তু মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত পরিচালিত আছে, তাহাতে ষট্চক্রবর্ণিত কমলগুলি পরপর বিন্যস্ত রহিয়াছে। এ সকল যথাস্থানে বিশদভাবেই বর্ণিত হইবে। এক্ষণে সাধকের কেবল জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই নাভিপদ্ম হইতে মৃণালাকারে তিনটী সূক্ষ্ম তন্তু তিনদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। একটী উহার ঠিক পশ্চাতে 'মণিপুরচক্রে', দ্বিতীয়টী উর্দ্ধমুখে 'সহস্রারে' এবং তৃতীয়টী অধোমুখে 'মূলাধার' পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু এই তিন পথই দুর্গদ্বারের ন্যায় সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ, কেবল মূলাধারস্থিত চৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনী-শক্তির সাহায্যে তত্তৎস্থানে গমন করা যাইতে পারে। সুতরাং নাভিপদ্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন ক্রমেই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। তবে এইরূপ সাধনায় যখন সাধকের তিন পথই মুক্ত হইবে, তখন যে পথ দিয়া ইচ্ছা সেই পথ দিয়াই প্রাণবায়ু সহযোগে কুণ্ডলিনীকে পরিচালনা করা যাইতে পারিবে।

যাহাহউক, সাধক এতক্ষণে 'মণিপুর-মাহাত্ম্য' বোধ হয় অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, ভূতশুদ্ধি-সাধনায় প্রথমে মণিপুরে চিন্তা এবং তাহাতেই দৃষ্টি-স্থাপন করিতে হইবে। সাধক, পূজাপ্রদীপ নির্দ্দিষ্ট প্রাথমিক

স্থূল ভূতশুদ্ধির পূর্ব্বকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া সরলভাবে আসনে উপবিষ্ট হইবে। স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন বা যে কোন আসনে সুবিধা সেই আসনেই বসিবে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে নাভিদেশে দৃষ্টিস্থাপন করিতে হইলে নিম্নমুখে অবস্থান করিতে হয়, সুতরাং সেই সময় বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপন স্বাভাবিক; অতএব যোগাভিলাষী প্রযত্নসহকারে প্রথমে সেইরূপ করিয়াই কিয়ৎক্ষণ মনে মনে ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিবে বা 'পূজাপ্রদীপে' মনের চিন্তাশূন্যতা অংশ দেখিয়া কার্য্য করিবে তাহাহইলেই মন অনেকটা সুস্থির হইবে। তখন নিম্নলিখিতরূপে ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। গুরুপরম্পরাদিষ্ট ভূতশুদ্ধির অতি গুহ্য সঙ্কেত যাহা বর্ণিত হইতেছে, সাধক তাহা অতি মনোযোগ সহকারে অবলম্বন করিবে। ইহা অপেক্ষা ভূতশুদ্ধির অন্য সহজ উপায় আর নাই এবং ইহা অপেক্ষা সহজে আর তাহা ভাষায় পরিব্যক্ত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না; কারণ তাহা কেবলই সাধকের অনুভবসিদ্ধ বস্তু। সাধনাকাঙ্ক্ষি, তখন বেশ সরলভাবে নিমীলিত নয়নে উপবেশন করিয়া কিয়ৎক্ষণ মূলমন্ত্র ধ্যান বা জপ করিতে করিতে চিন্তা করিবে * যে—"আমি যেন এক অনন্ত সাগরমধ্যে একটী অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থান করিতেছি। সে মহাসমুদ্র প্রকৃতই অনন্ত, কোনও দিকে তাহার কূলকিনারা কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না, কেবল অসংখ্য জলতরঙ্গ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর প্রতিহত হইতেছে। দ্বীপের উপর অন্য জনমানব আত্মীয়-স্বজন বলিয়া আর কেহই নাই, কিন্তু একটী পরমাদ্ভুত কল্পবৃক্ষ, তাহার

* 'পূজাপ্রদীপের' মধ্যে একথা বিবৃত ভাবে বলা হইয়াছে।

অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। বৃক্ষটী প্রকৃতই বিচিত্র! কত অভিনব সুরভি-পুষ্প তাহাতে ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত; আবার কত সুমনোহর সুমিষ্ট ফলভারে তাহার প্রতি শাখা প্রশাখা অবনত, বিবিধ বর্ণের পক্ষী সেই বৃক্ষে বসিয়া মনের আনন্দে নাম মন্ত্র গান করিতেছে, মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ পবন হিল্লোলে চারিদিক সুশীতল, সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা-পরিশূন্য এমনই পবিত্র স্থানে সাধক নিরালম্বভাবে সেই বৃক্ষমূলে নিজ আসন পাতিয়া যেন উপবিষ্ট রহিয়াছে, আর একাগ্রমনে তাহার ইষ্টচিন্তা করিতেছে। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, সাধকের চিত্ত অপেক্ষাকৃত স্থির হইবে। তখন সে দেখিবে, সাগরের সেই উত্তাল তরঙ্গগুলি যেন ক্রমে ভীষণরূপ ধারণ করিতেছে, যেন প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার সেই দ্বীপটীকে গ্রাস করিবার জন্য নৃশংসভাবে আক্রমন করিতেছে। বস্তুতঃ সে অবিরত তরঙ্গাঘাত বা তাহার আক্রমণবেগ ক্ষুদ্র দ্বীপটীর পক্ষে সহ্য করা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে দ্বীপটী অনন্ত সাগরের অতলগর্ভে ক্রমে বিলীন হইল। কিন্তু সাধক ঠিক একইভাবে বসিয়া আছে। তাহার আসন তিলমাত্রও আন্দোলিত হয় নাই।

এক্ষণে ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার আছে। ভূত অর্থাৎ পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম; অর্থাৎ পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ। এই পঞ্চভূতসহযোগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনির্ম্মিত। বিশ্বকে শূন্যময় চিন্তা করিতে হইলে, প্রথমে এই পৃথ্বী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে বা শূন্যে লয় করিতে হইবে। অনন্তর ভূতপঞ্চকবিনির্ম্মিত

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই শরীরও অনন্ত আকাশে লয় করিয়া নূতন দিব্য-দেহের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহাই 'ভূতশুদ্ধির' মূল বা প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ইতঃপূর্ব্বে যে অনন্ত সাগর ও তদন্তর্গত ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বাহ্য-পঞ্চভূতের বিলয়-সাধনের উদ্দেশ্যে জানিতে হইবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি আছে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই, সে বিষয় গভীর ও বিস্তৃতভাবে জানিবারও বিশেষ আবশ্যকতা নাই। তবে সেই সমগ্র পৃথ্বীতত্ত্বের সমষ্টি-স্বরূপ সেই ক্ষুদ্র দ্বীপটীই সাধক আপনার সুবিধার জন্য এক্ষণে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। সাধকের সেই কল্পিত ভূমিটুকু ব্যতীত বিশ্বমধ্যে আর যে কিছুই নাই, তাহা অনন্ত মহাসাগরের সেই বিরাট দৃশ্যের সম্মুখে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। সাধক, যেখানে বা যে অবস্থায় বসিয়াই সাধনা করুক না কেন, তখন সে ব্যক্তি তন্ময়ভাবে এই বিরাট অর্ণবান্তর্গত ক্ষুদ্র দ্বীপ ও তাহার উপরিস্থিত কল্পবৃক্ষ এবং স্বীয় আসন ব্যতীত আর কিছুই মনে করিবে না, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্রদ্বীপরূপী পৃথ্বীটুকু মহা-সলিলে লয় করা তখন বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না। অর্থাৎ একটিমাত্র সেই প্রবল তরঙ্গেই তাহা তখন অনায়াসেই অতল অর্ণবমধ্যে বিলীন হইবে। পৃথ্বাদি এই যে পঞ্চভূত, কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে সাম্রাজ্যাধিকার বর্ণনায় শ্রীশ্রীষোড়শীমুখে উক্ত হইয়াছে, পাঠকের নিশ্চয়ই তাহা স্মরণ আছে। সেই পরব্রহ্ম হইতে পরাপ্রকৃতি বা মায়া এবং তাহা হইতে ক্রমে এই ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত পঞ্চ-ভূতের অবস্থা ও গুণাদি সম্বন্ধে এক্ষণে সাধকের সামান্য বুঝিয়া

রাখা আবশ্যক।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, দৃশ্য, অদৃশ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই পঞ্চভূতাত্মক; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, অথবা যাহা আছে, তাহা যে পঞ্চতত্ত্বাতীত অব্যক্ত পরব্রহ্মস্বরূপ সে বিষয় পাঠক বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। এই পঞ্চতত্ত্বের প্রথম বা আদিতত্ত্ব আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ যেমন এই পঞ্চতত্ত্বমধ্যে আদিতত্ত্ব, পৃথ্বী সেইরূপ শেষতত্ত্ব। সুতরাং শেষতত্ত্বে সমস্তই বর্ত্তমান অর্থাৎ পৃথিবীতে পৃথ্বী বা মৃত্তিকা ত আছেই, তদ্ব্যতীত জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এ সকলও আছে। তত্ত্বপঞ্চকের রূপ ও গুণ সম্বন্ধে বলিতেছিলাম, সাধক সর্ব্বদা তাহা স্মরণ রাখিবে। পৃথ্বীতত্ত্বের রূপ—'পীতবর্ণ', ইহার গুণ—'গন্ধ'। জলতত্ত্বের রূপ—'শ্বেতবর্ণ', ইহার গুণ—'রস'। অগ্নিতত্ত্বের রূপ—'রক্তবর্ণ', ইহার গুণ—'রূপ'। বায়ুতত্ত্বের রূপ—'নীলবর্ণ', ইহার গুণ—'স্পর্শ'। আকাশতত্ত্বের রূপ—'সর্ব্ববর্ণ', ইহার গুণ—'শব্দ'। বিশ্বপিণ্ডে যাহা আকাশ হইতে ক্রমে স্থূলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই গুণপঞ্চকের পরিণতিরূপ পৃথিবী এবং পৃথিবী হইতে সমুদ্ভূত জীবপিণ্ডও সেইরূপ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের প্রতিলোম গুণযুক্ত পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"পঞ্চতত্ত্বাৎভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে।" এই পঞ্চতত্ত্ব হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেই তত্ত্বময় সমস্ত সৃষ্টিই পুনরায় তত্ত্বেই বিলীন হইবে। ইতঃপূর্ব্বে সাগরান্তর্গত যে ক্ষুদ্র

দ্বীপটির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কল্প বৃক্ষস্থিত ফুল, ফল ও কুজিত বিহঙ্গাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য জীবোপভোগ্য পৃথ্বীসম্ভূত পঞ্চতত্ত্বের বিকাশ। পাঠকের বোধ-সৌগমার্থে আরও খুলিয়া বলিতেছি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, পঞ্চভূতের এই পাঁচটী গুণ, জীব বিধিপ্রদত্ত চক্ষু-কর্ণাদি তাহার পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্তই উপভোগ করে। কর্ণে শব্দ, ত্বকে স্পর্শ, চক্ষুতে রূপ, জিহ্বায় রস, এবং নাসিকায় গন্ধ, এইভাবে পঞ্চভূতের সম্যক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে। একণে সাধক দেখ, সেই দ্বীপটী সাক্ষাৎভাবে পৃথ্বীতত্ত্ব, তাহাতেই সমুদ্ভূত অদ্ভুত গুণপঞ্চক এখনও অনুভব করিতেছ। ঐ যে বিহঙ্গের 'কলশব্দ,' উহাই পৃথিবীর প্রতিলোম ক্রিয়াসঞ্জাত আকাশ-তত্ত্বের গুণ; তাহার পর বৃক্ষপত্র-সঞ্চালিত মৃদুমন্দ 'পবনহিল্লোলে' 'স্পর্শিতভাব', উহার দ্বিতীয় বায়ুতত্ত্ব; তৃতীয় 'রূপ' বিচিত্রবর্ণের 'পুষ্প ও বিহঙ্গদেহ' প্রভৃতিতে পরিস্ফুট; বিবিধ 'রসাল ফলগুলি' উহার চতুর্থতত্ত্ব 'রস'-গুণ-বোধক; এবং 'পুষ্পের সুমনোহর সৌরভরাশি' উহার পঞ্চম গুণ 'গন্ধ'-তত্ত্বের বিকাশ করিয়া দিতেছে। সাধক, স্বীয় ইন্দ্রিয় সাহায্যে এখনও সমস্ত স্পষ্টই অনুভব করিতেছ। এস্থলে পঞ্চতত্ত্বের গুণপঞ্চকসহ সমস্তই একাধারে বিদ্যমান। ভূতসিদ্ধির বা ভূতশুদ্ধির প্রারম্ভে বাহ্য-পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভাব্য বাহ্য-পঞ্চভূত বা তত্ত্বপঞ্চক সাধন সৌকর্য্যার্থে অতি ক্ষুদ্রায়তনে সন্নিবিষ্ট, সাধক বেশ তন্ময় হইয়া তাহা চিন্তা করিতেছ, সহসা সেই সমুদ্রোত্থিত তরঙ্গাঘাতে তাহা অতলজলে ডুবিয়া গেল, পৃথ্বী পঞ্চতত্ত্বে আপন অপূর্ব্ব বিকাসসহ জলতত্ত্বে লীন হইল। সাধক বাহ্য-পঞ্চতত্ত্বের

অর্থাৎ স্থূলভাব জলে লয় করিয়া এখন কেবল তদ্গতচিত্তে সেই অনন্ত জলরাশিকে চিন্তা করিবে, অনন্তর সেই জলের তরঙ্গমধ্যে তরঙ্গসমূহের অবিরত ঘাতপ্রতিঘাতে জলেই তেজ বা অগ্নির বিকাশ দেখিতে পাইবে, এবং এক্ষণে তাহাই চিন্তা করিবে, ক্রমে সেই অগ্নি যেন বাড়বানলে পরিণত হইয়া সমুদ্রের সমস্ত জল ক্রমে পরিশুষ্ক হইয়া যাইবে। তখন কেবলই অগ্নি, চারিদিক অগ্নিময়, যেন অগ্নিরই সমুদ্র আগুন ধূ ধূ করিতেছে; সাধক, এখন যেন মহাচিতাগ্নিমধ্যে আশঙ্কিতভাবেই উপবিষ্ট। অগ্নিমধ্যে লৌহখণ্ড যেমন লোহিত-বর্ণ ধারণ করে, সাধকের সর্ব্বাঙ্গ তখন যেন আগুনে জ্বলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে আগুন, প্রথমে বায়ুতত্ত্বের সহিত যেন লক্ লক্ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল, বায়ুমণ্ডলের সহায়তায় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বের স্থূলতত্ত্ব, পৃথ্বী ও জলসম্ভূত যে ইন্ধন এতক্ষণ অগ্নিরূপে জ্বলিতেছিল, ক্রমে তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিল, অগ্নিতে লয় হইয়া গেল, অগ্নি আর কাহাকে লইয়া তাহার শক্তিসামর্থ্য প্রকাশ করিবে? সুতরাং তখন স্বভাবতঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল, অনন্ত বায়ুমণ্ডলে আশ্রয় লইল, তাহার শেষ শিখা বায়ুতেই লীন হইল। ভস্মসার যাহা কিছু পড়িয়াছিল, ক্রীড়াপরায়ণ বায়ু অগ্নির অভাবে কিয়ৎক্ষণ তাহাদের লইয়াই ক্রীড়া করিল, কিন্তু পরক্ষণে সেই ভস্মস্তূপ কোথায় উড়িয়া উধাও হইয়া গেল, বায়ু তাহার অনন্ত ক্রোড়ে তাহাদের আশ্রয় প্রদান করিল, সব লয় হইয়া গেল। সেই প্রবল প্রভঞ্জন এতক্ষণ ক্রীড়া করিয়া যেন অতীব পরিশ্রান্ত-ভাবে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, অবসাদে তাহার অঙ্গ যেন শিথিল হইয়া গেল, মৃদুমন্দভাবেও সাধকশরীরে আর তাহা

অন্তর্ভূত হইল না, অনন্ত অপরিসীম আকাশ-অঙ্গে যেন ঢলিয়া পড়িল, আর তাহার অস্তিত্বমাত্রও বোধ হইল না, সম্পূর্ণভাবে আদিতত্ত্ব ব্যোম বা আকাশের মধ্যে বায়ু তখন বিলীন হইয়া গেল। সাধক, এখন সমগ্র বিশ্ব একেবারে শূন্যময়, আর কোথায় কিছু নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ, নির্বাত, নিরুপদ্রব। একি অদ্ভুত মহাশূন্য! বাহ্যভূতপঞ্চক ধীরে ধীরে এইভাবে লয় হইল। পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও অভ্যাসের দ্বারা যখন এই চিন্তা সাধকের হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত হইবে, তখনই এই 'বাহ্যভূতশুদ্ধি' একপ্রকার শেষ হইবে। এক্ষণে বলিয়া রাখা আবশ্যক বাহ্য ও অন্তরভেদে ভূতশুদ্ধি দ্বিবিধ। এতক্ষণ যে বিষয় উক্ত হইল, তাহাই বাহ্যভূতশুদ্ধি; ইহাদ্বারা বাহ্যভূতপঞ্চকের লয় ও বাহ্য-বিক্ষিপ্ত চিত্তের চাঞ্চল্য বিদূরিত হইয়া সকল পূজা-অর্চনা ও যোগ-সাধনার মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার-পুষ্ট চিত্তের অন্তর্নিহিত বিক্ষেপ বা তাহার সহায়ক পাপপুরুষের হস্ত হইতে এখনও সাধকের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নাই। তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াদ্বারা অন্তর্ভূতশুদ্ধি-সহযোগে তাহার দমসাধন অভ্যাস করিতে হইবে। অন্তর্ভূত-শুদ্ধিই সমগ্র যোগের সারধন—ষট্‌চক্রভেদ। সাধক খুব মনোযোগের সহিত যোগানুষ্ঠানের একমাত্র পথ নিম্নলিখিত ষট্‌চক্র নিরূপণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত হও। অন্তর্ভূতশুদ্ধি * ইহারই অন্তরমধ্যে যথাসময়ে বর্ণিত হইবে।

* 'পূজাপ্রদীপে'—ভূতশুদ্ধি অংশে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে; দেখ।

ষট্‌চক্রনিরূপণ।

"অথ তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রাদি ক্রমোদ্‌গতঃ।
উচ্যতে পরমানন্দ নির্ব্বাহ প্রথমাঙ্কুরং॥"

"নিগমকল্পলতিকা" তন্ত্রে শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"তত্ত্বজ্ঞানং পরংজ্ঞানং জ্ঞানমধ্যে প্রতিষ্ঠিতং।
ষট্‌চক্রাভ্যাসনং জ্ঞানমাদিভূতং ন সংশয়॥"

এই ষট্‌চক্রের সাধনালব্ধ জ্ঞান ব্যতীত আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান কিছুতেই পরিপুষ্ট হয় না। 'ন্যায়,' 'বৈশেষিক,' 'সাংখ্য,' 'পাতঞ্জল,' 'মীমাংসা,' 'ভক্তিসূত্র' ও 'বেদান্ত' এই সপ্তদর্শনেরই আদিভূত সাধন জ্ঞান কোন না কোন বিধানে ষট্‌চক্রের গূঢ় সাধনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে দর্শন শাস্ত্রগুলি শ্রীগুরুনির্দ্দিষ্ট গুহ্য সাধন বিজ্ঞানের সহিত পঠিত হইত, তাহাতেই সাধকগণ সেই পরমবস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন। অধুনা কেবল দার্শনিক বিচার মাত্র পণ্ডিতদিগের মৌখিক জ্ঞান বা বাক্‌পটুতারূপ পাণ্ডিত্যলাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন বা তাঁহার যথার্থ অনুভূতি আদৌ হয় না। ফলে—সাধনরাজ্যে অধিকাংশই যেন আত্মপ্রবঞ্চকরূপ বাক্যবাগীশ হইয়া উঠিয়াছেন। দর্শন অর্থে—কেবল 'পঠন-পাঠন বা শ্রবণ ও কথন্' নহে, প্রত্যক্ষ-রূপেই 'দর্শন' বা 'দেখা'। যোগ-সাধনা ব্যতীত সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের অন্য কোনও উপায় নাই। সেই কারণ সকল দর্শনেরই মূল সাধন এই ষট্‌চক্র জ্ঞান।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যদেব ও তাঁহার ষট্‌চক্রমূলক যোগ-সাধনা

আধুনিক বেদান্ত দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যদেব-ও নিজের জীবনেই পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ গোবিন্দপাদাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের উপদেশে 'হঠাদিযোগক্রিয়া'র ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। একথা তাঁহার আদি জীবনী মধ্যে পরে প্রকাশিত হইলেও, তাঁহার স্বরচিত 'যোগ-তারাবলী' মধ্যে তিনি গুরুমণ্ডলীর চরণারবিন্দে সভক্তি বন্দনা পূর্ব্বক শ্রীসদাশিব প্রোক্ত 'লয়াদি-যোগের' নিম্নলিখিতরূপে যথাক্রম গুপ্ত সাধনেঙ্গিত নিজেই করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন—"প্রাণবায়ুর রেচকাদি হঠযোগ নির্দ্দিষ্ট প্রাণায়াম-সহযোগে নাড়ীসমূহ বিশোধিত হইলে, লয়-যোগাত্মক অনাহত কমলের মধ্যে আত্ম-বোধ মুলক 'মধ্যমা' নাদধ্বনি সদাই নিনাদিত হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই আত্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ।"

অনন্তর "নাদানুসন্ধান" রূপ উন্নত লয়যোগ ক্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া যেন সাক্ষাৎ ভাবেই বলিতেছেন :—"হে নাদানু-সন্ধান, আমি তোমাকে এইবার নমস্কার করি, 'ত্বাং সাধনং তত্ত্বপদস্য জানে' বা ত্বাং মন্মহে তত্ত্বপদং লয়ানাম' অর্থাৎ তোমাকেই তত্ত্বোপদেশের শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া জানি, অথবা আমি জানি—লয় সমূহ মধ্যে তোমাকেই 'তত্ত্বপদ' কহে।"

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন—"উড্ডিয়ান, জালন্ধর ও মূলবন্ধনাদি মুদ্রাসহযোগে 'মূলাধার' চক্রস্থিতা সর্পাকারা প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইলে, পূর্ব্বকথিত প্রাণায়ামসিদ্ধ প্রাণবায়ুর 'প্রত্যঙ্মুখত্বাৎ' অর্থাৎ পশ্চিম বা পশ্চাৎ মুখত্ব হেতু পৃষ্ঠদেশস্থিত মেরুদণ্ডের অন্তর্গত সুষুম্নানাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্টা

হন, তাহাতে বায়ুর গমনাগমন গতি মোচন হইয়া থাকে।"

"মূলাধার চক্রস্থিত তেজাত্মিকা অগ্নিমূখী ত্রিকোণ যন্ত্রস্থিত হুতাশন শিখার আকুঞ্চন ফলে ও পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়ামসিদ্ধ অপান-বায়ুর বিহিত আকর্ষণে * 'সহস্রার' চক্রের অন্তর্গত গুপ্ত 'সোমচক্রে' সাধক কুণ্ডলিনী সহযোগে উপনীত হন, জীবাত্মা তখন সেই সোমচক্র পীড়িত ও তাহা হইতে বিনিঃসৃত 'সোমরস'-ধারা পান করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য পূজ্যপাদ ঋষিগণুলী এই অনির্ব্বচনীয় সোমরস পান করিয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন।"

"পূর্ব্বকথিত বন্ধত্রয়রূপ মুদ্রার অভ্যাসফলেই রেচক পূরক বিবর্জ্জিত 'কেবলীকুম্ভকের' আবির্ভাব হয়। তখন অতি সাবধানে 'অনাহত' চক্রের অবিরত সাধনায় চিত্ত তথায় সুস্থিররূপে রক্ষিত হয় এবং যোগিগণেরই অনুভবসিদ্ধ কেবলী-কুম্ভকরূপ শ্রী বা লক্ষ্মীস্বরূপ স্থিতিশক্তি বা সাধনসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তখন সাধকের স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া ও মনোবৃত্তি সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এইভাবে যখন প্রাণবায়ু উক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেবলীকুম্ভক দ্বারা প্রত্যাহৃত হয় ও প্রবুদ্ধা কুণ্ডলিনী কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়, তখন সেই প্রাণগতি, প্রতীচীন্‌ অর্থাৎ পশ্চিম বা দেহের পশ্চাৎ দিকস্থিত মেরুদণ্ডেরও পিছনদিক ক্ষীণ হইয়া যায়, তখনই মন কুণ্ডলিনী সহযোগে গুপ্ত সুষুম্নার অন্তর্গত অতি সূক্ষ্মা ব্রহ্মনাড়ী পথে 'বিষ্ণুপদান্তরালে' অর্থাৎ জ্ঞানহৃদয়াত্মক মহাশূন্যময় মহাকাশপ্রান্তে বিলীন হইয়া যায়।

* 'পূজাপ্রদীপে'—সূক্ষ্মভূতশুদ্ধি ও পাদুকাকমলের বর্ণনা দেখ।

এইভাবে অবিরত কেবলীকুম্ভকরূপ উন্নত লয়যোগ সিদ্ধির ফলে মহামতি যোগিগণের শ্বাসক্রিয়ার নিরঙ্কুশ উদ্গত ভাব একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি সমূহও শূন্য হইয়া যায়, তাঁহাদের প্রকৃত ভাবে মরুল্লয় বা পবনবিজয়তা লাভ হইয়া থাকে। লয়যোগের এইরূপ সাধনা-দ্বারা ক্রমে উহার অন্তিম অবস্থায় ধীরে ধীরে রাজযোগের বিকাশ হইতে থাকে, তখন উক্ত যোগের নিম্ন ও মধ্যক্রম নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াবলীর আর প্রয়োজন হয় না, তখন উন্নততম যোগীর জাগ্রতাদি কোন অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়াদিজনিত চিত্তের আর বিক্ষেপ উৎপন্ন করে না।"

["জ্ঞানপ্রদীপে"—যোগচতুষ্টয়ের ধারাবাহিক বিস্তৃত বর্ণনা দেখিলে ও তাহার যথাযথ তাৎপর্য্য অনুভব করিলে, যোগাভি-লাষী সাধকগণের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবে।]

অনধিকারীর হস্তে সাধনশাস্ত্রের অপব্যবহার:—অধুনা অনধিকারী বা যোগ সাধনায় অনভিজ্ঞ পণ্ডিত বা শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিগণের দ্বারা সর্ব্বদর্শন ও যোগাদি সাধন শাস্ত্রের যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা ও উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা দেখিলে বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইতে হয়। মুদ্রিত ও প্রচারিত ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত উক্ত 'যোগতারাবলী' আদি বহু গ্রন্থেরই অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদি আজকাল সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সকল গ্রন্থই কেবল আভিধানিক শব্দ ও কাল্পনিক ভাব সম্পদে পরিপুষ্ট। সাধনার অতি সামান্য ইঙ্গিত ও উপদেশে যাহা সাধকের অতি সহজেই বোধগম্য হয়, তাহাও কেবল জটিল শব্দ বাহুল্য ভীষণ ভারাক্রান্ত! অনধিকারীর হস্তে ইহা অপেক্ষা

অধিক আশা করিবার উপায় নাই। সমস্তই ঘোর কালপ্রভাব বলিতে হইবে।

শ্রীমন্মহর্ষিগণও ষট্‌চক্র সাধনায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন:—সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সাধনা ব্যতীত কেবল মনঃকল্পিত অফুরন্তভাবরাশি ও সাধনবিজ্ঞানের শুষ্ক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা কখনই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। আদিজ্ঞানী কপিল হইতে ব্যাস ও শঙ্কর অবধি সকলেই সেই শিবোক্ত যোগসাধন বা 'ষট্‌চক্র' ও কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন সহযোগে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানানুকূল সাধনোপদেশ চিরকালই গুরুমুখগম্য গুপ্ত বিষয় বলিয়া শিবোপদিষ্ট। বিশেষ সত্যাদি যুগত্রয়মধ্যে তাহা সাধারণ ভাবে প্রকাশ করাও নিষিদ্ধ ছিল। এতদ্ব্যতীত কেবল সাধারণ ভাষার সাহায্যে তাহা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সাধনাধিকারী না হইলে তাহা সকলের বোধগম্য হওয়াও দুরূহ। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন:—

"তত্ত্ব সমন্বিতং চক্রং ক্রমাভ্যাসেন সিধ্যতি।
চক্রাৎ সম্পাদ্যতে জ্ঞানং জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ প্রপদ্যতে।"

চক্রসমূহ তত্ত্বসমন্বিত; ইহার সাধনাদ্বারাই সাধক ক্রমে পঞ্চতত্ত্ব, তন্মাত্রাতত্ত্ব, একাদশইন্দ্রিয়তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব ও চৈতন্যময় পুরুষতত্ত্ব, এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। তাহা হইলেই সাধক যোগিবৎরূপে জীবন্মুক্তিপদ লাভ করিয়া ব্রহ্মীভূত হইতে পারেন।

এক্ষণে সেই চক্র কি এবং তাহাদের অবস্থিত স্থান কোথায়? তাহাই তিনি বলিয়াছেন:—

"গুহ্যেলিঙ্গে তথানাভৌ হৃদয়ে কণ্ঠদেশকে।
ভ্রূমধ্যেঽপি বিজ্ঞানীয়াৎ ষট্‌চক্রন্তু ক্রমাদিতি॥"

১। গুহ্যদেশে—'মূলাধার', ২। লিঙ্গস্থানে—'স্বাধিষ্ঠান', ৩। নাভিদেশে—'মণিপুর', ৪। হৃদয়ে—'অনাহত', ৫। কণ্ঠদেশে—'বিশুদ্ধ' এবং ৬। ভ্রূমধ্যে—'আজ্ঞা' নামক ষট্‌চক্র বিদ্যমান আছে। সাধনার জন্য এই ছয়টী চক্রই সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইলেও, সহস্রার বা চক্রাতীত চক্র লইয়া সপ্তচক্রই শাস্ত্রে ও গুরুমুখে সাধারণ ভাবে নির্দ্দিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়া থাকে। 'জ্ঞান-প্রদীপে', 'গীতাপ্রদীপে' ও 'পূজাপ্রদীপের' মধ্যেও এই চক্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, সাধক তাহাও এই সঙ্গে দেখিয়া লইবে।

মেরুদণ্ড ও সুষুম্নাদি নাড়ী-তত্ত্ব—জীবশরীরস্থিত গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে সার্দ্ধতিন লক্ষ নাড়ী বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশনাড়ী মুখ্যা বা শ্রেষ্ঠা, তাহা শ্রীসদাশিব শিবসংহিতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃসন্তি দেহান্তরেনৃণাম্।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥"

সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বিকা, কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী এই চতুর্দ্দশটী প্রধানা নাড়ী। ইহাদের মধ্যে আবার ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না শ্রেষ্ঠা। আবার এই তিনটীর মধ্যে সুষুম্নাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও যোগবল্লভা বলিয়া কথিতা, অন্যান্য সকল নাড়ীই সর্ব্বদা এই সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"তিস্রস্বেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগবল্লভা।
অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বানাড্যঃ সন্তিহি দেহিনাম্॥"

ষট্‌চক্র বোধের জন্য এই নাড়ী তিনটার জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। ষট্‌চক্র সম্বন্ধে বহুতন্ত্র ও যোগশাস্ত্রসমূহের মধ্যে বিশদও জটিল বা সাঙ্কেতিক ভাবে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ আছে, সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে আবশ্যক মনে করি না, কেবল তাহার সার মর্ম্ম ও ক্রিয়োপযোগী বিষয়গুলির মর্ম্মার্থ এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। সাধনাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই "শ্রীগুরুপাদুকা কমল" দৃঢ় ভক্তিযোগে চিন্তাপূর্ব্বক বিশেষ মনোযোগসহকারে এই অংশ আলোচনা করিলে সহজেই ষট্‌চক্ররহস্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

'সাধনপ্রদীপে' (প্রথম খণ্ড তন্ত্ররহস্যে) বর্ণিত সাত্ত্বিক বা দিব্য ভাবানুগত পঞ্চমকারতত্ত্বের তৃতীয়তত্ত্ব 'মৎস্যসাধনার' বিষয় পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। সে স্থলে উক্ত হইয়াছে :—

"ইড়া ভাগীরথীগঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী॥"

সাধক নিজ দেহাভ্যন্তরস্থিত সুষুম্নানাড়ীরূপা উক্ত নদীত্রয়ের কথা একবার মনে কর। এই নাড়ী তিনটী মূলাধার চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেবল সুষুম্নাটী তাহারও উর্দ্ধে শেষ ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

মানব দেহের মধ্যে সুমেরুপর্ব্বত বা মেরুদণ্ড অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে 'শিরদাঁড়া' বলে ('পূজাপ্রদীপে'—'শক্তিতত্ত্ব—ধ্যানরহস্য' অংশে সুমেরুপর্ব্বত ও উমা বা হৈমবতী অংশ দেখ)

পদদ্বয়ের বা উরুসন্ধির উপর হইতে অথবা মলদ্বারের কিঞ্চিৎ উপর হইতে পৃষ্ঠদেশের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া যে অস্থিশ্রেণী দণ্ডাকারে ঊর্দ্ধলম্বভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহার উপর মানবের মস্তক বা মুণ্ডটী রক্ষিত আছে, সেই মেরুদণ্ডমধ্যে বরাবর একটী গুপ্ত বা সাধারণ চক্ষে অদৃশ্য একটী রন্ধ্র বা ছিদ্রপথ আছে। জীবিত অবস্থায় তাহা মজ্জা নামক দৈহিক এক প্রকার ধাতু বা পদার্থের অন্তর্গত হইয়াই অবস্থান করিতেছে।

সপ্তধাতু:—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—মানবদেহ 'পঞ্চভূত—সঙ্ঘাত', এক্ষণে আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে হইলে, সেই পঞ্চভূত যে 'সপ্তধাতু' সহযোগে পরিপুষ্ট, তাহাও সাধকের জানিয়া রাখা প্রয়োজন। সপ্তধাতু যথা—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। মানব মাত্রেই নিজ নিজ দেহরক্ষার্থে যাহা কিছু উদরস্থ করে, তাহা চর্ব্বিত ও লালাযুক্ত হইয়া উদরমধ্যস্থিত আন্ত্রিক ক্রিয়াবলে, প্রথম ধাতু—'রসে' পরিণত হয়। তাহা যথাক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম ও মল অংশ বিভক্ত হইলে উহার মল অংশ ক্লেদন নামক 'কফে', সূক্ষ্ম অংশ 'রসেরই পুষ্টি' এবং স্থূল ভাগ যকৃত ও প্লীহাদি হইয়া ক্রমে দ্বিতীয় ধাতু—'রক্ত' রূপে পরিণত হয়। এই ভাবে রক্তও তিন অংশে বিভক্ত হইলে, উহার মল অংশ 'পিত্ত', সূক্ষ্ম অংশ 'রঞ্জক' রূপে শরীরের রক্ত এবং স্থূল অংশ ক্রমে তৃতীয় ধাতু—'মাস' রূপে পরিণত হয়। মাংসও এই ভাবে মাসাংশ কর্ণ প্রবাহে কর্ণমল, সূক্ষ্মাংশ মাংসের পুষ্টি এবং স্থূলাংশ চতুর্থ ধাতু—'মেদে' পরিণত হয়। এইরূপে মেদও ত্রিঅংশে বিভক্ত হইলে, মলাংশ 'স্বেদস্রোত' সূক্ষ্মাংশ উদর মধ্যে অবস্থিত হইয়া মেদের পুষ্টি এবং স্থূলাংশ পঞ্চম

ধাতু—'অস্থিতে' পরিণত হয়। এই ভাবে অস্থির মলাংশ নখ, স্তন ও লোম, সূক্ষ্মাংশ অস্থিসমূহের পুষ্টি এবং স্থূলাংশ ষষ্ঠধাতু—'মজ্জায়' পরিণত হইয়া থাকে। মজ্জাও এইভাবে ত্রিবিভাগে বিভক্ত হইলে—মলাংশ অশ্রু ও নেত্রমল, সূক্ষ্মাংশ মজ্জার পুষ্টি এবং স্থূলাংশ সপ্তম ধাতু—'শুক্রে' পরিণত হইয়া থাকে। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় শুক্রের মলাংশ নাই। ইহা কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল বিভাগমাত্রই আছে। স্থূলাংশ দেহস্থ শুক্রের পুষ্টি এবং সূক্ষ্মাংশ ওজঃরূপে কুণ্ডলিনীশক্তি স্বরূপ হইয়া তৈজসাত্মক সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে ও জীবের জীবদ্দশামধ্যে সমগ্রশরীরে তেজের বিকাশ করিতে থাকে। এই শুক্রধাতু স্ত্রী ও পুরুষ দেহ ভেদে যথাক্রমে আর্ত্তব ও শুক্র নামেই পরিণত।

কেহ কেহ মাংসও মেদ স্বতন্ত্র ধাতু না বলিয়া একই ধাতু বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা অষ্টম ধাতু ওজঃকে সপ্তম ধাতু বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। ওজঃ কিন্তু সপ্তধাতুর অতীত, সকল ধাতুর অন্তিম পরিণতি রূপ সারবস্তু বা শক্তিস্বরূপ অষ্টমধাতু। যাহা হউক উক্ত আহার্য্য সামগ্রীই জীবের দেহরক্ষা বিষয়ে উক্ত রূপে সহায়তা করে। শরীরবিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিবর্গ এ সকল বিষয় অতি বিশদরূপে অবগত হইলেও; সাধারণ সাধনাভিলাষী পাঠকের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রতি অস্থিখণ্ডের মধ্যে উক্ত পঞ্চম ধাতু মজ্জা বা তাহার 'শাঁস' রূপে বিদ্যমান থাকে। বড় মাছ অথবা পাঁঠার হাড়ের মধ্যেও তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। মনুষ্যদেহের পূর্ব্বকথিত মেরুদণ্ডাস্থির মধ্যেও সেইরূপ মজ্জা আছে, আবার সেই মজ্জার মধ্যেই ইড়া, পিঙ্গলা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতী নাম্নী 'সুষুম্না' নাড়ী বিদ্যমান আছে। ইহার

মধ্যে আরও কয়েকটী নলী বা অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা অথবা বিবর আছে। এক্ষণে সুষুম্না তাহাদেরই বহিরাবরণ বলিতে হইবে। সুষুম্নামধ্যে দ্বিতীয় অন্তর-নাড়ী বজ্রিণী, তদন্তর্গত অমৃতপ্রসারিণী চিত্রা-নাড়ী অবস্থিতা, ইহারই অন্তরে ব্রহ্ম-নাড়ী বিদ্যমান আছে *। ষট্‌চক্রস্থিত সমস্ত পদ্মই এই নাড়ীতে গ্রথিত বা সেই পদ্মগুলিই ইহার এক একটী গ্রন্থি বা গাঁইট স্বরূপ। ইড়া ও পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ীদ্বয় ইহার বাহিরে যথাক্রমে বামে ও দক্ষিণে হইয়া প্রতি চক্র স্থানে বেণীর ন্যায় জড়িত হইয়া গিয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য-বিদ্যায় অভিজ্ঞ শারীরতত্ত্ববীদ্ শবচ্ছেদন করিয়া বলিয়া থাকেন, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বলিয়া বা তাহাদের বর্ণনার অনুরূপ কোনও নাড়ী দেহমধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহারা স্থূলদর্শী, যোগসাধনালব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁহাদের আদৌ নাই, তাহার পর ইড়াদি তিন নাড়ী জীবনী-শক্তির সহিতই বিজড়িত, জীবনের বা প্রাণ-বায়ুর সহিত তাহাও দেহ হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফের স্থূল স্পন্দনরূপভাব যেমন হস্তের মণিবন্ধস্থিত নাড়ীতে অনুভূত হয়, তেমনই সূক্ষ্মভাবে মূলাধারাদি সূক্ষ্মযন্ত্রে তাহা যোগীরই অনুভাব্য। যদি কোনও জীবিত দেহ ছেদন করিয়া তাহার ক্রিয়ার সূক্ষ্মাবস্থা অনুসন্ধান করা কখনও সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে না হয়, কোন দিন যোগশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উক্ত নাড়ীত্রয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ-উক্তি বিচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করা যাইত। তাঁহারা চিরকাল শব ব্যবচ্ছেদই করিয়াছেন,

---

* 'পূজাপ্রদীপে'—'কুণ্ডলিনীপূজা' অংশ এবং 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'—'সুষুম্না' বিবরণ দেখ।

কিন্তু যোগিগণ গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াবলে শিবের ন্যায় আত্মদেহই ব্যবচ্ছেদ বা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। যাহা হউক তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য স্থূলতঃ এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই সকল নাড়ীর জ্ঞান একমাত্র যোগসাধনা দ্বারা অন্তরের অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং স্থূল দৃষ্টিতে শবদেহের মধ্যে ইহা পরিলক্ষিত হইবার নহে। তবে বাহ্য ভাবে বুঝিতে হইলে, এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, ইড়া ও পিঙ্গলার স্থূল ক্রিযা-দ্বারা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ু সহযোগে স্পন্দিত হইয়া যে সূক্ষ্ম নাড়ী-পথে যোগীর সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে তাহা অনুভব হয়, তাহাই ইড়া ও পিঙ্গলা; এবং সুষুম্না সম্পূর্ণ ভিতরেব জিনিস, তাহা প্রকৃত-সাধনা ব্যতীত কোনওরূপেই অনুভূত হয় না, বিশেষ তাহার বিবর এতই সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণসাহায্যেও তাহা পরিদৃষ্ট হইবার উপায় নাই। সুষুম্না বা সরস্বতী যে অন্তঃসলিলা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং পাঠকের বুঝা আবশ্যক যে, তাহার ক্রিয়া মাত্র সাধনায় অনুভব দ্বারা উপভোগ্য একটী অপূর্ব্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্তরের স্পন্দনমাত্র। বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন ছিদ্র না থাকিলেও, যেমন তাহার ভিতরে ভিতরে সাধারণের কোন অজ্ঞাত পথে বিদ্যুতের ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে, সুষুম্নার কার্য্যও ঠিক সেই ভাবে সেই মজ্জার অন্তরে একটী অতি সূক্ষ্ম মৃণাল-তন্তুরও এক-শতাংশ পরিমিত সূক্ষ্মতম পথে তাহার ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাকে কতকটা 'সাহানুভাব্য' (Sympathetic) বিষয় বলা যাইতে পারে। সাক্ষাৎ ভাবে বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও, তাহার ভাবনাদ্বারা যেমন অনেক সময় তাহার কার্য্য হইয়া থাকে;

অর্থাৎ কোনও সুস্বাদু বা অত্যন্ত রুচিকর অম্ল-সামগ্রী (যেমন আম্রের 'আচার', 'কাসুন্দি', 'তেলআম', 'টোপাকুলেরআচার' ইত্যাদি কোনও জিনিস) সম্মুখে না থাকিলেও কেবল তাহার পুনঃ পুনঃ স্মরণ বা মনের চিন্তামাত্রেই যেমন জিহ্বায় লালার সঞ্চার হয়, ষট্‌চক্র-নির্দ্দিষ্ট সুষুম্না-পথেও সেইরূপ সাধকের সাধন-ক্রিয়া-নির্দ্দিষ্ট অবিরত ধ্যান বা চিন্তার দ্বারাই প্রথমে তাহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; তবে শবচ্ছেদনদ্বারা তাহার যে কোনই অস্তিত্বের স্থান মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, তাহা নহে, মেরুদণ্ড-মধ্যে স্থানে স্থানে ভাবপ্রবাহক নাড়ীসমূহের বাহ্য-গ্রন্থির (Plexus) সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে।

বাহ্য-গ্রন্থি বা 'প্লেক্সাস্' (Plexus) সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, ইহাদের আশ্রয়রূপ সাহানুভাব্য নাড়ী-(Sympathetic nerve) 'সিম্প্যাথেটিক নার্ভ' বিষয়েও কিছু বলিতে হয়। এই নাড়ী-মণ্ডলই পূর্ব্বকথিতজীবের পৃষ্ঠদণ্ড বা শিরদাঁড়ারূপে মেরুদণ্ডকে সতত অবলম্বন করিয়া আছে। মেরুদণ্ড (Spinal column বা Vertebral column), মেরুপর্ব্বত বলিয়াও ইহা অভিহিত, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ইহা জীবভূতের সূক্ষ্ম আধারদণ্ড স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের গূঢ় আধারভূত স্থূলরূপে কশেরুকা নামক ২৪ চব্বিশখানি সছিদ্র অস্থিদ্বারা (কতকটা বংশদণ্ডের পর্ব্বের ন্যায়) উপর্য্যুপরি শ্রেণীবদ্ধভাবে 'পর্ব্ববৎ' গ্রথিত বলিয়াই যোগ-শাস্ত্রে ইহাকে পর্ব্বত, যোগপর্ব্বত, কুলপর্ব্বত বা সুমেরুপর্ব্বত আদি নামে উক্ত হইয়াছে। ইহারই উপরে মানবের উত্তমাঙ্গ বা মুণ্ডটী বিচিত্রভাবে স্থাপিত। মুণ্ডমধ্যে ঘৃতাকার

পদার্থ বিশেষ যাহা জীবের মস্তিষ্করূপে সদা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা এই কশেরুকাগুলির অন্তরস্থিত ছিদ্রপথে পূর্ব্ববর্ণিত ষষ্ঠধাতু মজ্জারূপে কতকটা স্ত্রীলোকের মাথার বেণী অথবা যেন গোপুচ্ছের ন্যায় নিম্নদিকে নামিয়া আসিয়াছে। উক্ত ২৪ চব্বিশখানি অস্থির মধ্যে মুণ্ড হইতে নিম্নদিকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের প্রথম ৭ সাতখানি অস্থিকে 'সপ্তগ্রীবা-কশেরুকা' (Seven vertebra of neck) বলে, যোগশাস্ত্রোক্ত ষষ্ঠ 'আজ্ঞা-চক্র' নির্দ্দেশক গুপ্ত স্থান হইতে পঞ্চম 'বিশুদ্ধচক্রের' নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত অবস্থিত। দ্বিতীয় ঐ 'বিশুদ্ধাখ্য' হইতে 'মণিপুর' নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ পর্য্যন্ত তাহা নিম্ন নিম্নক্রমে ১২ বারখানি অস্থিকে 'দ্বাদশপৃষ্ঠকশেরুকা' (Twelve dorsal vertebrae) বলে। তৃতীয় 'মণিপুর' স্থান হইতে 'স্বাধিষ্ঠান' প্রদেশ পর্য্যন্ত পরপর নিম্নদিকে পাঁচখানি অস্থিকে 'পঞ্চকটীকশেরুকা' (Five lumber vertebrae) বলে। ইহার নিম্নে 'ত্রিকাস্থি' (Sacrum) নামে আর একখানি অস্থি আছে। এই অস্থিখানি শৈশবাবস্থায় পাঁচখানি অপুষ্ট কশেরুকাকারে বিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর মিলিয়া একখানি অস্থিতেই পরিণত হয়। ইহারও নিম্নে আরও একখানি গ্রন্থিল (কোকিলচঞ্চুর ন্যায়) ক্ষুদ্র অস্থি আছে—তাহাকে 'অনুত্রিকাস্থি' বা পিকচঞ্চু অস্থি (coccyx) বলে। ইহাও ঐরূপ মানবের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে চারিখানি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপুষ্ট অস্থির সমন্বয়ে ক্ষুদ্র "স্ক্রু প্যাচের" ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইয়া একখানি অস্থিতেই পরিণত হয়। ইহারই নিম্নপ্রান্তে মেরুদণ্ডের সীমা শেষ হইয়াছে এবং মেরুদণ্ডের এই শেষ প্রান্তকেই গুপ্ত 'মূলাধার' স্থান বলা হইয়া থাকে। ('সংগীত প্রদীপে'—

'নাদতত্ত্ব' বর্ণন প্রসঙ্গে মূলবীণাদণ্ড ও তাহার নাদাধার বিষয়ে বিস্তৃত তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে।)

যাহা হউক মূলাধারান্তক এই ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থি একত্র যেন নিম্নমুখী একখানিমাত্র ত্রিকোণ অস্থিতেই পরিণত হইয়াছে। মানবের গ্রীবার সন্নিউপরের অস্থি হইতেই এই সর্ব্বনিম্ন আস্থর মধ্য দিয়া যে, একটী ছিদ্র আছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাও প্রায় ত্রিকোণাকার বিশিষ্ট। তাহারই মধ্যাস্থিত মস্তিকাংশ-রূপ মজ্জার অন্তরে অন্তরে সেই ত্রিকোণ ছিদ্রের প্রতীচীন বা পশ্চাৎদিক ধরিয়া সুষুম্নামার্গ অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় বিদ্যা-রূপিনী হইয়া অলক্ষ্যে পরিচালিত হইয়াছে। আর উহার উভয় পার্শ্বে দুই কোণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ও উক্ত মেরু-দণ্ডের বাহিরে সম্মুখদিকের দুই পার্শ্ব দিয়া যে নাড়ীদ্বয় বিলম্বিত রহিয়াছে, উহাদেরই সাধারণ নাম 'সাহানুভাব্য' নাড়ী (sym-pathetic nerve)। এই নাড়ী দুইটীরই অন্তর্নিহিত অব্যক্ত শক্তি অতি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হইয়া স্বভাবতঃ বাহিরের বিভিন্ন স্থূলনাড়ীর মধ্য দিয়া দেহস্থিত প্রত্যেক স্নায়ু ও পেশী ভেদপূর্ব্বক ক্রমে বিশেষভাবে হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ প্রাণহৃদয় ও ধমনীগুলির উপর, পরে অন্ত্র ও শিরা আদি যন্ত্রসমূহের ক্রিয়াশক্তি অনুলোমভাবে অবাধে প্রদান করে। সহসা সে বেগ, সে স্পন্দন, জীব যেন সংযত করিতে অসমর্থ। জীবের জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ম্মসংস্কার জাত প্রারব্ধবশে ইহাদের ক্রিয়া যেন আপনাআপনি সম্পন্ন হইতে থাকে ও প্রারব্ধকাল ক্ষয় হইলেই ইহাদের লৌকিক প্রবাহমান ক্রিয়া আপনাআপনি বন্ধ হইয়া যায়। তখন সমস্ত দৈহিক যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, তখনই

জীবের মৃত্যু হয়। সাধক শ্রীগুরু নির্দ্দিষ্ট সাধনার অলৌকিক ক্রিয়া অর্থাৎ বিলোম বা বিপরীত ক্রিয়াবশেই ইহাদের সেই স্বাভাবিক কর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করিয়া নিবৃত্তির দিকে প্রবাহিত করে, ইহাকেই যমুনার 'উজন' বা 'উযান' বহা বলে। পরে এই কথার তাৎপর্য্যও বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী তিনটী প্রধানা নাড়ীর কথা বলা হইয়াছে; তন্মধ্যে সুষুম্নাটী অন্তঃসলিলারূপ সরস্বতী-রূপিনী এবং ইড়া ও পিঙ্গলা বাহিরে প্রকটা বা তাহার ক্রিয়া বাহিরে শ্বাসগতিরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। বামদিক দিয়া ইড়া শুভ্রা ভাগিরথী গঙ্গারূপে সূক্ষ্মভাবে যেন সুশীতল-চন্দ্রকিরণ-বৎ হইয়া প্রবাহিতা এবং দক্ষিণ দিক দিয়া পিঙ্গলা শ্যাম ধূসরাঙ্গী বা স্বনাম সুলভা শ্যাম পিঙ্গলবর্ণা যমুনারূপে যেন উষ্ণস্পর্শ সৌর-কিরণবৎ হইয়া প্রবাহিতা রহিয়াছে, কিন্তু উভয়েই সুষুম্নার সহিত হৃদয়াদি পঞ্চ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে যেন বেষ্টন দিবার ছলে এক একবার বাধ্য হইয়াই বিভিন্নমুখী হইয়াছে ও পরস্পরের শক্তির আদান প্রদান বা পঞ্চতত্ত্বের সমতা রক্ষার সুবিধা করিয়া লইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে ক্রিয়া স্থূল ও স্বাভাবিকভাবে অনুভূত হয়, তাহাতে সেই বিদ্যারূপিনী অনাদি মহামায়ার দুইটী স্বরূপ 'জ্ঞান' ও 'শক্তিরই' প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ('পূজাপ্রদীপের' পরিশিষ্টে 'শক্তিতত্ত্ব-ধ্যানতত্ত্ব' দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে)। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মেরুপর্ব্বতগাত্রে উক্ত নদীস্বরূপা নাড়ী দুইটী যাহা 'সাহায্যভাব্য' নাড়ী বলিয়াই এই প্রসঙ্গে উক্ত হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে ইহা তাহাদের স্থূল বিকাশমাত্রই বলিতে হইবে, নতুবা সাধারণ

দৃষ্টিতে তাহার দর্শন আদৌ হইবার নহে। স্থূলতঃ ঐ নাড়ী দুইটী যে অন্যান্য সকল নাড়ীরই সমষ্টি সম্ভূত বা অন্য নাড়ীসমূহ ইহা হইতেই বিনিঃসৃত তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। তবে এই দুইটী প্রবাহের মধ্য দিয়াই একটী বহির্মুখী 'ক্রিয়াশক্তি' প্রদায়ক, অন্যটী অন্তর্মুখী 'জ্ঞান বা বোধশক্তি' প্রদায়ক রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক, বাহিরের বিষয় পঞ্চকের বিকাশে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পথে তাহাদের বোধ মস্তিষ্কে পৌছাইয়া দেয়; অন্য, সেই বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপর পৌছাইয়া দেয়। ইহাই জীবের এই গুপ্ত দুইটী নাড়ীচক্রের সাধারণ বা অনুলোম অথবা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্রিয়া, কিন্তু সাধক গুরুপদিষ্ট গূঢ় সাধনাদ্বারা সেই স্বাভাবিক ক্রিয়াকেই প্রতিলোম বা বিলোম ক্রিয়াদ্বারা নিবৃত্তির দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে। সেই নিবৃত্তির ক্রিয়া-জ্ঞানলাভের উপায়রূপে যাহা কিছু অনুষ্ঠানকার্য্য সম্পাদন করিতে হয় সে সমস্তই এই তৃতীয় নাড়ী বা সুষুম্নাপথে কুণ্ডলিনী শক্তি-সহযোগে সম্ভব হইয়া থাকে ('পূজাপ্রদীপে' "অন্তর্ভূতশুদ্ধি" দেখ)।

অতএব বুঝা যাইতেছে—'ইড়া বা গঙ্গা' বোধরূপিনী; পিঙ্গলা' বা 'যমুনা', শক্তিস্বরূপিনী এবং 'সুষুম্না' বা 'সরস্বতী', অগ্নিময়ী মুক্তিপ্রদায়িনী। ('পুরশ্চরণপ্রদীপে'—পরিশিষ্ট অংশে ইহাদের কর্ম্ম-প্রণালী দেখ।)

কাশীধামে গঙ্গা সদাই উত্তরবাহিনী ('কাশ'-অর্থে দীপ্তি বা প্রকাশ এবং 'ইন' অর্থে—আছে, অর্থাৎ যাহাতে প্রকাশ-দীপ্তি

আছে, তাহাই 'কাশী'), জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদি 'গঙ্গা', সাধকের জ্ঞানপ্রবাহ দীপ্তিময়ী 'নিজবোধরূপ' ব্রহ্মশক্তির প্রকাশাত্মক অন্তরভূমি সেই 'কাশীতে' উপনীতা হইলেই, তিনি অমনি কলকলনিনাদিনী 'ইড়ারূপিনী' হইয়া বিপরীত মুখে উত্তরবাহিনী হইয়া থাকেন। (পূর্ব্ব দিকে বা বিশ্বপ্রকাশক সূর্য্যের সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইলেই, উত্তর দিকটা দর্শকের বাম দিকে পড়ে, আবার 'বাম' অর্থে যে 'প্রতিকূল', অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিপরীত ভাব বা নিবৃত্তির পথ, তাহা পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে) সেই উত্তরস্থিত ধ্রুব-তারকাবিন্দু বা নিশ্চয়াত্মক নিত্য ও সত্যস্বরূপ একমাত্র অখণ্ডবিন্দু বা ব্রহ্মবিন্দুর দিকে যখন সাধকের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয় বা সাধকের প্রবৃত্তি প্রবাহ মন্দীভূত হয়, তখন জ্ঞানের লৌকিক বা সাধারণ গতি বিপরীত বা 'উত্তর' অথবা উর্দ্ধদিকেই পরিচালিত হইয়া থাকে।

এইভাবে দ্বাপরান্তেও একবার যমুনায় 'উজান' বহিয়াছিল বা প্রতি 'দ্বাপরান্তেই' যমুনা নিয়ত উজানেই বয়।

('দ্বি' অর্থে—'দুই'+'পর' অর্থে—'প্রধান'—'ই' স্থানে 'অ'—দ্বাপর; যখন 'দুইটাই প্রধান' বলিয়া মনে হয়। দূর হইতে কোন স্থাণুভূত বৃক্ষ অর্থাৎ শাখাপ্রশাখাহীন বৃক্ষের স্কন্ধ বা গাছের গুঁড়ি দেখিয়া উহা 'স্থাণু' কি 'পুরুষ' অর্থাৎ গাছের গুঁড়ি না মানুষ, ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, এই সন্দেহ-জনক অবস্থায় যখন দুইটাই 'প্রধান' বলিয়া মনে হয়, তখনই 'দ্বাপর', আবার যখন দুইটী যুগের পর বলিয়া ওতৃতীয় যুগ 'দ্বাপর' নামে অভিহিত) সেই 'দ্বাপরের অন্তে'—'ভক্ত-ভগবানের' অথবা প্রকৃতি-'পুরুষের' ভেদাত্মক দ্বৈতভাবময় সংশয়ের অবসানে,

সাধকের সাধনা পুষ্টিরূপ তাহার অন্তরের তৃতীয় অবস্থায় বা 'যুগে' তিনি যে 'যুগল মিলনে' পরা ভক্তির আদর্শস্থাপনে আবির্ভূত হইলেন, তিনি যে সেই 'দ্বৈতাদ্বৈত' ভাবের লীলা-বিকাশে গো-গোপ-গোপিনী-সঙ্গে সখ্যভাবেই সাধকের অন্তরে দ্বি+পর বা দুই প্রধানের 'অন্ত' করিয়া এক বা একাকার করিতেই যে প্রকট হইলেন। তাঁহার সেই সপ্তস্বরা শব্দ-ব্রহ্মের মোহিনীশক্তি প্রণবঝঙ্কারে বা বংশীনিনাদরূপে যখন সাধকের কানের ভিতর দিয়া গুপ্ত-অনাহতরূপ মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে, তখন তাহার অন্তর-বৃন্দাবনে সেই হৃদয়নাথের চরণ-স্পর্শে সূর্য্যোদ্ভবা উষ্ণপ্রবাহিণী পিঙ্গলারূপিনী যমুনাও উজানে বা উযানে (উ-যানে বা ঊর্দ্ধযানে অর্থাৎ বিপরীত গতিতে) প্রবাহিত হয়।

সাধকের স্বাভাবিক অন্তরের স্পন্দন আর পরিলক্ষিত হয় না। তখন অনন্ত সাগর-সঙ্গিনী স্নিগ্ধসলিলা গঙ্গার অঙ্গে তাহার তাপিত তনু (যমুনোত্তরীতে এক তপ্ত-উৎস বা প্রস্রবন হইতেই পবিত্র যমুনা নদীর উদ্ভব হইয়াছে, মূলে 'তাপ বা তপস্যাই' অথবা 'তপ্তমূল বিষাদই' সাধককে যোগ-সাধনার প্রথম উৎসব বা উৎসাহ ধারা প্রদান করে) মিশাইয়া দিয়া মুক্তিক্ষেত্র যুক্ত ত্রিবেণী 'প্রয়াগের' সৃজন করিয়া দেয়; তখনই সাধক সেই তীর্থরাজ-ত্রিবেণীসঙ্গমে নিমজ্জিত হইয়া তাহাদের সঙ্গমমধ্যে অন্তঃসলিলা সরস্বতী—বিদ্যারূপিনীর সাক্ষাৎ সন্ধান পায় ও তখনই 'আজ্ঞা বা অজ্ঞানচক্র' ভেদ করিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার সহানুভাব্য নাড়ীমণ্ডলীর স্বভাবক্রিয়া একেবারে বিলুপ্ত হয়। তখন বাহিরের ভাবতরঙ্গ আর তাহাদের স্পন্দিত করিতে পারে না। বাস্তবিক এই অভিনব অবস্থা উচ্চকর্ম্মী

সিদ্ধ সাধকের অনুভাব্য বিষয়, সাধারণ শরীর-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিছুতেই তাহার প্রত্যক্ষ স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবে না। তবে পরম করুণাময়ী চৈতন্যরূপিনী জীবের জীবনীশক্তি বা কুণ্ডলিনীশক্তিও নিত্য দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণে সেই ইড়া-পিঙ্গলার বায়ুগতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের একবার সামঞ্জস্য দেখাইয়া সুষুম্নার পথ খুলিয়া দেন। 'প্রাতঃ', 'মধ্যাহ্ন', 'সায়াহ্ন' ও 'মহানিশায়' সে ভাব সকল সাধকেরই কিছু না কিছু স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ইষ্ট সাধনায় সেই সেই 'সন্ধিক্ষণের' এত আদর।

যাহা হউক ইড়া পিঙ্গলারূপিনী নাড়ীদ্বয় সুষুম্না প্রদক্ষিণছলে পূর্ব্বকথিত মেরুদণ্ডস্থিত যে যে কেন্দ্র বা চক্রে ঘুরিয়া যান, স্থূল দৃষ্টিতে সেই মহানুভাব্য নাড়ীর বাহিরের ইঙ্গিতে কতকগুলি নাড়ী গ্রন্থি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সেই গ্রন্থিল স্থানগুলিই ঠিক গুপ্তচক্রস্থ প্রকৃত ভূমি নহে। 'নাভিকমল' ও 'হৃদয়কমলাদি' বলিলে, যেমন নাভিকুণ্ডল (Navel) বা হৃদয় (Heart) আদির বাহিরের পরিদৃষ্ট স্থান মাত্র নহে, তাহা মেরুদণ্ডের অন্তর্গত সেই মজ্জারও গূঢ়তম প্রদেশে অবস্থিত, তবে বাহ্যইঙ্গিতে উক্তরূপ না বলিলে তাহা একবারেই বুঝান যায় না, তেমনই উক্ত গ্রন্থিসমূহও সেই গুপ্ত সাধন-চক্রের যথার্থ স্থান নহে, তাহাও স্থূল ভাবে সেই অন্তর প্রদেশের আর এক ইঙ্গিত মাত্র। তবে তাহা যে, সেই গুপ্তস্থানের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম স্থান নির্দ্দেশক, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শরীর বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের ভাষায় সেই সকল স্থানের নাম নিম্ন-লিখিতরূপ জানিতে বা বলিতে পারা যায়:—১। 'মূলাধারচক্র'-

নির্দ্দেশক সর্ব্বনিম্ন প্রত্যক্ষ নাড়ী গ্রন্থি (Ganglion impar বা Coccygeal Plexus); এই ভাবে ২। 'স্বাধিষ্ঠান চক্র'-নিরূপক গ্রন্থি (Pelvic Plexus or Hypogastric Plexus of Sympathetic Nerve); ৩। 'মনিপুর চক্র' (Solar Plexus or Epigastric Plexus); ৪। 'অনাহত চক্র' (Cardiac Plexus); ৫। 'বিশুদ্ধাখ্য চক্র (Carotid Plexus); ৬। আজ্ঞা-চক্র' (Cavernous Plexus); 'পূজাপ্রদীপে' অন্তরভূতশুদ্ধি উপলক্ষে যে 'শৃঙ্গাটকের' কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ভাল করিয়া বুঝিবার স্থবিধা হইবে। মেরুদণ্ডের শেষ অংশ নিম্নদেশ অবধি যাহা গুহ্যদ্বারের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, সেই অস্থিখণ্ডের (coccyx) গঠন কতকটা মহিষ-শৃঙ্গের অগ্রভাগের ন্যায় স্থক্ষ্মমুখী ও তাহা সামান্য বাঁকিয়া ভিতরের দিকে বা গুহ্যদ্বারের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহারই নিম্নঅংশে সংযুক্তভাবে, অথবা লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বারের ঠিক মধ্যবর্ত্তীস্থলে উক্ত অস্থির নিম্নশেষ প্রান্তে অতি গুপ্ত ও স্থক্ষ্ম বিন্দুময় '**মূলাধার**' নামক পদ্ম আছে। ইহাকে কেহ কেহ 'আধারপদ্মও' বলিয়া থাকেন। এই আধার-পদ্মেরও আবার আধার আছে, তাহাও যোগীর জানিয়া রাখা আবশ্যক।

গুহ্যদ্বারের ঠিক উপরে দেহের আধার-শক্তিস্বরূপ 'কন্দর্প' নামক স্থিরতর গুপ্ত বায়ু আছে, তাহার মধ্যে অষ্টদল বিশিষ্ট একটী পদ্ম, সেই পদ্মের মধ্যে ষড়্দলবিশিষ্ট আর একটী পদ্ম তিনস্তরে উপরে উপরে সজ্জিত। এই তিনই গুপ্তভাবে আছে। সাধক, এই বিষয়ে বিশেষ ধ্যান দিতে না পারিলে ক্ষতি নাই।

ইহারই উপর পূর্ব্বকথিত আধারপদ্ম বা মূলাধারচক্র অবস্থিত রহিয়াছে, ইহা অরুণাভ চতুর্দ্দলবিশিষ্ট (পূজাপ্রদীপে ষট্‌দলকমলের চিত্র দেখ) ইহার চারিদলে যথাক্রমে বং শং ষং সং এই চারিটী সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট মাতৃকাবর্ণ আছে। পত্রচতুষ্টয়ে ক্রমশঃ বায়ু-কোণ হইতে নৈঋত পর্য্যন্ত যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বীরানন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধক তাহা চিন্তা করিবে। মূলাধারের মধ্যে সূক্ষ্মতর এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা যোগিগণ নানা জটিলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনার আবশ্যক নাই। মোটের উপর যাহার জ্ঞান ব্যতীত কুণ্ডলিনী জাগরণ করা সম্ভবপর নহে, কেবল তাহাই বর্ণন করিতেছি। উক্ত মূলাধার পদ্মের বীজকোষ সাতটী নীলবর্ণ বৃত্ত ভিতরে ভিতরে অবস্থিত, উহা সপ্ত-সমুদ্রের সূক্ষ্ম অনুকল্প মাত্র, উহাদের মধ্যস্থলে পীতবর্ণ লং বীজাত্মক চতুষ্কোণ পৃথ্বীমণ্ডলটী যেন সতত ভাসমান, তাহারই মধ্যে মেরুদণ্ডের অন্তর্গত সুষুম্না-নাড়ীর নিম্ন শেষপ্রান্তের সহিত পশ্চাৎমুখী কোণ যুক্ত হইয়া কাম-কলারূপিণী ত্রিকোণাকার শৃঙ্গাটক বা পানিফলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট মাত্র, যোনী বা অগ্নিমণ্ডল অবস্থিত, উহার কেন্দ্রস্থলে গোলাপ ফুলের ন্যায় লালবর্ণ সয়ম্ভূলিঙ্গ রহিয়াছেন, তাহারই গাত্রে বিদ্যুৎবর্ণ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় কুণ্ডলিনী শক্তি দক্ষিণাবর্ত্তে সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া বিরাজিতা রহিয়াছেন। সেই নিত্যানন্দস্বরূপিণী বিদ্যুল্লতাকারা চিৎশক্তিযুক্ত প্রকৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত, সদ্‌গুরুর কৃপায় এবং স্বীয় একাগ্রসাধনা ও পুণ্যবলেই

তাহা যোগিগণের বোধগম্য হইয়া থাকে। সেই সুষুপ্ত-সর্পাকারা কুণ্ডলিনীশক্তি লূতাতন্তুসদৃশ সূক্ষ্মা, কিন্তু বিদ্যুতেরন্যায় উজ্জ্বলা। ইঁহাকেই চৈতন্যযুক্ত বা জাগরিত করিতে হইবে। সাধক, এই মূলাধারচক্রে উক্ত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ ও কুণ্ডলিনীস্বরূপিণী মূলশক্তিকে যথাক্রমে ষট্‌চক্রের প্রথম শিব অর্থাৎ 'ব্রহ্মা' এবং 'সাবিত্রীরূপে' চিন্তা করিবে। ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টিকার্য্যেই পরব্রহ্মের অন্যতম সগুণস্বরূপ প্রথম শিব সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী-সহযোগে সতত বিরাজিত। এস্থলেও পরমযোগ বা তদসম্ভূত পরমতত্ত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে অগ্রে তাঁহাকেই চিন্তা করিতে হইবে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, নাভিচক্র হইতে কুণ্ডলিনী-চৈতন্যের কার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রাণ ও অপান বায়ু নাভিস্থলে সর্ব্বদা বিচরণ করে। 'নাভিচিন্তা' ও 'নাভিলক্ষ্য' করিবার পর যোগী গুরূপদিষ্ট কোনরূপ প্রাণায়াম দ্বারা কুম্ভকসহযোগে সেই বায়ুদ্বয় একত্র করিয়া এইবার মূলাধারচক্রে প্রেরণ করিবে। ভস্ত্রকা বা জাঁতার মধ্যে বায়ু সঞ্চিত হইলে, তাহাতে চাপ দিবামাত্র সেই বায়ু যে কোন পথে বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করে, যখন যোগী ভস্ত্রকার মত প্রাণ ও অপান বায়ু একত্র করিয়া নাভি-দেশে রক্ষা করেন, তখন তথা হইতে নিম্নপথে মূলাধারচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে পথ আছে (সে পথের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে) সেই পথে মূলাধারে উপস্থিত হয় ও বারংবার প্রাণায়ামদ্বারা মূলাধারচক্রস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তির দেহোপরি পতিত হয়, তাহাতে উক্ত প্রাণায়াম চালিত উষ্ণস্পর্শ বায়ু সহযোগে কুণ্ডলিনী স্পন্দিতা হইয়া জাগরিতা হইয়া উঠেন, এবং সুষুম্না বা তদন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ীর মুখ যাহা তিনি এতকাল রোধ করিয়াছিলেন,

তাহা ছাড়িয়া দেন ও সেই পথে নিজেই উঠিতে আরম্ভ করেন। (সুষুম্নার বিকাশে কুণ্ডলিনীর সুপ্ত, প্রবুদ্ধ ও জাগরণ বিষয় 'পুরশ্চরণ প্রদীপের পরিশিষ্ট' অংশে দেখ।)

'তন্ত্ররহস্যের' প্রথমখণ্ডে 'সাধনপ্রদীপে' 'যন্ত্রতত্ত্ব' অংশে উক্ত হইয়াছে, মহাশক্তিযন্ত্র ত্রিকোণ-বিশিষ্ট; এক্ষণে মূলাধার চক্রান্তর্গত যন্ত্রও ত্রিকোণ বলা হইয়াছে। ইহার তিনটী কোণে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ী মিলিত হইয়া আছে। আবার তিনটীরই গতি কেন্দ্রমুখী হইবার কারণ একত্র হইয়া কেন্দ্রস্থলে ক্রিয়াশূন্য হইয়া পড়ে। যখন এই শিবের ক্রিয়াশূন্য অবস্থা হয়, তখনই তিনি স্বয়ম্ভুলিঙ্গস্বরূপ, এবং তাঁহার প্রকৃতি বা মায়া তাহাতেই সুপ্তভাবে বিজড়িত। ইহাই ব্রহ্মপ্রকৃতির স্থূল দৃশ্য বা জীবশিব মধ্যে জীবের জীবনীশক্তি। সাধক গুরুনির্দিষ্ট কুম্ভক-বেগদ্বারা প্রথমে সেই শক্তিকে জাগরিত করিয়া থাকে, অনন্তর তিনি জাগরিতা হইয়া প্রথম-শিবসহ-যোগে ব্রহ্মা ও সাবিত্রীরূপে সাধকের ধ্যানভূতা হন। এক্ষণে আর একটী কথা বলিবার আছে, শাস্ত্রে ষট্‌চক্রনির্দিষ্ট সকল পদ্মই নিম্নমুখে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ উক্ত আছে। সাধন-বলে সেই নিম্নমুখী চক্র বা পদ্মসমূহকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া লইতে হয়, কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভবপর হইবে? কোন কোন যোগী হঠযোগান্তর্গত ময়ূরাসন, শির্ষাসন বা অন্য কোনরূপ আসনসহ-যোগে তাহার ঊর্দ্ধমুখ করিবার ব্যবস্থা দেন। অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে, প্রকৃত উপদেশ ও হঠযোগ ক্রিয়ায় অসমর্থ সেরূপ দৈহিক শক্তির অভাবে তাহার প্রায় বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। সে সকল আসনের স্থূলভাব মস্তক নিম্নদিকে রাখিয়া

পদদ্বয় উর্দ্ধে রক্ষা করা। এই ক্রিয়া উপলক্ষে কেহ কেহ বা রজ্জুদ্বারা পদদ্বয় বৃক্ষের শাখায়, কেহ বা সেইরূপ অন্য কোনও উপায়ে অবস্থান করিয়া থাকে, আবার কেহ বা ব্যায়ামশিক্ষা-র্থীরন্যায় ভূমিতলে মস্তক রাখিয়া পদদ্বয় উর্দ্ধদিকে সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপরীতকারিণী মুদ্রার সাধন করিয়া থাকে, প্রকৃত ক্রিয়ার অভাবে ইহাদ্বারা অনেক সময় কুফল ফলিতেই দেখা যায়, কিন্তু আসল কথা, উক্ত চক্ররূপপদ্মগুলি উর্দ্ধমুখী করা। সদ্‌গুরু নির্দ্দিষ্ট গুপ্ত ক্রিয়াদ্বারা তাহা আপনিই হইতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায়, গাঁদা, গোলাপ বা অন্য কোনও ফুলগাছের গোড়ায় সার ও জলের অভাবে ফুলসহ গাছের ডগাগুলি সহসা যেন নমিয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়ে, আবার সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত জল ও সার পাইলেই তাহা সতেজ ও খাড়া হইয়া উঠে। যখন জলের অভাবে গাছ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রথমে তাহার অগ্রভাগ, তাহার কোমল পত্র, মুকুল ও ফুলগুলি ম্লান হইয়া যায়, তাহারপরই তাহা নমিয়া পড়ে, ক্রমে হয় ত শুষ্ক হইয়াও যায়; অর্থাৎ যে মৃত্তিকা তাহাতে এতদিন রস ও সার যোগাইতে ছিল, তাহা এখন আর সেরূপ যোগাইতে পারিতেছে না, অধিকন্তু ফুলগাছের গোড়ার মাটিটুকু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইবার কারণ, গাছেরও রস নিম্নমুখে বা বিপরীত পথে গাছের মূল দিয়াই আকর্ষিত হইয়া থাকে। ষট্‌চক্র-ধারণপর সুষুম্নারূপী লতাটীর অঙ্গও সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য বিহীন গৃহস্থ ব্যক্তির প্রায় সাধন-বারি সিঞ্চনের অভাবে সর্ব্বদাই ম্লান হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে সংবদ্ধ কমলগুলিও অতি ম্লানভাবেই সতত নিম্নমুখী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেহ পঞ্চভূতাত্মক এবং তজ্জাত পূর্ব্বোক্ত সপ্ত অথবা অষ্টবিধধাতু-সমন্বিত। সেই ১। রস, ২। রক্ত, ৩। মাংস, ৪। মেদ, ৫। অস্থি, ৬। মজ্জা, ৭। শুক্র, ও ৮। ওজঃ যথাক্রমে দেহের স্থূল হইতে সূক্ষ্মতম সারভূত সামগ্রী। অনেকেই হয় ত জানেনা যে, ৮০ আশি বিন্দু শোণিতের সার-সমষ্টি একটী বিন্দু শুক্র, সেই শুক্রবিন্দু ধারণ বা রক্ষা করাই বীর্য্য-ধারণ বা তাহাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অবলম্বন। সেই কারণ সকল শাস্ত্রেই ব্রহ্মচারীর আদর মাহাত্ম্য যথেষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, তবে যিনি কেবল নামেই ব্রহ্মচারী নহেন, অর্থাৎ প্রকৃত বীর্য্যধারী ব্রহ্মচারী, তিনি ত সততই সাক্ষাৎ তেজপুঞ্জ স্বরূপ গৃহীর আরাধ্য ও সাধু সন্ন্যাসী সকলেরই আদরের ধন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সেই ব্রহ্ম-চর্য্যের সার বস্তু শুদ্ধচিত্তে শুক্রধারণ করা। 'শুক্র' সাধারণতঃ দেহের মধ্যে নিজ হস্তের এক 'কোষা' পরিমিত বিদ্যমান থাকে, তাহার অযথা ক্ষয় বা ক্ষরণ হইলেই দেহস্থিত শোণিত হইতেই পুনরায় তাহা সত্বর পূর্ণ হয়, সুতরাং দেহের শোণিত ক্ষয় হইয়া দেহ যেমন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যায়, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শুক্র রক্ষিত না হইলে, তাহাদ্বারা যে বস্তু উৎপন্ন হয়, যাহাকে শাস্ত্রে ওজঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সুপুষ্ট শুক্রের অভাবে আর প্রয়োজন মত উৎপন্ন হইতে পারে না; সেই ওজঃই সমস্ত দেহের সার সামগ্রী বা জীবের জীবনীশক্তিস্বরূপ এ সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ওজঃ সার্দ্ধত্রিবিন্দুমাত্র সতত দেহের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, অযথা শুক্রের অধিক ব্যয় হইলে তাহা ক্রমে জীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া জীবের জীবনীশক্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইতঃ-

পূর্ব্বে মূলাধার চক্রান্তর্গত সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা অর্থাৎ সাড়ে তিন পাকে বেষ্টন করিয়া বিদ্যুৎপ্রভা-সমন্বিতা যে কুণ্ডলিনী-শক্তির কথা বলা হইয়াছে, এই সার্দ্ধত্রিবিন্দু বা সাড়ে তিন ফোঁটা ওজঃ-শক্তি হইতেই তাহা পুষ্ট হইয়া থাকে, অথবা স্থূল কথায় বুঝিতে হইলে সেই ওজঃশক্তিই কুণ্ডলিনীরূপিণী জীবের মহাশক্তি বা মহাপ্রকৃতিস্বরূপিণী জীবনীশক্তি। অযথা শুক্রক্ষয় হেতু তাহা সহজেই বিশীর্ণ ও ম্লান হইয়া পড়ে, সুতরাং দুর্ব্বল হইয়া স্বভাবতঃ নিদ্রাকাতর ও অলস হইয়া পড়িয়া থাকে, এবং সেই কারণ সুষুম্নানাড়ীও তাহা হইতে উপযুক্তরূপ পরিপোষক বা রসাদিস্বরূপ দৈবীশক্তি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ক্রমে শীর্ণ ও ম্লান হইয়া যায়, ফলে তদ্স্থিত কমলগুলিও নিম্নমুখী হইয়া কোনরূপে যেন শুষ্কবৎ হইতে থাকে। তাহাতে সহস্রদলাস্তর্গত ধীশক্তিও ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়ে। যাহাহউক ব্রহ্মচর্য্য-পুষ্ট সাধক, পূর্ব্বকথিত ক্রিয়া-সহযোগে মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করিয়া তাহাকে ব্রহ্মবিবরে প্রবেশ করাইতে পারিলে, পূর্ব্ববর্ণিত ফুলগাছের ন্যায় উপযুক্ত রস ও সার-প্রাপ্ত হইয়া সকল কমলই ক্রমে খাড়া হইয়া উঠিবে, ধারণা, ধী ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হইবে, সুতরাং উর্দ্ধপাদ হইয়া ইচ্ছাকৃত বৃথা কর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে হইবে না। অনেক যোগী গুরুনির্দ্দিষ্ট যোগানুষ্ঠান করিয়াও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারেন না, পরিশেষে যোগাঙ্গের উপর শ্রদ্ধা ও আস্থাহীন হইয়া পড়েন। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহারা যন্ত্র-চালিতেরমত কেবল শুষ্ক ক্রিয়াগুলিই সাধনা করেন, উদ্দেশ্য ছাড়িয়া উপায়গুলি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য, যম বা সংযম ও নিয়মাদি রক্ষায় সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া থাকেন।

গৃহীর পক্ষেও যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা শাস্ত্রবিধি আছে, তাহাও অনেকের স্মরণ থাকে না। যোগানুষ্ঠানকালে বীর্য্য বা বিন্দু-ধারণ করিতে না পারিলে, কিছুতেই যোগসিদ্ধি হইবে না, তাই ভগবান বলিয়াছেন :—

"যোগিনস্তস্যসিদ্ধিঃস্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ।"

অর্থাৎ সতত বিন্দুধারণ করিতে পারিলেই যোগিগণের যোগ-সিদ্ধিলাভ হয়।

"যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্যাবিনশ্যতি।
আত্মক্ষয়ো বিন্দুহীনাদ্‌সামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষ্যো বিন্দুর্হিযোগিনা।"

সেই যোগসাধনার সময় যদি কেহ স্ত্রীসঙ্গ করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার বিন্দু বা বীর্য্যক্ষয় হইবে, সুতরাং তজ্জনিত সাধকের আত্মক্ষয় অর্থাৎ জীবনীশক্তি বা ওজঃশক্তির ক্ষয় হইবে। এবং সেই কারণ যোগীর সামর্থ্যও নষ্ট হইবে, অর্থাৎ কুণ্ডলিনী নিস্তব্ধা হইয়া পড়িবে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে যোগাভি-লাষী ব্যক্তি বীর্য্য ধারণ করিবে।

গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য-বিধি সম্বন্ধে 'সাধনপ্রদীপের' মধ্যে উক্ত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইতেছে যে, কৃতদার সাধক অপুত্রক হইলে সকল সময়েই-বিশেষ যোগাভ্যাস সময়ে প্রতিমাসে অতি সংযতভাবে ও পবিত্রচিত্তে একদিনমাত্র ঋতুরক্ষা করিতে পারিবে; আবার শাস্ত্রানুসারে এরূপ না করিলেও সাধকের পাপভাগী হইতে হয়। ('পুরশ্চরণ প্রদীপে'—'গৃহস্থ-দিগেরও ব্রহ্মচর্য্য্য রক্ষা' দেখ।) তবে গৃহী হইয়াও যাঁহারা

বিপত্নীক, ক্রিয়া-বিশেষদ্বারা তাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারেন বা সে বিষয়ে সতত লক্ষ্য রাখিবেন। মূলকথা, বীর্য্যধারণ ব্যতীত সকল সাধনাই 'ভস্মে—ঘৃতাহুতির' ন্যায় অনর্থক বলিয়া শাস্ত্রের এবং সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর উপদেশ। অনেক অনাচারী ভ্রান্ত সাধক, তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিকৃত তামসিকাচারকেই সাধনার সার-সামগ্রী বিবেচনা করিয়া 'পঞ্চমকারের' বাহ্য-অনুষ্ঠান-বাহুল্যে পঞ্চম বা শেষতত্ত্বে কতই যে অকথ্য নারকীয় ব্যাপার সাধন করিয়া ঘোর ব্যভিচারী হইয়া পড়েন, তাহার নির্ণয় নাই। অবশ্য তাঁহারা যে, সৎগুরুর সিদ্ধ-উপদেশাবলী আদৌ লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা স্থির নিশ্চয়। যোগমায়া মহাশক্তি মা আমার, কৃপা করিয়া তাহাদের সে অন্ধত্ব অপনোদন করিয়া দাও মা!

'সাধনপ্রদীপে' ও 'পূজাপ্রদীপে' পঞ্চ-মকারের সাত্ত্বিক-সাধনায় মৈথুনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাব প্রকৃত উদ্দেশ্য, অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইয়াছে, পাঠক, তাহা এখন একবার স্মরণ করিয়া দেখিবে যে, তাহার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা কত অধিক। বাস্তবিক বীর্য্যধারণ বা ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার মূলনির্দ্দিষ্ট একটী শ্রেষ্ঠ উপাদান। যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ, তাঁহারা বৃথা যোগাদি সাধন-ক্রিয়া করিতে অগ্রসর হইবেন না, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র—তাহাতে কোনরূপ ফল ত পাইবেনই না, অধিকন্তু যোগের সিদ্ধ উপদেশ ও ক্রিয়াসমূহে তাঁহাদের শ্রদ্ধা-হীনতা উপস্থিত হইবে। তাই যোগিগণ সাধারণ ভাষায় অনেক সময় বলিয়া থাকেন :—

"গৃহী হোকে বতায় জ্ঞান, ভোগী হোকে লাগায় ধ্যান।

যোগী হোকে ঠোকে ভগ্, তিনো আদ্‌মী মহাঠগ্ ।"

অর্থাৎ প্রথম—ঘোর সংসারী, স্বার্থপর ও সঞ্চয়ী এমন অনেক গৃহস্থ তাঁহারা সতত সংসারের প্রতিকার্য্যে কায়মনোবাক্যে অনুরক্ত, কোন কর্ম্মেই নিবৃত্তির লেশমাত্র নাই, অথচ কথায় কথায় তোতাপাখীর মত কত ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চতম দার্শনিক উপদেশসমূহ প্রদান করেন, গীতা, বেদান্তাদির টীকা লেখেন; দ্বিতীয়—ভোগলালসায় নিত্যনিরত, সকল সময়েই ভোগের মধ্যে যেন ডুবিয়া আছেন, ত্যাগের স্বপ্ন দেখিবারও শক্তি নাই, সংযম ও নিয়মাদি কোন প্রাথমিক কর্ম্মেই অভ্যাস নাই, পাঁচ মিনিট স্থির হইয়া বসিবার পর্য্যন্তও সামর্থ্য নাই, অথচ খেয়াল হইল পরমাত্মার ধ্যান করিতে হইবে; তৃতীয়—মুখে বলেন আমি যোগী, ক্রিয়াবান, সাধারণের নিকট নিজেকে পরমযোগী বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচয় দেন, অথচ ঘোর কামাসক্ত, ধর্ম্মের আবরণেও গোপনে গোপনে কেবল 'পঞ্চম' বা পঞ্চমকারের শেষতত্ত্ব সাধনাতেই অর্থাৎ স্ত্রীসহবাস করিয়া প্রায়ই বীর্য্যক্ষয় করে; এইরূপ তিনশ্রেণীর ব্যক্তিই যোগীদিগের নিকট মহাঠগ্ বা ঘোর আত্ম-প্রবঞ্চক বলিয়া প্রতিপন্ন। সুতরাং যোগ বা সাধনায় উন্নত হইবার ইচ্ছা থাকিলে, 'ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা' অবশ্য কর্ত্তব্য, যোগাভিলাষী সাধক, গৃহী অর্থাৎ সস্ত্রীক হইলেও, শাস্ত্রসম্মত-ব্রহ্মচর্য্য সাধ্যমতে রক্ষা করিতে যত্ন করিবে। নতুবা কুণ্ডলিনী-চৈতন্যাদি যোগের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবে না। গুরুপরম্পরাদিষ্ট মূলাধারচক্র ও কুণ্ডলিনী-বিষয়ে অতি গুহ্য কথাই বলিলাম, পাঠক, ভক্তিসহকারে এই সকল বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করিবে।

ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মূলাধারপদ্মের 'বীজকোষ' পীতবর্ণ লং বীজাত্মক, পৃথিবী-মণ্ডল-বিশিষ্ট। সাধক, আবার সেই বাহ্য-ভূতশুদ্ধির বিষয় স্মরণ কর। ('পূজাপ্রদীপে' ষটচক্র চিত্র ও তাহার বর্ণনা দেখ)। সেই সাগরমধ্যস্থিত দ্বীপ বা বাহ্য-পৃথ্বীতত্ত্বের ন্যায় লয়যোগাত্মক অন্তরভূতশুদ্ধি সাধনকালে দেহমধ্যস্থিত পৃথ্বীতত্ত্ব এই লং বীজাত্মক মূলাধারের বীজকোষ বা কুণ্ডলিনীর আশ্রয়স্থল এইবার লয় করিতে হইবে। বাহ্যভূতশুদ্ধিতে যে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ক্রমে আকাশে লয় হইয়া, সাধকের শূন্যময় আকাশ-জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে, সেই শূন্যের মধ্যেই বিলয়ীভূত তত্ত্বপঞ্চক বীজাকারে এতকাল অনুস্যূত ছিল বা এখনও রহিয়াছে, উচ্চতর সাধনায় বা লয়যোগ-বর্ণিত অন্তরভূতশুদ্ধির * প্রারম্ভেই তাহা সাধকের বোধগম্য হইবে। একদলা মিছরি বা ঐরূপ কোনও জিনিস প্রথমে জলে গুলিয়া দিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, মিছরির সে স্থূল অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, তাহা জলের সহিত মিলিয়া জলবৎ হইয়াছে, কিন্তু জলসহ মিশিয়াও বা জল হইয়াও, তাহার গুণ-ধর্ম্মের বিপর্য্যয় সাধিত হয় নাই, তাহার সে মিষ্টতার লোপ হয় নাই। সে মিষ্টতা স্থূলভাবেও যেমন ছিল, তরলভাবেও তেমনই আছে; সুতরাং জলমধ্যে তাহা যে এখনও বীজরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার পর অগ্নিসহযোগে অগ্নিবৎ হইলেও সে অগ্নির মধ্যেও যেমন মিছরি ও জল ঘনীভূতভাবে বর্ত্তমান থাকে, বাহ্যভূতশুদ্ধিকালে সেইরূপ পৃথ্বী ও জল অগ্নিতত্ত্ব মধ্যে ক্রমে বায়ু

* 'পূজাপ্রদীপে'—অন্তরভূতশুদ্ধি দেখ।

ও আকাশ পর্য্যন্ত স্থূলভাবে শূন্যময় প্রতীত হইলেও সূক্ষ্ম পরমাণু-স্বরূপ বীজরূপে সমস্তই তাহাতে বিদ্যমান থাকে। সেই বীজ অতীব ক্ষুদ্র হইলেও রস এবং উপযুক্ত আধার সংযুক্ত হইলে পুনরায় পূর্ণাবয়বে তাহা পরিণত হইতে পারে। একটী অশ্বত্থ বা বটবীজ বালুকাকণার ন্যায় ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মধ্যে যে ঐ অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ আর একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ অতিশয় সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত আছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেইরূপ বাহ্য ভূতশুদ্ধি-কালে সকল তত্ত্বই ক্রমে ক্রমে লীন হইলেও তাহার অন্তরে বীজাকারে বিদ্যমান থাকিবে। তাহাকেও লয় করিতে হইবে, নতুবা উক্ত বীজের ন্যায় তাহা অসংখ্যরূপে পুনরায় প্রকাশ হইতে পারে। অন্তর্লক্ষ্যের দ্বারা তাহা পরিলক্ষিত হইলেই, সাধকের 'অন্তর্ভূতশুদ্ধিরও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র—বীজ প্রথম অঙ্কুরাবস্থায় অশ্বত্থকে দুইটী অঙ্গুলির নিষ্পেষনেই যেমন নষ্ট করা সহজসাধ্য, কিন্তু একবার তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে, তাহার মূল আধারক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলে, আর সহজে তাহার মূলোচ্ছেদ করা সম্ভবপর নহে, সেই কারণ অন্তর্ভূতশুদ্ধিতে পৃথ্বীবীজ লং, বরুণবীজ বং এইরূপ মন্ত্ররূপে যাহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সাধক এই বীজাত্মক তত্ত্ব-মন্ত্র-গুলি অবলম্বনে ক্রমশঃ তাহাদের লয় করিতে করিতে উচ্চতর সাধন-সোপানে আরোহণ কর। এই সকল বিষয় সম্পূর্ণ গুরু-মুখগম্য, তবে ভাষায় যতদূর সম্ভব সরলভাবে ও সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। সাধক, ভক্তি ও মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে, সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

যাহাহউক, সেই 'পঞ্চপ্রাণ', 'মন', 'বুদ্ধি' এবং পঞ্চ পঞ্চ বিধ

'কর্মেন্দ্রিয়' ও 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' এবং এই সপ্তদশের আধার অপঞ্চীকৃত ভূতনির্মিত সূক্ষ্ম-শরীরে অধিষ্ঠিত তৈজসাত্মক জীবাত্মা যেন কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়াছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। এইবার 'যং' এই বায়ুবীজ উচ্চারণ করিয়া বাম-নাসিকায় বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক মূলাধারের নিম্নস্থিত 'কন্দর্পনামক' বায়ু যেন উদ্দীপিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে, অনন্তর 'রং' এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিলে কুণ্ডলিনীর চতুর্দ্দিকে পূর্ব্ব আকর্ষিত কন্দর্পবায়ুর সাহায্যে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, তাহার উত্তাপ দ্বারা এবং 'হুঁ' বীজ উচ্চারণ সহযোগে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়াছেন, এইরূপ ভাবনা করিবে। অনন্তর 'হং সঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা মূলাধার সংকোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্থাপন করিবে। ('পূজাপ্রদীপে' কুণ্ডলিনী পূজা অংশের ৫৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ক্রিয়াবিধি দেখিলে আরও সহজে অনুভব হইবে)। এই সঙ্গে গুরুমুখাগত হইয়া জালন্ধর, উড্ডিয়ান ও মূলবন্ধ মুদ্রাত্রয়ও অবলম্বন করিতে হইবে। এইভাবে কিয়দ্দিবসের সাধনায় দৃঢ়ব্রত ও ভক্তিপরায়ণ সাধক বেশ অনুভব করিতে পারিবে যে, 'কুণ্ডলিনী' জাগরিতা হইয়াছেন। পূর্ব্বে যিনি স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ-বেষ্টন করিয়াছিলেন, এখন তিনি সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মবিবরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে বা দ্বিতীয় চক্রে উঠিতে আরম্ভ করিবে।

সাধক, ইন্দ্রিয়াদির সহিত জীবাত্মা যে কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিবর-মুখ ছাড়িয়া দিয়া দৃঢ়া ভক্তিভাবে শ্রীগুরুপাদুকা স্মরণপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। এই সমস্ত ভাবনা দ্বারা সাধন ক্রিয়ায়

কতকটা অভ্যস্ত হইলে, কুণ্ডলিনীর ধীর স্পন্দন ও উর্দ্ধমুখে ব্রহ্ম-বিবরের মধ্যে তাঁহার সূক্ষ্মভাবে বিচরণ স্পষ্টরূপে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। প্রথমে গুহ্যদ্বারের পশ্চাতে মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রান্তে, ক্ষুদ্র পিপীলিকা বিচরণের ন্যায় 'সুড়্ সুড়্' করে, কতকটা সেইরূপ বুঝিতে পারিবে। তাহার পর জ্বরের তাপ নিরূপক যন্ত্রে "থারমামিটারে" যেমন তাহার অন্তর্নিহিত পারদ্ ক্রমে উঠিতে থাকে, মেরুদণ্ডের মধ্যে সেইরূপ পারদসদৃশ বিদ্যুদ্বর্ণ-বিশিষ্ট কুণ্ডলিনী যতদূর উঠিতে থাকিবে, ততদূর পর্য্যন্ত যেন বেশ সুখপ্রদ একপ্রকার 'সিড়্ সিড়্' ভাব সাধক অনুভব করিতে থাকিবেন, তখন শরীর রোমাঞ্চ ও স্পন্দিত হইবে, তাহাতে সাধকের হৃদয় ক্রমেই বিশুদ্ধ ও অপার্থিব কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে অভিভূত হইয়া যাইবে।

কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা এবং মূলাধার হইতে ক্রমে তাঁহাকে সমস্ত চক্রে পরিভ্রমণ করাইয়া সহস্রারস্থিত পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করা, ইহা 'লয়-যোগানুষ্ঠানের' একটী প্রধান কার্য্য। যিনি গুরুকৃপায় বহু পুণ্যফলে লয়-যোগান্তর্গত ভুজঙ্গিনী-রূপিণী কুণ্ডলিনীর সাধন করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ধন্য ও কৃতার্থ হয়েন। শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি এই লয়-যোগের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানপ্রদীপে' ১ম ভাগে ১৪৮ পৃষ্ঠায় 'লয়ক্রিয়া ও ব্যাসের সাধনক্রিয়ার' মধ্যে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও যে এইরূপ যোগাদি দ্বারাই উন্নত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যাঁহারা পূর্ব্বকথিত শক্তিমন্ত্রের উপাসনা দ্বারা ভূতশুদ্ধি বা 'কুণ্ডলিনী-উত্থাপন' করিবেন,

তাঁহারা উত্থাপনের সময় 'হংসঃ মন্ত্র' এবং নামিবার সময় 'সোহং মন্ত্র' উচ্চারণ করিবেন। এই আদেশ গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়া আসিতেছে। যাহাহউক এই সকল ক্রিয়া যতদূর সরলভাবে বলা সম্ভব, তাহা বলিলাম, ইহা অপেক্ষা গুহ্যপ্রক্রিয়া নিশ্চয়ই গুরুমুখগম্য জানিবে, তবে বুদ্ধিবান সাধক, একান্ত বিশ্বাস ও অচঞ্চল গুরুভক্তির ফলে পূর্ব্বকথিত ক্রিয়াবিধান হইতেই স্ব স্ব সাধনপ্রক্রিয়া বুঝিয়া লইতে পারিবে।

সাধক, পূর্ব্বকথিতভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া যং ও রং বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক পরে হংসঃ মন্ত্র উচ্চারণ-সহযোগে মূলাধার সঙ্কুচিত করিলে, মূলাধারস্থিত প্রথম শিব ব্রহ্মা, সাবিত্রী ও ডাকিনীশক্তিসহ (কোন কোন তন্ত্রে সাবিত্রীকেই ডাকিনীশক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) এবং চতুর্দ্দল মূলাধার পদ্মস্থিত সমস্ত দেবতা ও বং শং ষং সং এই মাতৃকাবর্ণ-চতুষ্টয় ও সমস্ত বৃত্তি, কুণ্ডলিনী-শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। মোটের উপর মূলাধারস্থিত সমস্ত পার্থিব ভাবসহ পৃথ্বী-তত্ত্বও তাহাতে বিলীন হইয়া লং বীজে অবস্থান করিবে। এইভাবে দেহান্তর্গত পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূতের অন্যতম পৃথ্বী-তত্ত্বের বীজ লয় হইয়া যাইলেই, কুণ্ডলিনী মূলাধারপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিবেন, তখন মূলাধারপদ্ম শূন্য, কাজেই তাহা ম্লান হইয়া অধোমুখে মুদিতাভাবে অবস্থান করিবে। সমস্ত চক্রেই সকল পদ্ম অধোমুখে মুদিতাভাবে থাকে, কিন্তু নিম্ন হইতে সাধনবারি ও শক্তিসার প্রদত্ত হইলে সকল পদ্মই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে যে কোন চক্র বা পদ্মে উপস্থিত করিতে পারিলেই, সেই পদ্ম তখনই ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ষট্‌চক্রস্থিত সকল পদ্মই অধোমুখে থাকে, তাহার কারণ, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার অভাবে ওজঃ ধাতুর পুষ্টি না হইলে, সংসারীর আত্ম বা আধ্যাত্মিকা-শক্তি হীনপ্রভা হইয়া পড়ে। শ্রীভগবান তাই সাধকগণের তৃপ্তির জন্য এবং সংসারী ও মোক্ষাভিলাষী যোগীদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপদেশদ্বারা 'সময়াতন্ত্রে' আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"তৎসর্ব্বং পঙ্কজং দেবি সর্ব্বতোমুখমেবচ।
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবঃসংস্থিতৌ॥
প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি।
প্রবৃত্তিভাব চিন্তায়ামধোবক্ত্রাণি চিন্তয়েৎ॥
নিবৃত্তির্যোগমার্গেন সদৈবোর্দ্ধ মুখানিচ।
এবমেব ভাবভেদাৎ—"

অর্থাৎ সেই পদ্মগুলি সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখী হইলেও, গৃহস্থ সাধক, সকল পদ্মই প্রবৃত্তি বা ভোগসাধনার ক্ষেত্র ভূ-তত্ত্ব অর্থাৎ পৃথ্বীতত্ত্বমুখী অথবা মূলাধার বা নিম্নমুখীই চিন্তা করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদের সকল ভাবই যে প্রবৃত্তির দিকে সতত টানিয়া রাখিয়াছে; আর যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট নিবৃত্তিপরায়ণ বা মোক্ষকামী, তাঁহারা সকল পদ্মই উর্দ্ধমুখে পরমাত্মা বা ব্রহ্মভূমি ব্রহ্মরন্ধ্রের উর্দ্ধদিকে সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত, এইভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন; কারণ তাঁহাদের প্রবৃত্তির যে নিবৃত্তি হইয়াছে, প্রবৃত্তি তখন সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন হইয়া তাঁহাদের পশ্চাতে পড়িয়া আছে; সুতরাং সাধকগণ স্ব স্ব ভাবভেদে পদ্মসকল উর্দ্ধ বা অধোমুখীরূপে চিন্তা করিবেন, কারণ ইহাই স্বাভাবিক বা সাধকজীবের প্রকৃতির অনুকূল।

এই মূলাধার পদ্মকে আবার 'প্রথম জ্ঞানভূমি' বা ভূলোক বলে। এখানে ব্রহ্মাধিষ্ঠিত সাবিত্রীর স্থান, জীবের সৃজন ও সাধন-ভজন সকলেরই মূল আধার এই স্থানে, সেই কারণ এই চক্রকে মূলাধার বলে। 'সাধনপ্রদীপে' যে নববিধ আচারের কথা বলা হইয়াছে, সাধক, সেটীও এখন একবার ভাবিয়া দেখিবে, সেই বেদাচারের আরম্ভ এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে; বেদপ্রকাশক ব্রহ্মা এই 'ভূলোকের' জন্যই চতুর্মুখে চারিবেদ বর্ণন করিয়াছেন। সেই কারণ 'বৈখরী' নাদানুভূতির স্থান এই মূলাধার চক্র। ('পুরশ্চরণপ্রদীপে' মন্ত্র-চৈতন্য অংশে 'চৈতন্য-রূপিনী কুণ্ডলিনী ও পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী নাদ-বিজ্ঞান' দেখ।)

স্বাধিষ্ঠানচক্র—মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নামার্গস্থিত মূলাধারের উপরে, নাভির নিম্নে প্রায় লিঙ্গমূলের নিকট বা যোনি-কুণ্ডের সমসূত্রপাতে ষট্‌চক্রনির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় বা স্বাধিষ্ঠানচক্র অবস্থিত। ইহা ষড়্‌দলবিশিষ্ট, পদ্মে কর্ণিকা রক্তবর্ণ ও পত্রসমূদায় বিদ্যুদ্বর্ণ-বিশিষ্ট। বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টী মাতৃকাবর্ণ ও ছয়টী বৃত্তি, যথা—প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা উক্ত পদ্মের ষড়্‌দলে অবস্থিত আছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যস্থিত ত্রিকোণ-মণ্ডলের মধ্যে ব্রহ্মের দ্বিতীয় শিব, নীলবর্ণ ও চতুর্ভুজ বিষ্ণু, এবং মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী দেবতাগণ আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিনীশক্তি রহিয়াছেন। ('পূজাপ্রদীপে' ষট্‌চক্র ও চিত্র দেখ) সাধনাভিলাষী পাঠক, এইবার আবার বহির্ভূতশুদ্ধির ভাব চিন্তা কর। এই স্বাধিষ্ঠান চক্র,

'বং' অর্থাৎ বরুণ বীজাত্মক। ইহার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণ-মণ্ডল ও মকরবাহন বরুণদেবতা বিরাজ করিতেছেন। বরুণ জলাধিপতি, সুতরাং তাঁহার রাজ্য জলধি বা মহাসমুদ্র। বহির্ভূতশুদ্ধির সেই অনন্তসাগরে মহাপ্রকৃতি কুণ্ডলিনী জীবাত্মা-সহযোগে লং বা পৃথ্বী-বীজাত্মিকারূপে এখানে অর্থাৎ এই স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা হইলেন; দেখিতে দেখিতে কুণ্ডলিনীর অঙ্কস্থিত সেই লংবীজ পৃথ্বীতত্ত্ব স্বাধিষ্ঠানস্থিত বরুণবীজে বা জলধিজলে বিলীন হইয়া গেল। অনন্তর এই স্থানের সমস্ত দেবতা সকল বৃত্তিসহ একত্রীভূত হইয়া সম্পূর্ণ বংবীজ বা জল-তত্ত্বরূপে কুণ্ডলিনীতে লয়প্রাপ্ত হইল। এইবার সেই মহাশক্তি ক্রমে তৃতীয় স্তরে উঠিবার উপক্রম করিল। সাধক, এইভাবে স্বাধিষ্ঠানচক্র-ভেদের বা সিদ্ধির চিন্তা করিবে। এই স্বাধিষ্ঠান-পদ্মকে 'দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি' বা ভুবর্লোক বলে। এখানে জগৎ-প্রতিপালক মহাবিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং এইস্থান হইতেই ভক্তির রসস্বরূপ মূল উৎস বা প্রস্রবণ উর্দ্ধপথে উজানে বহিতে আরম্ভ হয়। (উজানাদি বিষয়ক তত্ত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) সাধক, 'সাধনপ্রদীপে' বর্ণিত নবধা-আচারের কথা একবার মনে কর; 'বেদাচারের' পর 'বৈষ্ণবাচার-সাধনা' এইস্থান হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহা বৈষ্ণবাচার বা ভক্তি-সমদ্ভূত সাধনার স্থান এবং বিশ্বের ব্যাপক-চৈতন্যজ্ঞানের সহায়ক বৈধী গৃহীর পরমারাধ্য বা চিরারাধ্য সাংসারিক শান্তি-স্বরূপিণী লক্ষ্মী-সমন্বিত স্বয়ং বিষ্ণুর অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া ইহা 'স্বাধিষ্ঠানচক্র' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধনাধিকার মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তিকামনা

নাই, কেবল জন্মজন্মান্তর ভগবানের অনুরাগপূর্ণ সেবা, ইহাই এক্ষণে তাঁহাদের একমাত্র অভিলাষ। ইহা হইতে গর্ভাদি যাতনা ও ত্রিতাপ ভোগ নিবৃত্তি হয় না। যখন বৈষ্ণবের মুক্তিকামনা বলবতী হয় বা বৈষ্ণবাচারের সেবাব্রত সম্পন্ন হইয়া যায়, তখন মুক্তিকামী বৈষ্ণব বা সাধকের উন্নত রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হইতে প্রবল ইচ্ছা হয়, তখনই সাধিষ্টান চক্রের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে জানিতে হইবে।

মণিপুরচক্র—ষট্‌চক্রের তৃতীয় স্তর, নাভিমণ্ডল, মণিপুরচক্র। নাভির পশ্চাতেই বা নাভিমণ্ডল হইতে সমসূত্র-পাতে সেই মেরুদণ্ডমধ্য হইতেই সাধকের প্রথম চিন্তা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সাধক প্রথমেই সেই মণিপুরচক্র চিন্তা করিবার প্রকৃত অধিকার পায় না, কারণ মূলাধার হইতে ক্রমাগত উন্নত পথে না আসিলে, তাহা ত পরিদর্শন করিবার উপায় নাই, এখন সাধক ক্রমোন্নত সাধনাদ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষীত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এখন কেবল ভক্তিভাবে তাহার চিন্তা কর। পূজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার 'যোগদর্শনের বিভূতিপাদে' বলিয়াছেন :—

"নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্"—

অর্থাৎ নাভিচক্রে চিত্ত সংযত করিলে দেহতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। সেইকারণ লয়যোগের প্রধান লক্ষ্য 'নাভিচক্র,' তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং এই নাভিকমল হইতেই ষট্‌চক্র-চিন্তার সূত্রপাত করা হইয়াছে। একথা ইতঃপূর্ব্বেই শিবাদেশ-রূপে বলা হইয়াছে—'মন্ত্রের প্রাণস্বরূপ এই 'মণিপুর' সর্ব্বদা চিন্তা করিবে', 'ত্রিসন্ধ্যায় নিত্য মনোযোগসহকারে নাভিচিন্তা করিবে',

জপ-পূজাদির পূর্ব্বে এই নাভিকমলেই কামিনীদেবীর প্রথমে ধ্যান করিতে হয়। ('পূজাপ্রদীপে' ১৮৪ পৃষ্ঠায় 'কামিনীদেবীর ধ্যান' অংশ দেখিলে সহজে বোধগম্য হইবে)। এক্ষণে ইহার অন্তরস্থ সুষুম্না-দণ্ডস্থিত 'মণিপুর পদ্মের' * কথা বর্ণিত হইতেছে।

'মণিপুর পদ্ম' মেঘবর্ণ ও দশটী দলবিশিষ্ট, ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশটী নীলবর্ণবিশিষ্ট মাতৃকাবর্ণ, তৎসহ লজ্জা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা ও ভয় আদি দশটী বৃত্তি এবং ধাত্রী, বহ্নিরূপা, স্বধা, স্বাহা, অপর্ণা, মহাদেবী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, সেই দশটী দলে যথাক্রমে অবস্থিত আছে; ইহার কর্ণিকার মধ্যে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল আছে, তাহাতে রং বা বহ্নিবীজ এবং তাহার প্রতিপাদ্য মূর্ত্তি মেঘবাহন সূর্য্যস্বরূপ বিদ্যুৎসম তেজঃ দেবতা বা মেষবাহন-চতুর্ভুজ অগ্নিদেবতা, তাহারই সম্মুখে তৃতীয় শিব 'রুদ্র' এবং তচ্ছক্তি 'ভদ্রকালী' শোভাবিস্তার করিতেছেন। রুদ্র—জগন্নাশক-ভস্মভূষিত, ত্রিলোচন, সিন্দুরবর্ণ, বরাভয়প্রদ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত বৃষোপরি ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার শক্তি চতুর্ভুজা নানালঙ্কার-ভূষিতা, সিন্দুরবর্ণা. এস্থলে 'সাকিনীশক্তি' বলিয়া তিনি অভিহিতা হইয়া থাকেন। ইহাই মহাকালের স্থান।

ষট্‌চক্রের মধ্যে তিনটী প্রধান তৈজসাত্মক 'গ্রন্থি' আছে, এই গ্রন্থিগুলির বহিঃচিহ্নরূপ স্থানগুলিকে 'প্লেক্সাস' (Plexas) বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মণিপুরস্থিত স্থূলতেজঃ গ্রন্থিকে পাশ্চাত্য শারীর শাস্ত্রেও সৌরগ্রন্থি বা 'সোলার প্লেক্সাস'

* 'পূজাপ্রদীপে'—ষট্‌চক্র ও চিত্র দেখ।

(Solar Plexas) বলা হইয়াছে। এইরূপ নাম নির্দ্দেশ যে আর্য্য বিজ্ঞানেরই অভিজ্ঞতার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 'ব্রহ্মগ্রন্থিই' তাহার মধ্যে প্রথম; দ্বিতীয়—অনাহতচক্রে 'বিষ্ণুগ্রন্থি' এবং তৃতীয়—আজ্ঞাচক্র 'রুদ্রগ্রন্থি' বলিয়া যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সে সকল কথা যথাসময়ে উক্ত হইবে, এক্ষণে এই ব্রহ্মগ্রন্থি সম্বন্ধেই সাধকের যাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহাই বলিতেছি। পরব্রহ্মের সগুণ অবস্থায় ত্রিভাগ অঙ্গ, অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে প্রতিভাত। কুণ্ডলিনী উত্থাপনের সময় সুষুম্নাপথে মূলাধার হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত সৃষ্টি বা ব্রহ্মগ্রন্থি প্রথমে অতিক্রম করিতে হয়। এই অংশ অতিক্রম করিতে না পারিলে, বিষ্ণুগ্রন্থির অধিকার মধ্যে উপস্থিত হইবার উপায় নাই। ইহাতে সাধক দেখিতে পাইবে, সকলের মধ্যেই ব্রহ্মশক্তির ত্রিগুণ বিদ্যমান। 'ব্রহ্মার' অধিকার মধ্যেও প্রথমে—মূলাধারে, মহাসরস্বতী বা সাবিত্রীসহ ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে—স্বাধিষ্ঠানে ও মহালক্ষ্মীসহ মহাবিষ্ণু এবং তৃতীয়ে—মণিপুরে, মহাকালিকা ভদ্রকালীসহ রুদ্র বা মহাকালের চিন্তা করিতে হইবে। সকল তত্ত্বের মধ্যেই বা সকল চিন্তার মধ্যেই একে তিন ও তিনেই এক, এইরূপ উপর্য্যুপরি চিন্তা করিতে করিতে তিনের একাকার করিতে হইবে। আসল কথা সাম্প্রদায়িকতা বা লৌকিক ভেদজ্ঞানের প্রথম গ্রন্থি এইখানেই ভেদ করিতে হইবে। মণিপুর—পদ্মে পূর্ব্বচক্র বা স্বাধিষ্ঠানপুষ্ট কুণ্ডলিনী 'বং' বীজাত্মিকা হইয়া যখন উপস্থিত হইবেন, তখন সাধক, পূর্ব্ববর্ণিত মণিপুরপদ্মের বহ্নিমণ্ডল, রুদ্রাদি দেবতা ও দশবিধ বৃত্তিসমূহের দর্শন পাইবে বা সেইরূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হইবে। তাহার

পর ক্রমে বহ্নিমধ্যেই সেই সকল দেবতা ও বৃত্তিসমুদায়ের লয় করিতে অভ্যাস করিবে। সেই যে ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল, তখন মনে করিতে হইবে, তাহা যেন তিনখানি 'সুঁদরীকাষ্ঠ' বা সেইরূপ কোন জ্বালানি কাষ্ঠবিশেষ, তাহাতে আগুণ ধরিয়া গিয়াছে, প্রথমে মেঘের মত নীল ধূম্ররাশি বাহিরে দেখাইয়া পরে তাহার মধ্যে লোহিতবর্ণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে পরিণত হইয়াছে, সেই আগুণে সাধকের অন্তরের সকল ময়লা পুড়িয়া যেন ভস্ম হইতেছে। তাহার মধ্যে সাধকের চতুর্দ্দিকে সেই অগ্নির অনন্ত শিখা লক্ লক্ করিয়া যেন সাধকপ্রদত্ত তাহার সকল বৃত্তি যজ্ঞীয় হবির ন্যায় তিনি গ্রহণ করিতেছেন. এইভাবে চিন্তা করিতে হইবে। এই সাধনাসময়ে প্রথম প্রথম সাধকের উদরাময় পীড়া হইতে দেখা যায়। সাধক অগ্নিচিন্তার ফলে শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়াও পড়ে, কিন্তু নাভিচিন্তাসহ মণিপুরপদ্মের ধ্যান করিতে করিতে এবং অনুলোম প্রতিলোমে কুণ্ডলিনীকে একবার মূলাধারে নামাইয়া পুনরায় মণিপুরে তুলিতে চেষ্টা করিলেই ক্রমে তাহা সারিয়া যায়; সুতরাং এ অবস্থায় কোন ঔষধ সেবনের আবশ্যক হয় না।

এই মণিপুরচক্রের অগ্নিতে যখন চক্রস্থিত সমস্ত লয় হইয়া যায়, তখন কুণ্ডলিনীর পূর্ব্বাশ্রিত বং বা বরুণ বীজ অর্থাৎ জল-তত্বও তাহাতে লয় বা পরিশুদ্ধ হইতে থাকে, অর্থাৎ সমস্তই তখন রং বীজে পরিণত হয় এবং সেই রং বীজ কুণ্ডলিনী শরীরে বিলীন হয়। কুণ্ডলিনী রং বীজাত্মিকা হইয়া যেমন ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে আরম্ভ করিবে, মণিপুর তখনই শূন্য হইয়া মুদিত অবস্থায় পরিণত হইবে।

সাধক সেই বাহ্য ভূতশুদ্ধির বিষয় আবার একবার ভাবিয়া দেখ। সেই অনন্ত সমুদ্র-বাড়বানলে পরিণত হইল, জলতত্ত্ব শুষ্ক হইয়া অগ্নিতে লয়প্রাপ্ত হইল। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, এই তিনটী তত্ত্বই স্থূল বা সাকার অর্থাৎ পৃথ্বাত্মক, সেই কারণ ইহা স্থূলচক্ষেই পরিদৃশ্যমান্। ইহাদের উপরের দুইটী তত্ত্ব বায়ু ও অকাশ, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, তবে বাহ্য ইন্দ্রিয়ান্তরে তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। বাহ্য ও অন্তরভেদে ইন্দ্রিয়ও দ্বিবিধ বলা যাইতে পারে। বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যে ভাবে আমরা ভূতপঞ্চক অনুভব করি, অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঠিক সেই ভাবেই আমরা সে সকল অনুভব করিতে পারি না। মানুষ সামান্য অনুধাবনা করিলেই তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। মানুষের জাগ্রত অবস্থায় যে সকল ইন্দ্রিয়-দ্বারা দর্শন ও শ্রবণাদি যে সমুদায় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, স্বপ্নাবস্থায় ঠিক সেইরূপে সেই সকল ইন্দ্রিয়দ্বারাই তাহা নিষ্পন্ন হয় না। সে অবস্থায় চক্ষু নিমীলিত করিয়াও স্বপ্নদ্রষ্টা প্রত্যক্ষবৎ সমস্ত দৃষ্টি করে; আবার গৃহ-প্রাচীর সংলগ্ন 'ক্লক' ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ হইতেছে বা অনুচ্চস্বরে কেহ অন্যের সহিত কথোপকথন করিতেছে, তাহার বিন্দুমাত্রও স্বপ্নদ্রষ্টার শ্রবণগোচর হয় না, কিন্তু স্বপ্নে হয় ত সুমধুর সঙ্গীত অথবা শ্রবণবধিরকর ভীষণ মেঘগর্জ্জন শব্দ শ্রুত হইতেছে, তাহাতে হয়ত তাহার দেহ যেন চমকাইয়া উঠিতেছে; অতএব বুঝিতে হইবে, মানুষের এ চক্ষু ও কর্ণের ক্রিয়া যখন সম্পূর্ণ রুদ্ধ, তখন অন্তরেন্দ্রিয়েব সাহায্যেই তাহার সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকে। যোগী, সাধনোক্ত ক্রিয়াবস্থায় সেই অন্তরেন্দ্রিয়ের পুষ্টির সাহায্যে দেহাভ্যন্তরমধ্যে

কেবল চিন্তার দ্বারাই সকল বিষয় স্পষ্ট দর্শন ও শ্রবণ করিতে পারিবে। এতক্ষণ মণিপুর পর্য্যন্ত পৃথ্ব্যাত্মক পৃথ্বী, জল ও অগ্নি যাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিগম্য বস্তু, সাধক তাহা ত দর্শনই করিলে, এইবার চতুর্থ চক্রে পঞ্চভূতের চতুর্থ-তত্ত্ব, দর্শনের পরিবর্ত্তে অনুভব করিতে হইবে; সুতরাং কি ভাবে তাহা সিদ্ধ হইবে, সাধককে প্রাণপণে তাহারই অনুষ্ঠান-বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে। এই সময়ে অনেক সাধক, সহসা যেন হতাশ হইয়া পড়ে, সেই কারণ যোগিগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করা কঠিন ব্যাপার। শারীরিক মানসিক সকল বিষয়েই গুরুভক্তি-পরায়ণ সাধক দৃঢ়চিত্তে সেই পরমাশক্তি কুণ্ডলিনীর শরণাপন্ন হইলে সহজেই তাহা সম্পন্ন হইবে; অতএব সাধকের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। যোগাভিলাষী বীর সাধক স্থিরচিত্তে কেবল ইষ্ট গুরুর চরণ চিন্তা করিয়া উন্নত সাধনপথে অগ্রসর হও।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মূলাধার ভূর্লোক, তথায় ব্রহ্মার নিবাসস্থান, স্বাধিষ্ঠান ভুবর্লোকে বিষ্ণু-জনার্দ্দন তথায় অধিষ্ঠিত আছেন; এক্ষণে মণিপুর তৃতীয় জ্ঞানভূমি বা স্বর্লোক বলিয়া উক্ত হইতেছে, এখানে দেবাদিদেব শিব সর্ব্বদা সংহারনিরত বা লৌকিক বা আধিভৌতিক ভাবমূলক প্রবৃত্তির বিনাশকরূপে অবস্থান করেন, আবার ইনিই ভাবান্তরে নিবৃত্তিমুখী সাধকের সম্পূর্ণ মুক্তিদাতা।

"ভূর্লোকে নিবসেদ্ ব্রহ্মা ভুবর্লোকে জনার্দ্দনঃ।
স্বর্লোকে নিবসেচ্ছম্ভুঃ সদাসংহারকারকঃ॥"

চক্রসমূহের মধ্য মণিস্বরূপ এই মণিপুর পদ্ম, সাধক অতি যত্ন ও ভক্তিসহকারে চিন্তা করিলে, ইহা হইতেই ক্রমে সকল কামনা সিদ্ধ হইবে। পূজ্যপাদ সিদ্ধ-যোগিবৃন্দ ইঁহার মাহাত্ম্য

বর্ণনায় দেবতীর্থ বা কামনাতীর্থ বলিয়া ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই কামনাতীর্থে সাধকের চিত্ত স্নাত হইলে, জীবের ইহপরকাল সকল কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে। সেই কারণ পূজা জপাদি সকল কার্য্যের পূর্ব্বে কামিনীদেবীর ধ্যান এই স্থানে করিতে হয়।

সাধনপ্রদীপে নবধাআচার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, সাধকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে, ইতঃপূর্ব্বে এই ষট্‌চক্র বর্ণনার মধ্যেই মূলাধার-সাধনকে প্রথম কুলাচার বা বৈদিকাচার এবং স্বাধিষ্ঠান-সাধনাকে দ্বিতীয় কুলাচার বা বৈষ্ণবাচার বলা হইয়াছে, এক্ষণে রুদ্রস্থান মণিপুর-সাধনায় তৃতীয় কুলাচার বা শৈবাচার বলিয়া সাধকের আভ্যন্তরিক সাধনায় ক্রম বুঝিতে হইবে। সাধনাভিলাষী পাঠকের যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে, এই মণিপুর-পদ্ম সকল প্রকার যোগ-সাধনার মূলীভূত অবিরোধ ক্ষেত্র।

অনাহত পদ্ম—সাধক, এইবার 'আপনাকে' সেই 'রং' বীজাত্মক কুণ্ডলিনীকে উত্থিত করিয়া 'অনাহতে' আনিতে হইবে।

মণিপুরের উপরে হৃদয়মধ্যে ইষ্টদেবতার চিন্তার স্থান। এইস্থানে অনাহত কমলের মধ্যে অষ্টদলবিশিষ্ট আর একটী ঊর্দ্ধমুখী গুপ্ত কমলের উপরেই সাধারণতঃ ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিতে হয় *। এক্ষণে এই ষট্‌চক্রভেদ বা অন্তর্ভূতশুদ্ধির ব্যাপারে সেই দ্বাদশদল বিশিষ্ট অনাহতপদ্ম নামক কমলোপরি অরুনাভ-পীতবর্ণ একটী অষ্টদল গুপ্ত কমল চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে।

* 'পূজাপ্রদীপের' মধ্যে (৪ক) 'অনাহত গুপ্তকমল' দেখ।

অনাহতের সেই দ্বাদশদলে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশটী সিন্দূরবর্ণ মাতৃকা বর্ণ বা অক্ষর রহিয়াছে, এবং এই অক্ষরাত্মক দ্বাদশটী দেবতা যথাক্রমে—মঙ্গলা, জাবালিকা, মেধা, শিবরূপিণী, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তি, ভ্রামরী, রুদ্ররূপিণী, অম্বিকা, ক্ষেমা ও বুদ্ধিরূপিণী অবস্থিতা রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তদনুচর দ্বাদশটী বৃত্তি যথা—আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, ও অনুতাপ তাহাতে অবস্থান করিতেছে। এই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা সম্পন্ন যে ষট্‌কোণ ধূম্রবর্ণ মণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণ-শক্তিও বলে, এই ত্রিকোণ-মণ্ডলের মধ্যস্থলে বাণাখ্য বাণলিঙ্গ রহিয়াছেন, তাঁহার সন্নিধানে ঈশানে বা 'ঈশ্বর' নামক চতুর্থ শিব ও তদীয় শক্তি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ভুবনেশ্বরী বিরাজিতা আছেন, এই ঈশ্বরই আবার নারায়ণ বা হিরণ্যগর্ভ নামেও উক্ত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট চতুর্ভুজ বরাভয়প্রদ ও ডমরুযুক্ত এবং ইহার নিকট 'কাকিনীশক্তি' চতুর্ভুজা অস্থিমালা বিভূষিতা ত্রিনেত্রা বিরাজিতা রহিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত কালরাত্রি প্রভৃতি আরও কতকগুলি তাঁহার শক্তিও রহিয়াছেন। যাহাহউক এই চক্রমধ্যে যং এই বায়ু বীজের মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ মণ্ডল, তন্মধ্যে গোলাকার বায়ুমণ্ডল, তাহাতে কৃষ্ণসার-বাহনে অবস্থিত ধূম্রবর্ণ চতুর্ভুজ বায়ু বা পবনদেব শোভা পাইতেছেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নির্ব্বাত-দীপকলিকা সদৃশ সাধকের 'জীবাত্মা' বিরাজিত রহিয়াছেন।

আমরা সংসার-জীবনে মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া থাকি, শোকে দুঃখে অসহ্য কাতরতা অনুভব করি, লৌকিক সুখ ও আনন্দের

আস্বাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যাই, মোট কথা সকল প্রকার সুখ দুঃখের চিন্তা ও অনুভবের দ্বারা আমরা যে সকল কর্ম্মফল ভোগ করি, সে সমস্তই হৃদয়স্থিত এই জীবাত্মাই অনুভব করিয়া থাকেন। পঞ্চভূতাত্মক দেহের তাহা অনুভব করিবার কোন শক্তি নাই, অথবা যতক্ষণ জীবাত্মা, ভূতপঞ্চকের সমষ্টি এই দেহমধ্যে অবস্থিত, ততক্ষণই যেন এই দেহ সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে বলিয়া মনে হয় কিন্তু যখনই জীবাত্মা স্থূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তখন আর কোন ক্রমেই দেহে, সুখ বা দুঃখের অনুভব হয় না; যে দেহ সামান্য একটু প্রখর রবিকর সহ্য করিতে পারে না, সহসা কাতর হইয়া পড়ে,—সেই দেহই জীবাত্মা-পরিত্যক্ত হইলে, প্রজ্জ্বলিত ভীষণ চিতাগ্নিমধ্যে অনায়াসে ভস্ম হইয়া যায়, দেহ তখন কিছুই অনুভব করে না বা যন্ত্রনাজনিত কাতরভাবব্যঞ্জক কোন শাড়াশব্দও দেয় না; যে দেহে একদিন প্রিয়ালিঙ্গনে প্রতি শিরায় শিরায় বিদ্যুদ্বেগ ছুটিয়া থাকে, ক্ষণে ক্ষণে তাহাতে রোমাঞ্চ হইয়া উঠে, সেই প্রিয়তম বা প্রাণপ্রিয়া বক্ষের উপর পতিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতেছে, কিন্তু দেহ চিত্রার্পিত বা প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় ধীর স্থির অচঞ্চল, তাহার ভাবের বিন্দুমাত্রও বিকার দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সেই জীবাত্মা ব্যতীত জীবের সুখ দুঃখ আর কেহই ভোগ করিতে পারে না। সেই নির্ব্বাত-দীপকলিকাসদৃশ জীবাত্মা, জীবদেহ পরিচালনার্থে দেহ-দুর্গের মধ্যস্থলে, হৃদি-সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। অন্তরদর্শী সাধক, পূর্ব্বোক্ত অনাহতচক্রস্থিত বায়ুমণ্ডল বা তন্মধ্যস্থ ধূম্রবর্ণ বায়ুদেবকে আশ্রয় করিয়াই যে

জীবাত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করেন। তন্ত্রান্তরেও লিখিত আছে, বায়ুদেবতার স্কন্ধেই জীবাত্মা অবস্থান করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মণিপুর পর্য্যন্ত পৃথ্বী, জল ও অগ্নিতত্ত্ব বীজাকারে রং বীজাত্মক হইয়া কুণ্ডলিনীতে লয় হইয়াছে, এক্ষণে ঊর্দ্ধমুখী কুণ্ডলী মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া অনাহতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। পঞ্চতত্ত্বময় দেহের বায়ুতত্ত্ব এই অনাহত চক্র। এই স্থানে সেই বায়ু-পরিচালিত কুণ্ডলিনী বা ওজঃস্বরূপ জীবনী-শক্তি, জীবাত্মার সহিত এইবার মিলিত হইবেন। জীবাত্মা ও তাঁহার জীবনী শক্তি এতদিন স্বতন্ত্র স্থানে থাকিবার কারণ পরস্পর বিরহজনিত যেন বিমর্ষ হইয়াছিলেন। আজ সাধকের কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে হৃদয়স্থিত বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত বায়ু দেবতা বা বাণলিঙ্গাশ্রিত জীবাত্মার সহিত কুণ্ডলিনী মিলিতা হইবেন। ভক্তি ক্রিয়াবান সাধকের এই অপূর্ব্ব মিলনই ভগবদ্‌রসস্বরূপ আনন্দকন্দ, ইহাই সাম্প্রদায়িকতা পরিপূর্ণ 'রাসরঙ্গ'; তখন ভক্তমাত্রেরই এই হৃদয়-মন্দির যথার্থ রাসমন্দিরে পরিণত হয়। ('পূজাপ্রদীপে'—চতুর্থ উল্লাসে ৪৫ পৃষ্ঠায় 'অনাহত চক্র' 'যুগলমিলন' দেখ।) অনাহতপদ্মের দ্বাদশদলে আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ এই দ্বাদশ বৃত্তির স্থান, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যতদিন জীবাত্মা তদীয় শক্তিবিহনে একাই অবস্থান করিতেছিলেন, ততদিন এই দ্বাদশদলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; সেই কারণ তদনুগত মনও এতদিন সুস্থির হইতে না পারিয়া কেবল উক্ত দ্বাদশবিধ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া থাকিত। আজ সাধকের সে দিনের পরিবর্ত্তন

হইবে, আজ জীবাত্মা শক্তিসহযোগে মোহিত হইয়া বা কেন্দ্রস্থিত হইয়া সুষুম্নাগত হইবেন ও অপার আনন্দ উপভোগ করিবেন।

এই অনাহত পদ্মের আর একটী নাম 'কল্পতরু'। সাধকের অভিলষিত সকল আশাই এই স্থান হইতে পূর্ণ হয়। সাধক যাহা চাহিবেন, তাহাই কল্পতরু-প্রদত্ত ফলের ন্যায় এই স্থান হইতে প্রাপ্ত হইবেন। এই স্থান সর্ব্বদেবতারই পীঠস্থান। সাধক যে দেবতা বা যে মন্ত্রেরই উপাসক হউন না কেন, এখানে সেই দেবতা বা সেই মন্ত্রই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। সেই কারণ সকল সম্প্রদায়েরই ইষ্ট-চিন্তার স্থান এই 'হৃদ্-কমল'। পূজা-অর্চ্চনার সকল প্রকার অনুষ্ঠানও এখানে সতত: বিদ্যমান আছে, সদ্গুরুর কৃপায় সাধকের সাধনা পূর্ণ হইলে, অনাহতপদ্মে যাহা দেখিতে পাইবে, তাহাতে বাহ্যপূজার প্রকৃত ভাব ও তদনুষ্ঠান চিত্তে অলৌকিক রূপেই অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবে। সাধারণ পূজা-বিধির মধ্যেও এই হৃদয়ের মধ্যেই ইষ্টদেবতার প্রথমে চিন্তা বা ধ্যান এবং মানসপূজা করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহা পরে মানস-পূজাদির বিধানে বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূজাকালে হৃদয়-পীঠে ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য হৃদয় বা বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা 'পীঠন্যাস' করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, আক্ষেপের বিষয়—তত্ত্ব-পূজক, ভিতরের সে তত্ত্ব অবগত না হইয়া, বক্ষে করতল মাত্র রক্ষা করিয়াই পূজাকালে পীঠন্যাসের একটী অভিনয় করিয়া থাকেন।

যাহা হউক জীবাত্মার এই পরম পবিত্র পীঠস্থান, এই অনাহতপদ্ম এক্ষণে যোগীর অত্যন্ত প্রিয়তম স্থান। জীবাত্মা

হংসঃবীজাত্মক। এই হংসঃ বা মধ্যমা অথবা অনাহত-নাদ বা ধ্বনি, অনাহত হইতেই তাহা সমুখিত হয়। অন্+আহত= অনাহত, অর্থাৎ বিনা আহতে বা আঘাতে সমুখিত মধ্যমা নামক এই হংসঃ-ধ্বনি এক্ষণে সাধকের শ্রুতিগোচর হয় স্থূল ভাবে হৃদয়ের স্পন্দনরূপ 'ধুক ধুক' শব্দ বক্ষে হস্তার্পণ করিলেও বুঝিতে পারা যায়। জীবমাত্রেই অহরহঃ এই হংসঃ বা 'অজপা' সাধনায় নিয়োজিত, কিন্তু জীব সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত এবং স্বীয় অদম্য সাধনার অভাবে তাহা সহজে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না ('পূজাপ্রদীপে' অজপাজপ সমর্পণ দেখ)। সাধকগণ জন্মজন্মার্জ্জিত স্ব স্ব পুণ্যফলে এই অনাহত-সাধনায় যখন উপস্থিত হইতে পারে, তখন আর তাহার বাহ্যানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না, তখন তাহারা সেই হৃদয়স্থিত অশ্রুতপূর্ব্ব 'অনাহতধ্বনি' শ্রবণ করিয়া যথার্থই যে কি আনন্দ উপভোগ করে, তাহা বলিবার নহে।

অনাহতচক্রের আর এক নাম 'বিষ্ণুগ্রন্থি'। সাধকের স্মরণ আছে, মণিপুরকে 'ব্রহ্মগ্রন্থি' বলা হইয়াছে, তাহা ভেদ করা যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার সাধারণ যোগী তাহা ত অবশ্যই অনুভব করিয়াছে। এক্ষণে এই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করিতে হইবে। ইহা ব্রহ্মগ্রন্থির ন্যায় যথেষ্ট কষ্ট-সাপেক্ষ না হইলেও একেবারেই সহজ নহে। ইহার জন্যও সাধকের সাধনা-বিষয়ে বিশেষরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। গুরুমুখাগত হইয়া কায়মনে ও ধীরভাবে সাধনা করিলে, কোন বিষয়েই কাহারও অসিদ্ধ থাকিতে পারে না।

সংসারী অথবা ভোগীর চরম লক্ষ্যস্থল এই হৃদয়পদ্ম, ইতঃপূর্ব্বেই তাহা উক্ত হইয়াছে। অনাহতপদ্মের মধ্যে পূর্ব্বকথিত যে উর্দ্ধমুখ অষ্টদল গুপ্ত কমলটী আছে, তাহাই শাস্ত্রে 'বৈকুণ্ঠ'

বলিয়া উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুর পালনী-শক্তির ক্রিয়া এই স্থানেই পূর্ণভাবে সাধিত হইয়া থাকে, সেই কারণ সংসারী সাধকমাত্রেই স্ব স্ব ইষ্টদেবতার চিন্তা, ধ্যান ও পূজা এই স্থানেই করিয়া থাকেন, বিশেষ বিশ্বের ব্যাপক চৈতন্যশক্তি বিষ্ণুমায়ার অধীন সাধকগণ সর্ব্বদা এই স্থানেই ভগবচ্চিন্তা করেন। সর্ব্ববিধ সাংসারিক ভাবের পুষ্টি ও সমষ্টি এই অনাহত চক্রেই। কুণ্ডলিনী বা জীব-প্রকৃতি জীবাত্মার সহিত এই স্থানে মিলিতা হইবার কারণ প্রেমের পূর্ণতা হইয়া থাকে, সুতরাং উর্দ্ধমুখী কুণ্ডলিনী এই সুখপ্রদ মনোরম স্থান বা এই বিষ্ণুগ্রন্থি সহসা ভেদ বা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেই জন্য সাধকমাত্রেরই এই সময় সামান্য দৃঢ়তা-সহকারে তপঃ-বৈরাগ্যমূলক সাধনার নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করা বিধেয়।

এই অনাহত-সাধনায় পূর্ব্ববর্ণিত অনাহতপদ্মস্থিত সকল দেব দেবী, মাতৃকাবর্ণ এবং আশা, চিন্তা আদি বৃত্তি সমুদায় বায়ু-তত্ত্বে লয় করিয়া কুণ্ডলিনী-আশ্রিত 'রং' বীজও তাহাতে লয় করিতে হইবে। ভূতশুদ্ধি ক্রিয়াসিদ্ধ বহ্নি-সহযোগে যাহা প্রথমে অঙ্গার, পরে ভস্মে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বায়ু-তাড়নায় উড়িয়া যাইল, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। এক্ষণে সেই বায়ুতত্ত্ব বা 'যং' বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীশরীরে আশ্রয় লইল। এই অনাহতপদ্মকে আবার 'চতুর্থ—জ্ঞানভূমি' মহর্লোক বলিয়া যোগিগণ উল্লেখ করেন। কারণ পৃথ্যাদি স্থূল ভূতত্রয় এখানে লুপ্ত হইয়া বায়ুমণ্ডলে পরিণত হয় ও জীবাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, সাধক প্রকৃত মানসপূজার অধিকারী হইয়া থাকেন। এই অনাহত-সাধনার সময় সাধক সর্ব্ব দেবদেবীর

পূজাঅর্চ্চনার চরমসীমায় আসিয়া উপস্থিত হন, সেই কারণ পূর্ব্বোক্ত নবধাআচারের মধ্যে 'দক্ষিণ' অর্থাৎ অনুকূল অথবা ব্রাহ্মণাচারের সহায়ক আধার বলিয়াও ইহা বর্ণিত হইয়া থাকে। সাধক, এই চতুর্থ জ্ঞানভূমি যোগসাধনার অনুকূল আধারস্বরূপ অনাহতের-সাধনায় অবহেলা করিবে না, তাহা হইলেই সময়ে পরম আনন্দ পাইবে।

গুহ্যশাস্ত্রে এই অনাহতকে আবার 'সর্ব্বতীর্থ' বলিয়া অভিহিত করিতে দেখা যায়। এই তীর্থসলিলে অবগাহন বা অভিষিক্ত হইলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অভিষেকের হিসাবে সাধকের ইহাই 'সাম্রাজ্যাভিষেকের' অন্তিমদশা কারণ এই পর্য্যন্তই পূজা ও জপাদির ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। ইহার পরই মহাসম্রাজ্যাভিষেকে পূজার্চ্চনা ও জপাদি বাহ্যক্রিয়ার আর কোন ব্যবস্থা নাই, তাহা সাম্রাজ্য ও মহাসাম্রাজ্য-দীক্ষাভিষেকের বর্ণনায় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এখন সেই সকল উক্তির সহিত সাধনার সুন্দর মিলন দেখিয়া সাধক ক্রমেই চমৎকৃত হইয়া যাইবে।

বিশুদ্ধ পদ্ম :—কণ্ঠদেশই বিশুদ্ধপদ্মের স্থান। সেই মেরু-দণ্ডস্থিত সুষুম্নান্তর্গত কণ্ঠমূলে গাঢ় ধূম্রবর্ণ ষোড়শদলবিশিষ্ট বিশুদ্ধ কমল যোগিগণ চিন্তা করেন। ইহার ষোড়শদলে শোণফুলের ন্যায় অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৯ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ, এই ষোলটী মাতৃকা বর্ণ এবং ব্রাহ্মণী, চণ্ডিকা প্রভৃতি ষোড়শ-বর্ণের ষোড়শী শক্তি-দেবতা আছেন। এতদ্ব্যতীত ঐ ষোলটী-দলের সাতটীতে সঙ্গীতের মূলীভূত সপ্তস্বর—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ; অষ্টমদলে—বিষ এবং অবশিষ্ট

আটটীদলে হুং, ফট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা, স্বাহা ও নমঃ এই সাতটী মন্ত্র এবং অমৃত বিদ্যমান আছে। এই পদ্মের কর্ণিকার অন্তর্গত বিদ্যুৎবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল-মধ্যে শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ আকাশ বীজ 'হং' আছে। তাহাতেই কর্ম্মনিয়োজক পঞ্চমশিব 'সদাশিব' ও 'শাকিনীশক্তি' যেন অর্দ্ধনারীশ্বররূপে বিরাজমান। ইনিই যোগীর অভয় ও মুক্তিদাতা। ইনিই সকল বীজ মন্ত্র, অর্থাৎ সকলেরই বীজ বা মূলমন্ত্র, ইহার নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার কারণ এই বিশুদ্ধপদ্মের মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বরের অন্তরে বিদ্যুৎবর্ণ 'প্রণব' অর্থাৎ ওঁবীজ সততঃ গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে, এই প্রণবই সর্ব্ববীজাধার *। যাহাহউক সাধক এইবার এই পঞ্চম চক্রে সাবধানে অধিরোহণ কর। অনাহত-চক্র-পুষ্ট বায়ু-বীজাত্মক কুণ্ডলিনীশক্তি এইবার ধীরে ধীরে এই চক্রমধ্যে উপস্থিত হইলে, প্রথমে সাধক বিশুদ্ধচক্রস্থিত সকল মাতৃকাবর্ণ ও দেবতা প্রভৃতিকে আকাশতত্ত্বে লয়চিন্তা করিবে, পরে পূর্ব্বপুষ্ট কুণ্ডলিনীর বায়ুবীজও ইহাতে লয় হইতেছে, চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তাদ্বারাই এখন সাধক স্পষ্টভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিবে। অনন্তর সকলের লয়জাত হং বীজ কুণ্ডলিনীতে লীন হইবে, অথবা কুণ্ডলিনী হং বা আকাশ বীজাত্মকরূপে পরিণত হইবে। শাস্ত্রে বিশুদ্ধাখ্যকে অষ্টতীর্থ বলা হইয়াছে।

"বিশুদ্ধাখ্যে মহাপদ্মে অষ্টতীর্থ সমুদ্ভবঃ।
কৈবল্যং মুক্তিদং ধ্যাত্বাস্নাতি বীরোবিমুক্তয়ে॥"

এই 'অষ্টতীর্থে' সাধক স্নাত হইতে পারিলে, 'অষ্টপাশমুক্ত'

* পূজাপ্রদীপে—৪র্থ উল্লাসে ২৭ পৃষ্ঠায় 'কালী মুণ্ডমালী' ও ৪৭ পৃষ্ঠায় 'বিশুদ্ধচক্র' দেখ।

হইয়া কৈবল্যমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই ষোড়শদল কমলের প্রথম অষ্টদলে বিষ এবং দ্বিতীয় অষ্টদলে অমৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টতীর্থে সেই বিষ বা অষ্টপাশ নাশ করিয়া অমৃত বা কৈবল্য মুক্তি লাভ হয়। 'সাধনপ্রদীপে' ও 'জ্ঞান-প্রদীপে' অষ্টপাশের উল্লেখ আছে :—

"ঘৃণালজ্জাভয়ং শোকোজুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী।
কুলংশীলং তথাজাতিরষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা এবং কুল, শীল ও জাতি, এই অষ্টপাশে জীব আবদ্ধ। এই অষ্টবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে, সাধকের শূন্যচিন্তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইতে পারে না। বিশুদ্ধপদ্ম আকাশ-বীজাত্মক, আকাশই শূন্যভাব প্রকাশক। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তত্ত্বই এখন আকাশে লীন হইয়া যাইতেছে; সাধক, বিশুদ্ধাখ্য-সাধনায় তাহাই চিন্তা ও উপলব্ধি করিবে। হং আকাশ তত্ত্বেরই বীজ, আবার 'হ' সদাশিবেরও বীজমন্ত্র বা আত্মা এবং আকাশই সদাশিবের বিরাটমূর্ত্তি। সদাশিব লিঙ্গরূপী এবং আকাশেরও অন্য নাম লিঙ্গ *। শাস্ত্র তাই স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবীতস্য পীঠিকা।
আলয় সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ আকাশকেই লিঙ্গ বলা যায়, এবং এই পৃথিবী বা পৃথ্বীতত্ত্ব সেই আকাশেরই পীঠবেদিকাস্বরূপ। এই আকাশেই সর্ব্বদেবতার আলয়, এবং ইহাই সকলের লয়স্থান বলিয়া ইহা লিঙ্গশব্দে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সংসারের যাবতীয় তত্ত্ব এই

* 'পুরশ্চরণ-প্রদীপে'—বিস্তৃত শিবপূজাতত্ত্ব দেখ।

শেষতত্ত্ব আকাশে লীন হইয়া থাকে। জীবের অষ্টপাশ ও অনন্ত চিন্তা এই আকাশতত্ত্বে লীন হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষের সেই যে, অব্যক্ত মিলন রহস্য, যাহা মহা-সাম্রাজ্যাধিকারে উক্ত হইয়াছে, সাধক, তাহাই এখন স্পষ্টতররূপে অনুভব কর। পাঠক, এইবার সেই বাহ্যভূতশুদ্ধির বিষয়ও একবার ভাবনা কর, তখন বাহিরে বা বহির্বিশ্বে 'শূন্য' অনুভব করিয়াছিলে, এইবার অন্তর্বিশ্বও সাধকের 'শূন্য' হইয়া যাইল। একে একে প্রকৃতির সকল অনাদি ও অনন্তরূপ লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইল, এখন পুণ্যবান সাধক নিজেও প্রকৃতি কি পুরুষাংশময় তাহার পার্থক্য আর নির্ণয় করিতে পারিবে না, কেন না, নিজেও যে এখন শূন্যময়! কিন্তু শূন্যেরও ভাব আছে, আকাশেরও গুণ আছে, যোগীর ও সাধকের অবশ্যই তাহা স্মরণ থাকিবার কথা। আকাশের গুণ শব্দ বা নাদ। জীবের কণ্ঠমূলস্থিত এই বিশুদ্ধ পদ্মেরই বহির্বিকাশ সেই স্থূল 'নাদ যন্ত্র'। কণ্ঠপথেই পূর্ব্বকথিত বৈখরী-নাদ প্রকাশিত হইয়া সর্ব্ববিধ 'বাক্য' ও 'সঙ্গীতাদি' 'শব্দ' বাহির হয়। শাস্ত্রে ইহাকে 'ভারতী-স্থান'ও বলে। আবার 'ভারতী'ই আমাদিগের বাগ্‌দেবতা, অর্থাৎ বেদমাতা 'প্রণব-শব্দ-প্রকাশিকা'। ঋষিবাক্যে উক্ত আছে,—"নবিদ্যা সঙ্গীতাৎপরা" অর্থাৎ সঙ্গীতের উপরে আর কোন বিদ্যা নাই। তাই সেই কোন্ অনাদিকালে দেব ও ঋষিকণ্ঠে বেদের উদ্গীথ 'সামগানে' গীত হইয়াছিল। সেই গীত-মূলক ষড়জাদি সপ্তস্বর এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম-দলেই অবস্থিত, ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যাহাহউক এই ভারতী স্থানে, আকাশ-তত্ত্বের গুণ—শব্দ বা নাদ এবং নাদের আদ্যবীজ 'প্রণব' অর্দ্ধনারীশ্বরের অন্তরে

সর্ব্বমন্ত্রসাররূপে বিরাজমান আছে। সাধক, ক্রমে তাহাই ধ্যান করিতে পারিলে, জীবাত্মার অষ্টপাশ বা বন্ধন মোচন করিতে পারিবে। জীব সদাশিব কর্ত্তৃক নিয়োজিত, সৎ-অসৎ সকল কর্ম্মেই নিত্যনিরত, সুতরাং তাহার কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু এই বিশুদ্ধাখ্যসাধনায়, সাধক শূন্যময়-বিশ্বচিন্তায় অভ্যস্ত হইলে, কোন কর্ম্মেরই ফলাফল আর ভোগ করিতে হইবে না। বিশ্বের সমস্ত বস্তুই তখন তাহার নিকট অনিত্য বোধে হেয় বা তাহার ব্যবহারজনিত তাহাতে স্বাভাবিক ঔদাসিন্য অনুভূত হইবে।

বিশুদ্ধাখ্য সাধকের 'পঞ্চম জ্ঞানভূমি'। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোকের মধ্যে জনঃ বা বিশুদ্ধাখ্য পঞ্চম স্তর। এ সকল শুধু কথার কথা নহে। কেবল পড়িয়া যাইলে, ইহার কোন আস্বাদই অনুভব হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরু নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া করিয়া যাইলে, তবে ইহার প্রকৃতভাব অনুভব হইবে; জীব ভূঃ তত্ত্বের মধ্যে পতিত হইয়া অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া পঞ্চভূতের স্থূলতম ভাবনাই, স্পষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু ক্রিয়াসাধনার সহযোগে ক্রমে তাহার অতি সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতম-তত্ত্বের অনুভব করা নিতান্ত কঠিন বা দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার নহে। সাধক মহাসাম্রাজ্যদীক্ষার পর এই 'পঞ্চম জ্ঞানভূমির' বিষয় বেশ সহজে অনুভব করিতে পারিবে। যোগশাস্ত্রে ইহাই 'জনঃলোক' বলিয়া গোলক অপেক্ষাও ইহার লক্ষ্যগুণ অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিশুদ্ধাখ্য সাধনায়, মুখে অধিক লালার সঞ্চার হয়, তাহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে, সেই 'লালাই' উক্ত পদ্মোত্থিত স্থূল অমৃতধারা, তাহা পান করিয়া

ফেলা কর্ত্তব্য। তাহাতে সাধকপ্রবর দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইয়া থাকে।

ললনা চক্র—শাস্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রের পঞ্চম-চক্র পর্য্যন্ত বলা হইল, ইহার পরই সাধারণ হিসাবে ষষ্ঠ-চক্রের নাম 'আজ্ঞা-চক্র,' তাহা পরে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম ও ঐ ষষ্ঠের মধ্যে যে অতি গোপনীয় 'ললনাচক্রের' বিষয় গুরুপরম্পরা দ্বারায় উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে, তাহাই যোগাভিলাষী পাঠকের অবগতির জন্য বর্ণিত হইতেছে।

বিশুদ্ধচক্রের উপরে ঠিক তালুমূলে এই ললনাচক্রের স্থান, ইহা রক্তবর্ণ দ্বাদশদলবিশিষ্ট একটী কমল, কোন কোন তন্ত্রমতে ইহা আবার ৬৪ দল যুক্ত। ইহার এক এক দলে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ, শোক, খেদ, শুদ্ধতা, অরতি, সম্ভ্রম ও ঊর্ম্মী এই দ্বাদশটী বৃত্তির এক একটী বৃত্তি অবস্থান করিতেছে। বিশুদ্ধপদ্ম হইতে আজ্ঞাপদ্মের ধ্যান করিবার পূর্ব্বে, সাধক, এই ললনাপদ্মে কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিয়া যাইবে। ইহাতেই 'অমৃতস্থালী' আছে, সুতরাং ইহার ধ্যানে উন্মাদ, জ্বর ও পিত্তজনিত দাহ, শূলাদি-বেদনা, শরীরের এবং জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ ষট্‌চক্র-ভেদ-ব্যাপারে বহু ক্ষণ ধ্যান ও সাধনার ফলে, অনেক সময়ে যোগীর মস্তিষ্কের উষ্ণতা উপস্থিত হয় এবং তজ্জনিত পূর্ব্বোক্ত দৈহিক অসুস্থতা হওয়া অসম্ভব নহে, সেই কারণ পূর্ব্ব হইতে ললনাচক্র ধ্যান করিয়া যাইলে, আর সেরূপ হইবার আশঙ্কা থাকে না। এতদ্ব্যতীত আজ্ঞাচক্র হইতে উচ্চতর সাধনার সময়ে যখনই সাধকের কোনরূপ অসুস্থতা অনুভব হইবে, তখনই একবার 'ললনাপদ্ম' চিন্তা করিলে তাহার উপশম হইবে।

যোগ-'স্বরোদয়' ও 'উৎপত্তি' আদি তন্ত্রোক্ত যে 'নবচক্রের' কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্বজনবিদিত ষট্‌চক্রের অতীত, আরও তিনটী গুপ্ত চক্র লইয়া একত্র নয়টী চক্র। তন্মধ্যে এই ললনাচক্রও একটী। সাধক শ্রীগুরুদেবের চরণ-চিন্তা করিয়া ভক্তিভাবে ললনাচক্রের সাধনা করিবে।

আজ্ঞাপদ্ম—অনন্তর ভ্রূমধ্যের পশ্চাতে সমগ্র মস্তিষ্কের আধার স্বরূপ ও চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় সামান্য নীলাভ শুভ্রোজ্জ্বল দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাপদ্ম।* একদলে 'হং' দ্বিতীয়দলে 'ক্ষং' এই দুইটী রক্তবর্ণ মাতৃকাবর্ণ আছে। কর্ণিকার মধ্যে অতি গুপ্তভাবে লংবীজ (তাহার উচ্চারণ 'ড়' এরমত) আছে। পদ্মের দুইটীদল ও কর্ণিকার মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ বর্ত্তমান। কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণচক্রে সূক্ষ্ম বা বিন্দুরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একত্র অবস্থান করিতেছেন; এবং তাঁহাদের সমাহারে বা ভিন্নভাবে তাঁহাদের সম্মুখে ওঁ বা প্রণবাকৃতি তেজোময় 'ইতর' নামক লিঙ্গ অথবা হংসরূপ জ্ঞানদাতা ষষ্ঠশিব 'পরশিব' রূপে ও তাঁহার শক্তি 'পরশিবা সিদ্ধকালী'সহ বিরাজিত রহিয়াছেন। মূলাধার হইতে এক এক চক্রে যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই শিব-শব্দবাচ্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"

উক্ত ষট্‌শিবাশক্তিই এখানে 'হাকিনী'-নামে ষণ্মুখ-পরিশোভিতা চতুর্ভুজা দেবীরূপে বিরাজমানা আছেন।

---

* 'পূজাপ্রদীপে'—৪র্থ উল্লাসে ৭৮ পৃষ্ঠায় 'আজ্ঞাচক্র' দেখ।

আজ্ঞার আর একটী নাম 'জ্ঞানপদ্ম'। এই পদ্মাধিষ্ঠিত জ্ঞানদাতা পরশিবের কৃপায় এইস্থান হইতেই যোগীর প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান আরম্ভ হইতে থাকে।

ষট্‌চক্রের মধ্যে ইহাই প্রত্যক্ষভাবে ষষ্ঠচক্র। এই স্থানেই ষট্‌চক্রের ক্রিয়া বা সাধনা একপ্রকার শেষ হয়, অর্থাৎ মূলাধার হইতে সুষুম্নার অন্তর্গত যে ব্রহ্মবিবর দিয়া কুণ্ডলিনী ক্রমে উত্থিতা হইয়া আসিতেছেন, সেই ব্রহ্মবিবর এই স্থানেই শেষ হইল। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, মূলাধারকে 'মুক্তত্রিবেণী' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না সেই স্থানেই স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। সাধক, এক্ষণে এই আজ্ঞাচক্রে সেই 'ত্রিস্রোতার মিলনস্থান' উপলব্ধি করিবেন। যোগিগণ ইহাকে 'যুক্তত্রিবেণী' বা 'ত্রিকুট' বলিয়া বর্ণনা করেন। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না পূর্ব্বোক্ত এক এক চক্রে ত্রিতয় অর্থাৎ কেশগুচ্ছজাত বেণীর ন্যায় সংবদ্ধ হইয়া এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। অথবা এই চক্ররূপ 'সুমেরু পর্ব্বতচূড়া'* হইতেই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না সমুদ্ভূত হইয়া নিম্নমুখে সমতলভূমি মূলাধার পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী অন্য কয়েকটী চক্রে মিলিত থাকিয়া, মূলাধার হইতে একেবারে মুক্ত বা স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে 'তীর্থরাজ-যুক্তত্রিবেণীতে' সাধক, পরিস্নাত হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হউন। যোগিগণ বলিয়া থাকেন, এই আজ্ঞাচক্রমধ্যে বিন্দুসরোবর বা বিন্দুতীর্থ এবং কালীকুণ্ড আছে, তাহাতেও সাধকগণ স্নান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সুষুম্নাপথে সাধকের

---

* 'পূজাপ্রদীপে'—৪র্থ উল্লাসে ১০ পৃষ্ঠায় 'সুমেরু পর্ব্বত' দেখ।

জীবনী বা কুণ্ডলিনীশক্তি অনাহতস্থিত জীবাত্মা সহযোগে এই পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনীরূপে আসিতে পারেন, ইহার পর অকুলস্থানে যাইলেই তিনি অকুলের কুলপ্রদর্শনীরূপে—কুল-কুণ্ডলিনী হন। অর্থাৎ এতদিন যিনি কুণ্ডলিনীরূপে সাধকের জীবনীশক্তি ছিলেন, এক্ষণে কুল অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি স্বরূপ হইয়া কুল-কুণ্ডলিনী হইয়া যাইলেন। 'পূজাপ্রদীপে' ৫৬ পৃষ্ঠায় কুণ্ডলিনী ও কুলকুণ্ডলিনী শব্দের তাৎপর্য্য দেখ। সুষুম্নাপথ এই বিন্দুতেই শেষ হইয়াছে। পঞ্চভূতাত্মক দেহমধ্যে ইহাই প্রকটভাবে ষষ্ঠ-চক্র। এই পর্য্যন্তই গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধক কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহার উপরে যাহা কিছু জানিবার আছে, তাহার আর কোন মৌখিক উপদেশ নাই বলিলেই হয়। কেবল গুরুর আজ্ঞা আছে যে, সাধক এইবার ক্রমে স্বাধীন ভাবে উপরের দিকে অগ্রসর হও; সেই কারণেই ইহাকে আজ্ঞাচক্র বলা যায়। ক্রিয়াবান সাধক এইস্থানে উপস্থিত হইলে, তখন তাহার যাহা কিছু কর্ত্তব্য ইষ্টগুরুর কৃপায় সে সকল আপনিই উপলব্ধি হইতে থাকে। অর্থাৎ 'কূটস্থ' প্রদেশে বা যোগহৃদয়ে শ্রীগুরুর জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরাদেশ সাধক উপলব্ধি করিতে পারে। ইহার আর এক নাম 'তপোলোক', পূর্ব্বে মূলাধার হইতে ভূঃ, ভুবঃ প্রভৃতি এক একটী 'জ্ঞানভূমির' কথা বলিয়া আসিয়াছি, সেই হিসাবে এই স্থানটী সাধকের 'ষষ্ঠ—জ্ঞানভূমি' বা 'তপোলোক'। গোলোক হইতে চতুর্লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে ইহার অনন্ত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। ইহাই অন্তরের প্রকৃত তপশ্চার স্থান অথবা সূক্ষ্মভাবে শরীরত্রয়ের তপস্যার শেষ বা সর্ব্বোচ্চ স্থান,

ইহাকেই আবার 'রুদ্রগ্রন্থি' বলে। পূর্ব্বে মণিপুর পদ্মকে 'ব্রহ্মগ্রন্থি' বা 'ব্রহ্মার—অধিকারভূমি' বলা হইয়াছে; অনন্তর 'অনাহতচক্র' 'বিষ্ণুর—অধিকারভূমি' বা জীবস্থিতি তত্ত্বের সমাপ্তি অথবা 'বিষ্ণুগ্রন্থি' বলা হইয়াছে; এক্ষণে 'আজ্ঞাচক্রে' 'রুদ্রাধিকার' বা লয়তত্ত্বের সমাপ্তি হইতেছে, ইহাকে আবার 'অজ্ঞান চক্র'ও বলে, ইহার নিম্ন হইতে অজ্ঞান ও উপরে জ্ঞান, সাধকের অবিদ্যাপ্রভাব বা অজ্ঞানতা দূর হইলে আজ্ঞাচক্র ভেদ হইয়া থাকে। সুষুম্না পরিচালিত প্রাণায়াম-ক্রিয়াও এই স্থলেই শেষ হইতেছে, ইহার উপর আর বায়ুর পরিচালন-পথ নাই। জীবাত্মা এইস্থানের উপরে উঠিলেই পরমাত্মায় লয় হইয়া যাইবেন। ফলতঃ ষট্‌চক্রের ক্রিয়া এই 'রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ' করিতে পারিলেই সব শেষ হইবে। 'ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ' করিবার সময় সাধক ক্রমে কৃশ ও শুষ্ক হইয়াছিলে, কিন্তু এই 'রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ' কালে আর সেরূপ শুষ্ক হইতে হইবে না। এখন উপযুক্ত আহার না পাইলেও, সাধকের দেহ বেশ সবল ও সুস্থ থাকিবে। দেহের দিব্যকান্তি ও লাবণ্য যেন নবযৌবনের ন্যায় ফুটিয়া উঠিবে।

পূর্ব্বে অনাহতকমলকে হৃদয়পদ্ম বা 'জীবাত্মার-স্থান' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেহস্থিত 'সাধারণ-হৃদ্‌পদ্ম' তাহা প্রাণ-হৃদয়ের স্থান। উচ্চাধিকারী যোগী এখন এই আজ্ঞাচক্রকেই দ্বিতীয় বা যোগ-হৃদয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে। ইহাকে জ্যোতির্হৃদয় ও যোগস্বরোদয়ে সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত এই স্থানকেই 'হৃদয়কমল' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার উপরেই গুরুপাদুকা,

সোমচক্র ও পরমাত্মার স্থান, পরমাপ্রকৃতি বা তাঁহার ইচ্ছাশক্তি পরশিবের সহিত সতত মিলিতা হইয়া এইস্থানে অবস্থান করিতেছেন। ইহাই কতকটা তুরীয়ভাবাধার বা ব্রহ্মের অব্যবহিত নিম্ন অবস্থাবোধক ভাবাধার। সাধকের এই আত্মজ্ঞান বা পরমাত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং এতকাল যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামাদি পুষ্ট হইয়া সাধক যাহার ধ্যান ও ধারণা করিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে প্রকৃত উপনয়নরূপ তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞাননেত্রে এই জ্ঞান-কমলমধ্যে ইহার সম্মুখে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে, দীপ-জ্যোতিঃ সদৃশ যে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতেছে, ইহাই আত্ম-দেবতা, পরমাত্মার আত্ম-প্রতিবিম্ব; সুতরাং এই উচ্চ 'তপঃ-সাধনায়' সাধকের স্থূল-ধ্যান শেষ হইয়া যাইল। সাধক এখন হইতে ক্রমে স্থূল-ধ্যান ছাড়িয়া সূক্ষ্ম বা জ্যোতিঃ-ধ্যানে উপস্থিত হইতেছেন। প্রথমে অলৌকিক স্থূলসম 'মূর্ত্তিধ্যান', পরে সেই মূর্ত্তি হইতেও সূক্ষ্ম-ধ্যান অর্থাৎ যন্ত্র বা যন্ত্রান্তর্গত দেবতার বীজস্বরূপ দীপকলিকাসদৃশ জীবাত্মা বা সূক্ষ্ম 'জ্যোতির্ধ্যান', অনন্তর সূক্ষ্মতর পরমাত্মা স্বরূপ বা ব্রহ্মবিন্দু ধ্যান অথবা অখণ্ড-মণ্ডলাকারও অনন্ত ব্রহ্মচিন্তায় কেন্দ্রস্বরূপ বিন্দুধ্যান উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাঁহার সাধনাই—গুরুপরম্পরা নির্দ্দিষ্ট এই বিধান চিরপ্রচলিত রহিয়াছে।

পুষ্করিণী, সরোবর বা যে কোনও বিস্তৃত জলাশয়ের মধ্যে একখণ্ড ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হইলে, সেই ইষ্টকের আঘাতজনিত কেন্দ্ররূপে প্রথমে একটীমাত্র তরঙ্গ সেই জলের উপর সমুত্থিত হয়, তাহার পর বৃত্তাকারে তরঙ্গের পর তরঙ্গ পরিচালিত হইয়া, সেই সসীম তরঙ্গশ্রেণী অসীম জলের অনন্ত অঙ্গেই মিলাইয়া যায়,

ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্রের মধ্যে সেইরূপ তরঙ্গশ্রেণী-সম প্রকৃতির সসীম মূর্ত্তিসকলই সাধকের নিকট প্রথমে পরিদৃশ্যমান হয়, ক্রমে প্রতিলোমপথে তাহার মূলীভূত ব্রহ্মকেন্দ্র বা বিন্দুস্থান তাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। ('পূজা-প্রদীপে'—১৭১ পৃষ্ঠায়—'সগুণ ব্রহ্মবস্তু কি?' দেখ।) অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্মের বিস্তৃতি, জীবরূপে তাহার জীব-শরীরোপযোগী ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কোনও কালে ধারণা করা অসম্ভব। যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত, তাঁহার বিচ্যুতিতে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব কখনও সম্ভবপর নহে; সকলের মধ্যেই যে, তিনি অণু-পরমাণুরূপে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারই অতি সামান্ত কণা বা ব্রহ্মের সেই বিন্দুমাত্র প্রত্যক্ষস্বরূপ পরমাত্মারূপে সাধকের সর্ব্বস্ব বা পরম আরাধ্য ধন, তাঁহারই সাক্ষাৎকার সাধনার চিরআকাঙ্ক্ষা ও সাধনার সার। তাহাই সেই অসীম ব্রহ্ম-সমুদ্রের প্রকৃতি বা মায়াবিক্ষিপ্ত মূল তরঙ্গ-বিন্দু, তাহারই অসংখ্য তরঙ্গ বা পরিধিশ্রেণী, সাধক প্রথমে দর্শন করিয়া, সাধনার বলে, অন্তর্দৃষ্টিতে ক্রমে তাহার কেন্দ্রে আসিয়া উপনীত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, কেন্দ্রই বৃত্ত; অর্থাৎ একটী কেন্দ্র বা বিন্দুর পরিমাণ ৩৬০ অংশ, তাহার বৃত্তের পরিমাণও সেই ৩৬০ অংশ, সে বৃত্ত যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সাধক সেই মায়া-বিক্ষিপ্ত ব্রহ্মবৃত্তের বাহ্য বা স্থূল দৃশ্য হইতে সাধন-সহযোগে ক্রমে অতি সূক্ষ্ম কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেই ব্রহ্ম-সাযুজ্যের পরিণত অবস্থায় ব্রহ্মরূপে অনন্ত ও অনাদি ব্রহ্ম দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে। কস্তুরীমৃগের স্বীয় নাভি হইতে বিস্তৃত

সৌরভে সমগ্র কানন পরিপূর্ণ, অজ্ঞ মৃগ তাহা বুঝিতে না পারিয়া সেই মনোমুগ্ধকর সৌরভের অনুসন্ধানে যেমন কাননের সর্ব্বত্র ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহান্তর্গত ব্রহ্মবিন্দুর অনুসন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত, সাধক ব্রহ্মের সেই সসীম বৃত্ত বা তাহারই আত্মা বা নাভিনিঃসৃত সৌরভমোহে যেন মুগ্ধ মৃগের ন্যায় বাহিরেই প্রকৃতির স্থূল—মূর্ত্তির ধ্যান—সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, পরে সূক্ষ্ম-পরমাত্মা বা ব্রহ্মবিন্দুর সাক্ষাতে জীবাত্মার মিলনদ্বারা ব্রহ্মানন্দলাভ করিয়া থাকে। যাহাহউক পূর্ব্বকথিতরূপ সাধনার ক্রম-অনুসারে সকল সাধককেই পূর্ব্বোক্ত-রূপ 'চতুর্ব্বিধ--ধ্যান'-ধারায় ক্রমোন্নত সাধনা সম্পন্ন করিয়া আসিতে হয়। বাস্তবিক কঠোর সাধনা ব্যতীত এই সূক্ষ্মতম ধ্যানের কথা সাধারণ ব্যক্তি কিছুতেই বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারিবে না। কেবল একনিষ্ঠ যোগসাধনালব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। এ অবস্থায় ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত আজ্ঞা-চক্রমধ্যে প্রদীপ্ত দীপশিখার ন্যায় যে সূক্ষ্ম আত্মজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয় তাহার প্রকৃত বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সেই জ্যোতিরাভ্যন্তর্গত স্বচ্ছতম জ্ঞানগুহার মধ্যদিয়া সাধকের এই আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ সাধনার আকাঙ্ক্ষিত আসল জিনিসটি প্রত্যক্ষীভূত হইলে, ঘট পট বা তাহার প্রতিমূর্ত্তিতেই কেবল দেবতা-বুদ্ধি থাকে না, পরন্তু তাহার কেন্দ্রীভূত মূলদেবতায় সাধক তন্ময় হইয়া থাকে। তখন পরগৃহে সামান্য মুষ্টিভিক্ষার আশায় সময় অতিবাহিত না করিয়া, স্বগৃহে স্বযত্ন প্রস্তুত পরমান্ন ভোজনের ন্যায় গৃহস্থ (এক্ষেত্রে 'সাধক') পরিতোষ লাভ করিয়া

থাকে। বাস্তবিক আত্মতত্ত্ব-প্রত্যক্ষ হইলে, আর সাধকের ঘট, পট বা প্রতিমাকল্পনার প্রয়োজন হয় না, কারণ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধিতে তখন কল্পনার আরোপ বিদূরিত হয়। তখন কেবল শিবলিঙ্গ বা শালগ্রামেই যে দেবতা জ্ঞান থাকে, তাহা নহে, প্রতি বালুকণার পরমাণুমধ্যেও তখন ব্রহ্ম-সন্দর্শন লাভ হইতে থাকে।

যাহা হউক 'কুণ্ডলিনী' যখন পূর্ব্বোক্ত ললনা-চক্রস্থিত সমস্ত দেবতা বা বৃত্তি লয় করিয়া এই আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত হইবেন, তখন এই স্থানেরও শিব, শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, সত্ত্বাদি গুণত্রয় এবং ত্রিগুণাত্মক ত্রিমূর্ত্তি প্রভৃতি কুণ্ডলিনী-শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রাণায়াম বা বায়ুর ক্রিয়া এই স্থানেই শেষ হইয়াছে, ইহার উপর আর বায়ু যাইতে পারে না। বায়ুর গুণ স্পর্শ, সুতরাং কুণ্ডলিনী যতক্ষণ বায়ু বীজাত্মিকা ভাবে জীবাত্মার সহিত মিলিতা ছিলেন, ততক্ষণ পরস্পরের স্পর্শজ্ঞান বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে আকাশাত্মিকা হইয়া যেন শূন্যময়ী হইয়া পড়িলেন, সেই কারণ নিম্নস্তরের পৃথ্বাত্মক বীজগুলিও এখন শূন্যরূপে পরিণত হইল। সুষুম্না—নাড়ীস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্ররূপা ব্রহ্মনাড়ী এই পর্য্যন্ত আসিয়া 'যুক্তত্রিবেণীতে' লীন হইয়াছে। এক্ষণে এইস্থান হইতে শ্বেতবর্ণ 'শঙ্খিনী—নাড়ী' বা ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, সুষুম্না কেবল সহস্রারের আশ্রয়রূপে অবস্থিত রহিল। আকাশাত্মিকা কুণ্ডলিনী এক্ষণে সেই নাড়ীপথ ছাড়িয়া নিরালম্বময় পরমপথ ধরিয়া পরব্রহ্মে লীন হইবার উদ্দেশ্যে আরও উত্থিতা হইবেন; কিন্তু সেই উত্থানবিধি সাধারণ গুরুপদেশেরও অতীত, অর্থাৎ

তাহা শিক্ষা দিবার প্রকট ভাষা ব্রহ্মজ্ঞ-গুরুরও নাই। ব্রহ্ম তখন সদ্‌গুরুর অন্তরাদেশ সহযোগে সাধকের স্বীয় পূর্ব্ব সাধনাভিজ্ঞতা-লব্ধ অসাধারণ তত্ত্ব-জ্ঞানেরই কর্ত্তা, আত্মজ্ঞানই তখন আপন ভাবে সাধককে ব্রহ্মভাবে উপনীত করিবে॥ জীবশক্তি-কুণ্ডলিনী, এক্ষণে পরমাত্মা-সহযোগে একীভূত হইয়া সুষুম্নাপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অব্যক্ত শঙ্খিনী-রূপা নিরালম্ব পথের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইহার সহিত এইস্থল হইতে সুষুম্নার আদৌ সংযোগ নাই, সুতরাং উভয়ের মধ্যে শূন্য কিয়দংশ ব্যবধান আছে, সেই শূন্যময় স্থানের নাম 'নিরালম্বপুরী', এই স্থানে ঐ সূক্ষ্মতম অব্যক্ত ব্রহ্মনাড়ী-আশ্রিত ব্রহ্মবীজ 'তারকব্রহ্মমন্ত্র' বা প্রণব ওঁকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। ওঁকার বেদ-প্রতিপাদ্য 'ব্রহ্মরূপ' এবং সদাশিব ও আদ্যাশক্তি-সহযোগে প্রত্যক্ষ 'প্রণবস্বরূপ'। শিববীজ "হ"কার। তদাকার 'গজকুম্ভাকৃতি' হইয়াই তাহা "ওঁ"কার। এই "ও"কার-রূপ পর্য্যঙ্কের উপর যেন 'নাদ'রূপা 'ঁ' দেবী এবং তদুপরি "ং" বিন্দুরূপ * অর্থাৎ পরব্রহ্মকেন্দ্র মিলিত হইয়া কামকলাকারা "ঁ" চন্দ্রবিন্দুসদৃশ আকারযুক্ত হইয়া শিবশক্তি বা প্রতিব্যোমভাবে প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যসহযোগে যোগিগণের যোগপ্রতিপাদ্য এই পরমধন 'ওঁ' প্রণবের নির্দ্দেশ হইয়াছে। সাধক আজ্ঞাচক্রে আসিয়া যেন শূন্যময় হইয়াছে, কিন্তু শূন্য বা 'আকাশের' গুণ 'শব্দ', 'ধ্বনি' বা 'নাদ'। বিশ্বের সকল ধ্বনিরই মূল বা আদি কারণ এই ওঁকার নাদ বা ধ্বনি। সাধকশ্রেষ্ঠ এই

* 'পূজাপ্রদীপে'—'শ্রীপাদুকাপঞ্চকস্তোত্র' বর্ণনা দেখ।

'নিরালম্বপুরীতে' ব্রহ্মস্বরূপ মহজ্জ্যোতিঃ পরমাত্মা "ওঁ"কার অপরোক্ষভাবে দর্শন করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়া থাকেন।

অনেক অদূরদর্শী সাধক এই আজ্ঞাচক্র বা তপোলোকের বিষয় সম্যক্ অবগত না হইয়া তাহাদের হীনবুদ্ধি-সুলভ বিবিধ উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত ব্যাখ্যাদ্বারা কত কথাই যে বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বহু অনভিজ্ঞ স্বার্থপর যোগ-গ্রন্থপ্রকাশক বা গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই সাধকচূড়ামণি মহাদার্শনিকরূপে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিয়া কত অদ্ভুত বিচিত্র চিত্র-সহযোগে এই সকল চক্রের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া 'গুরুমণ্ডলী' স্তম্ভিত হইয়া যোগমায়ার নিকট তাহাদের সদ্বুদ্ধির জন্য করুণ-ভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যিনি যে অধিকারের সাধক তিনি তাহার গণ্ডীর বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাইলেই স্বভাবতঃ কত কি কিম্ভূত—কিমাকার কল্পনা করিয়া বসেন! স্থূল-বুদ্ধিসুলভ স্থূল-ধ্যানমূলক মূর্ত্তিপূজাই যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, তাঁহারা পরের কথায় 'ব্রহ্মচিন্তা' করিতে অগ্রসর হইলে, তাঁহাদের সাধনার ফলে ব্রহ্ম 'স্থূল-রূপাত্মক' হইয়া তত্তদ্ বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া থাকেন। মানব-মাত্রেই সাধারণতঃ গুণসমষ্টির মধ্যে পতিত থাকিয়া নির্গুণ বা গুণাতীত বিষয় ধারণা করিতে পারে না। সেই কারণ 'নিরালম্ব-পুরীর' শূন্যাত্মক নাদানুভব তাঁহাদের ধারণার অতীত বিষয়, তথাপি সেই 'সহস্রারের' উপরের অনধিকার বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার ফলে তাঁহাদের অধিকারের অনুরূপ 'কৃষ্ণ', 'বিষ্ণু', 'কালী', 'তারা', 'হরগৌরী', 'রাধাকৃষ্ণ', অথবা 'সীতারাম' আদি যুগলরূপময়

চিত্রমূর্ত্তি সহস্রারের মধ্যে আঁকিয়া বসেন। নাম, রূপ ও ভাবের অতীত যে বস্তু, তাহা ভাষা বা চিত্রেরও যে অতীত, এই সরল কথাটীও তাঁহারা মনে রাখিতে পারেন না; অথবা সে অব্যক্তভাবের অনুভব তাঁহাদের কল্পনাতীত হইলেও, অহঙ্কারপুষ্ট সাধনভ্রান্ত জীব উপদেশস্থলে নিজ গুরুত্ব লাঘব করিতে পারেন না, সুতরাং অসঙ্কোচে সংস্রারের পথে নিম্ন অধিকারী-সুলভ মন্ত্রধ্যানময়ী 'স্থূলমুক্তির' উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। অবশ্য এরূপ নির্ব্বাণোপদেশ, কেবল মুখস্থ বা 'বুকনিবাজী' ব্যতীত আর কিছুই নহে। শাস্ত্রকার শিবস্বরূপ মহাপুরুষগণ সকলকেই স্ব স্ব অধিকার মত উপদেশ দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; সাধকমাত্রেরই তাহাতে দৃঢ়চিত্ত ও সাধনরত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ক্রমে উচ্চতর সাধনাবলী সহজলভ্য হইবে। যোগগ্রন্থসমূহে 'মুক্তি চতুষ্কধ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা--সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, ও সাযুজ্য। মণিপুর পর্য্যন্ত সাধনায় সাধক যোগমার্গের দ্বারে স্বর্লোকে উপস্থিত হন, সেই কারণ 'ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ'-সিদ্ধিতে সাধকের 'সামীপ্য-মুক্তি' বা ব্রহ্মজ্ঞানের সূত্রপাত বলিয়া উক্ত হয়। তাহার পর অনাহত সাধনায় মহর্লোকে সাধক 'বিষ্ণু-গ্রন্থি ভেদ' করিলে 'সালোক্য-মুক্তি' বা ব্রহ্মজ্ঞান-মার্গের দ্বিতীয় স্তরে আসিয়া উপস্থিত হন, এই স্থানে সাধক স্ব স্ব ইষ্টমূর্ত্তির দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। সাধকের জীবনীশক্তি বা কুণ্ডলিনী-শক্তিও এই স্থানে জীবাত্মার সহিত মিলিত হইবার কারণ, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করে। শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি পুরুষ-প্রকৃতি যুগলভাবে এই স্থানেই

প্রকটরূপে দৃষ্ট হন। সেই হেতু এই স্থানকে 'রাস মণ্ডল' বলে। অনন্তর বিশুদ্ধচক্রের সাধনায় সাধক জনলোকের পর্য্যায়ে উপস্থিত হইলে, 'সারূপ্য-মুক্তি' যে কি, তাহা স্পষ্ট অনুভব করেন। তাহারপর যখন সাধক সাধনামার্গে আরও অগ্রসর হন, তখন সাধনার 'ষষ্ঠ-জ্ঞানভূমি' বা 'তপোলোকের'-সাধনায় আজ্ঞাচক্রে আসিয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যথার্থ নাদানুভূতিরূপ শূন্যাত্মক হইয়া যান, ইহাই সাধকের দেহপিণ্ডরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে 'সাযুজ্য-মুক্তি'-লাভ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এখানে আসিয়াও পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ জীবাত্মা ও কুণ্ডলিনীশক্তির পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা থাকে, কারণ তখনও যে, 'সুষুম্নাসূত্র' বিচ্ছিন্ন হয় নাই! মূলাধার হইতে এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বানুরূপ সংযুক্ত রহিয়াছে। এই সুষুম্নাপথের উপরের শেষপ্রান্তে 'অর্দ্ধচন্দ্রাকার' বা নাদাকার একটী আবদ্ধ দ্বার আছে, রুদ্রগ্রন্থিভেদ-ব্যপদেশে বায়ু-বীজাত্মক কুণ্ডলিনী তখন সেই দ্বার ভেদপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয়রূপে দণ্ডাকার তেজোরেখাস্বরূপ হইয়া নাদের সূক্ষ্ম অঙ্কে লীন হইয়া যান, সুতরাং বায়ু-তত্ত্বের সমাপ্তি এই স্থানে; তাহার উপর বায়ু আর প্রবেশ করিতে পারে না, এ কথা অনেক বার বলা হইয়াছে। উন্মুক্ত দ্বারমাত্রেই বায়ু গমনাগমন স্বাভাবিক, কিন্তু সেই দ্বার যদি স্বচ্ছ কাচের ন্যায় 'সার্শি' দ্বারা বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার মধ্য দিয়া আর বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু 'আলোক' বা তেজঃরশ্মি অনায়াসেই তাহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ লৌকিক আলোকের পরিচালক বস্তু মাধ্যবিকা বা 'মিডিয়ম' যেমন 'ঈথার' তাহা বায়ু-পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম, একথা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদেরাও বেশ বুঝিতে পারেন, তাই ঈথর আলোকের

পরিচালক স্বরস্বরূপ। এ স্থলে সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মরন্ধ্রের বা ব্রহ্মনাড়ীর প্রান্তস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডলাভাস দ্বারটীও সেইরূপ এক অপূর্ব্ব বায়ুবীজ-রোধক বিচিত্র উপাদানসহযোগে আবদ্ধ, কেবল পরমসূক্ষ্ম অলৌকিক মাধ্যবিকা পরমাত্মা-কিরণসহযোগে কুণ্ডলিনী-শক্তি-সংযুক্ত জীবাত্মা তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। সাধক, একবার সম্পূর্ণরূপে সেই 'নিরালম্বপুরীতে' উপস্থিত হইতে পারিলে, আর সুষুম্নাপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা থাকিবে না, সুতরাং তাহার প্রকৃত নির্ব্বাণ মুক্তি বা নির্ব্বিকল্প সমাধি তখনই হইয়া থাকে।

আজ্ঞাচক্র—সাধনা, অষ্টাভিষেকের মধ্যে ষষ্ঠ বা যোগাভিষেকের অন্তর্গত। এই স্থান হইতেই প্রকৃতপক্ষে উচ্চ যোগের সিদ্ধিকার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইহার উপরের কার্য্য পূর্ব্বসিদ্ধ ক্রিয়া ফলে এক্ষণে কেবল স্বীয় অনুশীলন দ্বারাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা আর গুরূপদেশের বিষয়ীভূত নহে, সেই কারণ গুপ্ত ও ব্যক্ত জড়িত আসলে নবচক্র হইলেও, এই স্থানটী ষষ্ঠ বা 'শেষ-চক্র' বলিয়াই সাধারণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতঃপর আজ্ঞাচক্রের পশ্চাতে বা উহার দুইটী দলের সংযোগ স্থলে গুপ্ত 'মনশ্চক্র' এবং পূর্ব্বকথিত 'নিরালম্বপুরীই' আংশিকভাবে ও 'সোমচক্র' নামে কথিত। ফলতঃ মনশ্চক্র ও সোমচক্র দুইটী অতি গুপ্তচক্র যথাক্রমে আজ্ঞাচক্রের সহিত সংলগ্ন ও উর্দ্ধে অবস্থিত আছে। সংক্ষেপে তাহারই আভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

মনশ্চক্র—দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাচক্রের দল দুইটীর পিছনের দিকে, উহাদের সংযোগস্থলে এবং নিরালম্বপুরীর সামান্য

নিম্নেই 'মনশ্চক্র' নামে একটী গুপ্তচক্র আছে। এখানে জীবাত্মার নিত্যসহচর 'মন' একান্তে অবস্থিতি করিয়া থাকে, জ্ঞানশক্তিযুক্ত এক শিবলিঙ্গ এখানে অহরহঃ অবস্থান করিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ও স্বপ্ন, এই ছয় প্রকার বৃত্তির ভাব তন্মাত্রাপথে জীবাত্মাকে অনুভব করান। মনশ্চক্র একটী ষড়্‌দল কমলের অনুরূপ, তাহার ছয়টী দলে শ্বেত, পীত, নীল লোহিত, অরুণ, ও কৃষ্ণ এই ছয় বর্ণে রঞ্জিত এবং তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ বৃত্তি অবস্থিত রহিয়াছে। সততঃ ভ্রাম্যমান মন ঘুরিতে ঘুরিতে যখন যে দলটীর উপর উপস্থিত হয়, তখন সেই ভাবই জীব বা জীবাত্মা অনুভব করিয়া থাকে। শ্বেত, পীত, নীল প্রভৃতি বর্ণের কি কি গুণ তাহা ইতঃপূর্ব্বে অনেকস্থলে বলা হইয়াছে, সাধনাভিলাষী পাঠক তাহা মিলাইয়া দেখিলে সমস্তই স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবে। আবার জ্ঞানশক্তি-সহযোগে 'লিঙ্গরূপী' শিবেরও অবস্থানহেতু শব্দাদি সর্ব্ববিধ জ্ঞানই এই স্থানে অনুভূত হইয়া থাকে। জীবের 'মনশ্চক্র' বিকল হইলে, আর কোনও জ্ঞানই উপলব্ধ হয় না। শারীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ এই স্থানকেই মস্তিষ্কের মূল বা মনের স্থান বলিয়া অভিহিত করেন। * জীব যাহা কিছু চিন্তা করে, যাহা কিছু ভাবনা করে, সে সমস্তই এই স্থানে সঞ্চিত হয় ও বর্ত্তমানকালের বহির্বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভাবিত "গ্রামোফোন্-রেকর্ডের" ন্যায় জীবের সমুদায় চিন্তিত ভাবই এই স্থানে স্তরে স্তরে রক্ষিত থাকে, জীবাত্মার ইচ্ছামত সময় সময় তাহা স্পন্দিত হইয়া পূর্ব্বচিন্তা স্মরণ করাইয়া দেয়। এইস্থলে একটী

* গীতাপ্রদীপে—'মস্তিষ্কই সকল জ্ঞানাধার' অংশ ও চিত্র দেখ।

কথা ভাবিবার আছে, অনেকে বলেন, স্মৃতির অভাব বিস্মৃতি; কিন্তু পূজ্যপাদ গুরুমণ্ডলী ঠিক তাহা বলেন না। কোন ব্যক্তির পুত্র-শোক হইয়াছে, সে ব্যক্তি শোকে নিতান্ত কাতর, কিন্তু পরক্ষণে কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হওয়ায় সে দুর্দ্দমনীয় শোকাবেগ কোথায় বিদূরিত হয়, আবার সময়ান্তরে সেই পুত্রশোকে পূর্ব্বানুরূপই তাহাকে কাতর করিয়া তুলে। এ স্থলে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই শোকের স্মৃতি একেবারে লোপ পাইল না, তবে অন্য কোন বস্তুর আবরণে তাহা যেন কিয়ৎকালের জন্য আবৃত রহিল, সেই আবরণ খুলিয়া যাইলেই, আবার তাহা পূর্ব্বের ন্যায়ই স্মৃতিপথে উদিত হইয়া ভোক্তার অনুভূত হইয়া থাকে। সেই কারণ সাধনার সময়ে মনঃস্থির করিবার উপক্রম করিলেই সেই সব পূর্ব্বচিন্তিত ভাব আবরণ-মুক্ত হইয়া স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইয়া থাকে, এবং মনশ্চক্রের সম্মুখীন হইয়া জ্ঞানশক্তি-সমন্বিত লিঙ্গরূপী শিবের প্রভাবে জীবাত্মার বোধগম্য হইয়া থাকে। কোন বিষয় একাগ্রভাবে চিন্তা করিবার ইচ্ছা করিলেই, বিশেষ ভগবচ্চিন্তা বা ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে বসিলেই, সাংসারিক জীবের সর্ব্বক্ষণের অনুষ্ঠান-পুষ্ট চিন্তার মধ্য হইতে নানা কথা প্রায় মনে পড়ে, তাহার কারণ সেই 'গ্রামোফোন-রেকর্ডের' সাহায্যে সঞ্চিত 'গ্রামোফোন'-যন্ত্রের অনুরূপ মনশ্চক্রিরই শক্তি-মাহাত্ম্য। যোগ ও সাধনোপদেষ্টা সিদ্ধ সাধক তাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—"যোগানুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য 'যম' বা 'সংযম,' তাহা সাধনাভিলাষীর কায়মনোবাক্যে সাধন করা বিধেয়; অর্থাৎ আহার-বিহারাদি যে সকল কার্য্য কায়দ্বারা

সংসাধিত হয়, তাহা যেমন প্রথমেই সাধকের সংযত করা বিধেয়, সেইরূপ বাক্য-সংযমও তাঁহাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, কিন্তু তৃতীয় বা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সংযম, 'মানস্ সংযম,' অর্থাৎ সাধনার বিঘ্নকর বা বিরুদ্ধ-ভাবাত্মক কোনরূপ হীন অথবা নিকৃষ্ট চিন্তা পর্য্যন্তও যেন মনোমধ্যে স্থান পাইতে না পায়। সে কলুষিত চিন্তাকে সতত বিমল সচ্চিন্তার আবরণে বা অন্তরালে রাখিতে হইবে, মন যেন তাহার ছায়াও দেখিতে না পায়॥ সাধক, পাপ-কার্য্যের ফল অল্প, কিন্তু পাপ চিন্তার ফল অনন্ত বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। কোন পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সম্পন্ন হইবামাত্রই তাহার বশবর্ত্তী ইচ্ছাও চিত্ত হইতে উন্মূলীত হইয়া থাকে, হয় ত বা অনুশোচনায় সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তিত পাপাভিলাষ, তাহা সম্পন্ন না হইবার কারণ কার্পাসে বা 'তুলায়' অগ্নিসংযোগের ন্যায় ভিতরে ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে, যখনই সে সুবিধা পায়, অথবা মনের অনুকূল একান্তের অবসর পায়, তখনই সে সহসা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং তাহার পার্শ্বে সমাগত সদিচ্ছাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পুড়াইয়া নষ্ট করে। অথবা সেই অতৃপ্ত-পাপ-বাসনা ও বৃত্তি গুলি গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত মনশ্চক্রের নিকটেই যেন অনাদরে অবহেলায় পড়িয়া থাকে, মন কোন সচ্চিন্তার জন্য একাগ্র হইবার উপক্রম করিলেই, তাহারা দুর্দ্দান্ত দস্যুর মত সেই সচ্চিন্তাগুলিকে আহত করিয়া যেন বীণার ঝঙ্কারে আপনাদের গানই গাহিতে থাকে; সুতরাং সাধকের জপ, তপ, ধারণা, ধ্যান সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়, মন চঞ্চল হইয়া উঠে, চিন্তাপ্রবাহ আর সাধকের অভিলষিত

পথে প্রবাহিত হয় না। সেই কারণ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সাধকের মন সংযত হইতে পারে, তাহার প্রতি সাধনার্থীর প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা পদে পদে অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন সহ্য করিতে হইবে—সাধনা নষ্ট হইবে।

সাধক আজ্ঞাচক্র হইতে আকাশাত্মিকা পরম জ্যোতির্ম্ময়ী কুণ্ডলিনীযুক্ত আত্মাকে এইরূপে মনশ্চক্রে উপনীত করিলে, আকাশ বীজ 'হং' মনশ্চক্রে লয় হইবে, পরে মনের বৃত্তিসমুদায় এবং মনশ্চক্রস্থিত শিবও ক্রমে কুণ্ডলিনীতে লয় হইয়া যাইবে, অর্থাৎ মনশ্চক্র সর্ব্বাবয়বে কুণ্ডলিনীতে কেন্দ্রীভূত হইবে, সুতরাং আর কোন ভাবই তখন মনোগোচর হইবে না। অনন্তর ইহারও উপরে তখন 'সোমচক্র' সাধকের উপভোগ্য হইবে।

সোমচক্র—পূর্ব্বকথিত আজ্ঞাচক্রসন্নিহিত মনশ্চক্রের উপর 'সোমচক্র' নামে আর একটী গুপ্ত-চক্র আছে। তাহার ষোলটী দল। সেই ষোড়শ-দলকে সোমের ষোড়শ-কলাও বলা যায়। ষোড়শ-কলাত্মক দলগুলির নাম যথা—কৃপা, মৃদুতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পৎ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য্য ও একাগ্রতা। সাধক, মনশ্চক্রের সাধনায় পুষ্ট বা সিদ্ধ হইলেই সোমচক্রের অধিকারী হইতে পারিবে, অর্থাৎ সোমচক্রে কুণ্ডলিনীশক্তিকে উত্থাপন করিতে পারিবে, বাস্তবিক এই নবচক্রক্রিয়ার সাধনা সম্পূর্ণ না হইলে, সাধকের চিত্ত সম্পূর্ণ নিরোধ হইবে না। শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেব এই নবচক্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ সাধক ছিলেন। ('জ্ঞানপ্রদীপে'—'লয়যোগ' অংশ দেখ)। যোগসূত্রের প্রথমেই শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলীদেব বলিয়াছেন—'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'

এই যে সূত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এখনই ঠিক অনুভূত হইবে। আর সোমচক্রস্থিত ষোড়শগুণবিশিষ্ট যে ষোলটী দলের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই কৃপা, মৃদুতা ধৈর্য্য, ধৃতি প্রভৃতি, সমস্তই সাধক এই সময় অনুভব করিতে পারিবে, বা তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিবে। কুণ্ডলিনী এই স্থানে আসিলেই মনশ্চক্র-পুষ্ট ও ভাবাত্মক ভাব যাহা কুণ্ডলিনীতে এ যাবৎ সংক্রামিত হইতেছে, সেই সমস্তই 'সোমতত্ত্বে' বা সোমরসে এইবার বিধৌত ও বিলীন হইবে, বা সোমচক্রস্থিত বিশুদ্ধ ভাব-ষোড়শে সুধামণ্ডিত হইয়া পরিপ্লুত হইবে। ইহার অন্তর্গত সেই 'নিরালম্বপুরী'। নিরালম্বপুরীর বিষয় ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ক্রিয়া পূর্ণভাবে অনুভব করিয়া সাধক অবশিষ্ট সাধনা সম্পন্ন করিয়া লইবে।

মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র এই ছয়টী চক্র এবং তদতিরিক্ত ললনা, মন ও সোম এই তিনটী চক্র লইয়া একুনে নয়টী চক্রের বিষয় উক্ত হইল। ইহাই যোগানুষ্ঠানের বা সাধন-ক্রিয়ার নয়টী বিভিন্ন স্তর বা আচার। ইহার কার্য্যকলাপ বা উপলব্ধি করিবার বিধি-নিয়মে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, সাধক নামধারী যোগীরূপে পরিচিত হইয়া থাকে। তাই ইতঃপূর্ব্বে 'যোগস্বরোদয়ো'ক্ত শিববাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—

"নবচক্র কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং।
সমগ্রং যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ॥"

যাহাহউক বেদাচার হইতে কৌলাচার পর্য্যন্ত যে নববিধ আচার-তত্ত্বের বিষয় 'তন্ত্র-রহস্যের' প্রথমখণ্ডে বা 'সাধন-প্রদীপে' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও এই সোমচক্রে আসিয়া সমাপ্ত হইল।

শাস্ত্রোক্ত 'অষ্টাভিষেক' যাহা সদ্গুরুর আশীর্ব্বাদস্বরূপ সাধক গ্রহণ করিয়া থাকে, ইতঃপূর্ব্বে মনশ্চক্রের সাধনায় তাহাও সম্পন্ন হইয়াছে। নবচক্রের অতীত বা নবম চক্রস্থ নিরালম্ব-পুরীতে আর গুরুর উপদেশ নাই, আর কোন অভিষেকও নাই। ইহাই শ্রীগুরুপাদুকাপীঠ বা 'শ্রীগুরুপাদুকাকমল' ('পূজাপ্রদীপে' —ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত বর্ণনা দেখ) এ এক অপূর্ব্ব স্থান, এখানে আসিলে সাধক যাহা উপলব্ধি করে, তাহা যথার্থই বর্ণনাতীত। তাহা কোন ভাষার সাহায্যেই ব্যক্ত করা অসম্ভব। এখানে তুমি আমি নাই—'তত্ত্বমসি' বা 'সোহম্‌ও' এখানে যেন প্রায় জড়ীভূত * হইয়া গিয়াছে; আগে, পাছে, ভিতরে, বাহিরে, কেবল "ওওম্‌"! তাই সাধকচূড়ামণি রামপ্রসাদ, দূর হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া ভাবঘোরে বলিয়া ফেলিলেন—"এ বড় বিষম ঠাঁই গুরু শিষ্যে ভেদ নাই;" তাই মহাকৌল শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যও তাহার দ্বার-সন্নিহিত হইয়া তন্ময়ভাবে বলিয়া ফেলিলেন—

"ন গুরু র্ন শিষ্যাশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌॥"

শিবস্বরূপ বৃদ্ধ-ব্রহ্মানন্দও সেই কারণ অদ্বৈতবাদের বিচার-প্রার্থী শঙ্করাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন—"বৎস, সে অবস্থায় তুমি আমি ত প্রভেদ থাকিবে না!" তাঁহারা দূর হইতে বা সেই অব্যক্ত জ্ঞানের দ্বার-সমীপ হইতেই যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, ভিতরের কোন কথাই বলেন নাই। তাহার কারণ সে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধকের আর এরূপ বলিবার শক্তি থাকে

* 'পূজাপ্রদীপে'—৮৫ পৃষ্ঠায় 'গুরুপাদুকাকমলে-আত্মলয়' দেখ।

না। তখন যে, তাহা এ বাক্য ও মনেরও অগোচর! বাক্‌শক্তি পূর্ব্বেই ত গিয়াছে, মন ছিল, সোমচক্রে তাহাও যে লয় হইয়াছে, এখন নিরালম্বপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলই যে একাকার! কে কারে কি বলিবে? ষট্‌পদ যতক্ষণ পুষ্পাভ্যন্তরে মধুপানে নিরত থাকে, ততক্ষণ কি সে গুঞ্জন করিবার অবসর পায়? সাধকের মনোভৃঙ্গও সেইরূপ সাধনার 'ষট্‌পদে' 'ষট্‌চক্র' অথবা গুপ্ত-বাক্যে নবচক্র অতিক্রম করিয়া একবার সোম-সুধা বা ঋষিদিগের চিরপ্রিয় 'সোমরস' পান করিতে বসিলে, আর বৃথা বাক্যব্যয় ত করেই না, পরন্তু তাহার পর সেই সোমরসরূপ মধুপানে মত্ত হইয়া যায়, মধুভাণ্ডে সে তখন নিমজ্জিত হইয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত ও (তৎ-ময় বা) তন্ময় হইয়া যায়, তাহার 'আমিত্ব' বা 'অহম্‌কার' সেই রস-সাগরে বিসর্জ্জন করে, তাহার 'শিবত্বও' তখন শবত্বে বা শবরূপ পর-শিবে পরিণত হইয়া যায়! অনুলোমভাবে 'গুরু' হইতে 'মন্ত্রও' 'মন্ত্র' হইতে 'দেবতা' এবং সাধকের সেই ইষ্টগুরুরূপ দেবতায় 'অহম্‌কার' বা 'আমি' সমস্তই মিলিত হইয়া প্রতিলোমপথে পুনরায় গুরুচরণ প্রান্তে আসিয়া যেন একাকার! তাই সাধক বলেন, "সে বস্তুতই বিষম ঠাঁই, তথায় গুরু-শিষ্য, সাধ্য-সাধক, ভক্ত-ভগবান কোনও ভেদই নাই।" ('পূজাপ্রদীপে'—'পরিশিষ্ট' অংশে—'গুরুতত্ত্ব' দেখ) যাহাহউক সাধক, তোমায় চিরবাঞ্ছিত ও চিরআরাধিত পরমস্থানে আসিয়া তোমার জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত প্রাণের সকল জ্বালা এইবার শীতল কর।

সহস্রার—পূর্ব্বে শুনিতাম 'ষট্‌চক্র', কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িয়া দেখিলাম নবচক্র, তাহাও ত সোমচক্রে আসিয়া শেষ হইল!

তথাপি জগজ্জননী যোগমায়ার মায়াচক্রের বুঝি আর অন্ত নাই! এখন আবার ঐ অদূরে নবচক্রাতীত-চক্র 'সহস্রার' দৃষ্ট হইতেছে। অঙ্কশাস্ত্রে, সংখ্যার গণনায় (১) হইতে (৯) নয়এর পর (০) শূন্য পরিকল্পিত হইয়াছে। অনন্ত রাশি এই একমাত্র শূন্য-সাহায্যেই গণিত হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রেও নয়টী চক্রের পর সহস্রার বিন্দ্বাত্মক 'অনন্ত-চক্র'; ইহার সীমানির্দ্দেশ মানবোক্তির সাধ্য নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শঙ্খিনী-সূত্ররূপে সুষুম্নার সূক্ষ্মতম মৃণাল-তন্তুতে সহস্রার অবস্থিত। এ সহস্রারের প্রকৃত 'রূপ-বর্ণনা' না করিলেও, সাধক 'নিরালম্বপুরী' হইতে তাহা আপন বলেই দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন। তখন সহস্রার তাঁহার অনায়াসলভ্য হইবে, কোন নূতন শিক্ষা দীক্ষাই আর তখন তাঁহার প্রয়োজন হইবে না। তবে সাধারণ সাধকের কৌতূহল নিবারণার্থ পূর্ব্বাচার্য্যগণকথিত সহস্রার-বর্ণনার একটী সামান্য আভাষমাত্র এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। ('পূজাপ্রদীপে' ২২ পৃষ্ঠায় 'সহস্রদল ও গুরুপাদুকাকমল' দেখ)।

'সহস্রার' বর্ণনা প্রসঙ্গে আর একটী অপূর্ব্ব কমলের কথা আবশ্যক, তাহা সহস্রারেরই যেন অধিকারভুক্ত। এটী সর্ব্বদাই উর্দ্ধমুখে আছে, ইহার দ্বাদশটী শ্বেতবর্ণ দল বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং "হ স খ ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ" এই দ্বাদশ-বর্ণাত্মক 'গুরু-পাদুকা মন্ত্র' এক একটী বিদ্যুদ্বর্ণ-অক্ষরে তাহার প্রত্যেক দলে বিরাজিত রহিয়াছে। সাধক এই স্থানে প্রত্যক্ষ গুরু-পাদুকা-মন্ত্র দর্শন করিয়া প্রণাম করিবে ইহাই সেই অদ্ভুত গুরু-পাদুকা কমল। অনন্তর এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অকথাদি ত্রিকোণ-রেখারূপ যে কামকলা বা শক্তিপীঠ আছে, তাহাই পরম

শিবের স্থান, সাধক এই স্থলেই জ্ঞানময় সদ্‌গুরুর ধ্যান করিয়া থাকে। এই স্থানেই পরমানন্দপ্রদ সুধাসাগর মণিদ্বীপ, মণি-পীঠাদি আছে, তাহারই মধ্যে নাদ-বিন্দুর অন্তর্গত গুরু-পাদুকা-পীঠ। গুরুর পাদপীঠস্বরূপ হংসাখ্য শরীর, সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি; তাঁহার পাদদ্বয় আগম ও নিগম বা সেই চরণযুগলই সাক্ষাৎ শিবশক্তিময়, তাঁহার চঞ্চুপুট যেন প্রণব-স্বরূপ, এবং নেত্র ও কণ্ঠ যেন কামকলা-স্বরূপ অর্থাৎ কণ্ঠাংশ অর্দ্ধচন্দ্রাকার নেত্রত্রয়ই ত্রি-বিন্দু, ইহাদের সমাহারেই প্রকৃত কামকলারূপ প্রতীয়মান হইবে। (পূজাপ্রদীপে চিত্র ও ব্যাখ্যা দেখ) এই সকলের উপর ব্রহ্মরন্ধ্রে কেন্দ্রস্থ হইয়া 'সহস্রদল-কমলটী' অধোমুখে যেন ছত্রাকারে উক্ত পাদুকাদলের সমস্তই আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। সাধক প্রথম হইতেই গুরুর ধ্যান কালে, গুরুর পাদুকা-পীঠের ছত্ররূপে এই সহস্রারকে চিন্তা করিবে, তাহা হইলেই উহার সম্বন্ধে কালে প্রকৃত জ্ঞান হইবে, ইহা শিব-প্রতিম গুরুমণ্ডলীর স্থির আদেশ। তাহার পর সমাধির অবস্থায় সহস্রার যেরূপ প্রতীয়মান হইবে, তাহা যোগীন্দ্রেরই উপভোগ্য, তাহা অক্ষর-যোজনালব্ধ বাক্যের বিষয়ীভূত নহে, তাহা স্বয়ং অনুভাব্য।

সে যাহাহউক সাধারণতঃ সহস্রার অর্থে একটী সহস্র-দলবিশিষ্ট শ্বেতগর্ভ সপ্তবর্ণযুক্ত বিচিত্র কমল। তাহার পঞ্চাশটী করিয়া দলে এক একটী স্তর, এইরূপ কুড়িটী স্তরে তাহার সহস্র দল পূর্ণ হইয়াছে। প্রতি স্তরে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দলে অকারাদি পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ শোভিত রহিয়াছে। এই সহস্রদলের কর্ণিকার মধ্যে নিম্নে যুক্ত পাদুকাকমলের একটী ত্রিকোণ শক্তিমণ্ডল আছে, ইহাকেই অকথাদি ত্রিরেখা বলা

যায়। সেই ত্রিরেখাময় যন্ত্রের কোণত্রয় হইতে সমুত্থিত তিনটী তেজোরশ্মির মিলনরূপ কেন্দ্রস্থলের উপর কোটী কোটী মধ্যাহ্ন-সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট তেজোময় অতি শুভ্র স্ফটিক বর্ণ একটী বিন্দু আছে, তিনিই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা। যোগ সমাধির ফলে অতিরিন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার অনুভব হইয়া থাকে। ইনিই ব্রহ্মস্বরূপ পরমশিব, বা ব্রহ্মবিন্দুস্বরূপ ইঁহারই অন্তরে সকল সুধার আধার গোমূত্রবর্ণা অমাকলা আছেন। যোগিগণ সেই অমাকলাকে আনন্দভৈরবী ব্রহ্মশক্তি বলিয়াও বর্ণনা করিয়া থাকেন। এতন্নিঃসৃত সুধাধারা পান করিয়াই যোগীন্দ্রগণ পরিতৃপ্ত বা সমাধিমগ্ন হইয়া থাকেন। এইস্থলে কুণ্ডলিনীশক্তি অকুল বা পরমশিবে মিলিত হইবার পূর্ব্বাভাসে 'কুলকুণ্ডলিনী' হইয়া যান।

জীবমস্তিষ্কে 'সহস্রদল-কমল' আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই তাহার অন্তর্নিহিত। সাধকের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ দেহের অন্তর্বস্থিত মূলাধার হইতে সকল তত্ত্বই যেমন এখানে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ সিদ্ধযোগীর উক্ত 'জ্ঞান-হৃদয়ে' বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রতিবিম্ব সতত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক একখানি ক্ষুদ্র দর্পণের মধ্যে যেমন বহুবিস্তৃত দৃশ্যাবলীর সমস্তই প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়, সহস্রদলমধ্যে সেইরূপেই বিশ্বের সমস্তই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই 'কামকলার' মধ্যে বা মুক্তি কামনারূপ সেই সাধন কলার মধ্যেই আবার আরও সূক্ষ্ম 'নির্ব্বাণকলা' বা 'নির্ব্বাণশক্তি' সতত বিদ্যমান আছে; সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনর্থক, তাহা

সাধনার পথে স্বীয় অনুভব ব্যতীত অন্যের কথায় কিছু মাত্রই উপলব্ধ হইবে না; সুতরাং সে গুহ্য ও বাক্যাতীত বিষয় সম্বন্ধে আর অধিক কি লিখিব! তবে সিদ্ধ যোগীন্দ্রগণ একবাক্যে এইমাত্র বলিয়া থাকেন যে, সাধারণ মনুষ্য বা জীবমাত্রেই রমন-সময়ে যে এক অনির্দ্দেশ্য আনন্দ অনুভব করেন, সাধক সহস্রার-স্থিত হইলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সে ক্ষণস্থায়ী সম্ভোগ-সুখের তুলনায় তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক অপার ও অক্ষয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সে সুখ বা আন বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, সে যথার্থই অপার্থিব অভূতপূর্ব্ব ও অলৌকিক বিষয়। যে পূণ্যবান্ সাধক তাহার আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি ত ধন্যই, অপিচ যাঁহারা এমন সমাধিস্থ সাধকের দর্শনলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও ধন্য। সাধনার বিষয়ে সাধকের ইহাই চরম উন্নতি। সাধক প্রথম অবস্থায় উচ্চতম সাধকের ন্যায় এই চরমসাধনায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও, তাহাকে অন্তর্ভূতশুদ্ধি সাধনায় নিত্য এইরূপ সহস্রাদির বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তাহা হইলেও যে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে, তাহাও অনির্ব্বচনীয়; পরন্তু রীতিমত অভ্যাস করিলে, কালে যে নিত্য বিমলানন্দও যে, উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও সেই শিবপ্রতিম সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীর অতি গুহ্য আদেশ ও উপদেশ।

এক্ষণে অন্তর্ভূতশুদ্ধি-সাধন পরায়ণ সাধক যে ভাবে মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনী-উত্থাপন করিয়া, চক্র হইতে চক্রান্তরে অতিক্রম-পূর্ব্বক সহস্রার পর্য্যন্ত আসিয়া পরমাত্ম-সহযোগে তাহার মিলন-সাধন বা তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়াছে, সেই ভাবে প্রতিলোম

ক্রিয়ায় মূলাধারে কুণ্ডলিনীকে পুনরায় স্থাপনা করিতে হইবে। পাঠক পূর্ব্বে যে—

"পীত্বা পীত্বা পুনর্পীত্বা পতিতাচ মহীতলে।
উত্থায় চ পুনর্পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

এই শিববাক্যটীর এক অতি হেয় তামসিক কদর্থ যাহা অজ্ঞ ব্যক্তিগণের মুখে শুনিয়া একদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলে, এক্ষণে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি কর। একবার 'মহীতল' বা ষট্‌চক্র নির্দ্দিষ্ট পৃথ্বি-বীজাধার 'মূলাধার' হইতে সহস্রার-পরিচালিত মহাতেজোময়ী কুণ্ডলিনীকে অমৃতানন্দময়ী চিন্তা করিবে, অথবা সেই সহস্রারান্তর্গত পূর্ব্বকথিত 'সোমচক্র'—'সোমরস' পান ও সেই সুধা-সমুদ্রে নিমজ্জিত বা 'অমৃতাপ্লুত' করিয়া কুণ্ডলিনীকে পরম-শিবে অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত সামরস্য-সম্ভোগ করাইয়া তাঁহার কুণ্ডলিনীরূপ অনুভব করিতে ও তাঁহাকে অব্যক্ত পুনরায় মূলাধারে আনয়ন করিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ ক্রিয়া-সহযোগে সুষুম্না-পথে গমনাগমন করিতে পারিলে, অথবা প্রথম প্রথম কেবল সেই পথের চিন্তামাত্র করিলেও সাধকের ভবযন্ত্রণা-ভোগ লাঘব হইয়া আসিবে।

সহস্রার হইতে নিম্নপথে প্রথম নিরালম্বপুরীতে প্রণবাত্মক নাদবিন্দু দর্শন করিয়া যখন সোম ও মনশ্চক্রে, ক্রমে আজ্ঞাচক্র প্রভৃতিতে উপস্থিত হইবে, তখন তত্তৎ চক্র-নির্দ্দিষ্ট মন পরম শিবলিঙ্গ, কাকিনীশক্তি, সত্ব, রজঃ, তম এবং চক্রস্থ অন্যান্য সমুদায় তত্ত্ব পুনরায় সৃষ্টি বা তাহার উৎপত্তি চিন্তা করিতে করিতে সুষুম্না-পথের পিঙ্গলাত্মক দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া নামিয়া আসিবে, ক্রমে শেষ মূলাধারে সেই পৃথ্বিতত্ত্ব লংবীজের উপর

কুণ্ডলিনী বা জীবনীশক্তিকে স্থাপনা করিবে। এইরূপে বার বার সেই সুষুম্না পথের জ্ঞান চিন্তার দ্বারা ইড়াত্মক বামপার্শ্ব দিয়া উঠাইতে ও পিঙ্গলাত্মক দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া নামাইতে অভ্যাস করিবে। ইহাই সম্পূর্ণ 'ভূতশুদ্ধি', আর এইরূপ ভাবে চিন্তা দ্বারাই ক্রমে চিত্ত স্থির হইবে। তখন স্বাগ 'ভৈরব' বা তচ্ছক্তি 'ভৈরবীতে' তদ্গত হইয়া ত্রি-গ্রন্থি ভেদসহ নাদোচ্ছাস হইবে—

"জাগো গো মা 'কুণ্ডলিনী', 'মূলাধার'-নিবাসিনী।
স্বয়ম্ভূশিব-সঙ্গিনী, ছাড় গো 'ব্রহ্মের দ্বার'॥
বিহর মা সদা রঙ্গে, চক্রে ষট্‌শিব-সঙ্গে।
যাচিছে করুণা তব, অকিঞ্চন অনিবার॥
'স্বাধিষ্ঠান' 'মণিপুর' 'অনাহত' 'বিশুদ্ধাখ্য'।
'ললনাজ্ঞা' ' ভেদি 'মন', পিয়ে 'সোম'-সুধাধার॥
'নিরালম্বে' অবলম্বন, দাও মাগো এইবার।
শিবমুখ-বিনিঃসৃত, তুমিই শক্তি সাধনার॥
মিলিয়ে 'পরমশিবে', 'কুলকুণ্ডলিনী' এবে
শোভি কেন্দ্র 'সহস্রারে', হও গো মা একাকার॥
চিরশান্তি লাভ-আশে, সকাতরে স্তুত ভাবে।
শ্রীগুরুপাদুকা-প্রান্ত, 'সচ্চিদানন্দ' পারাবার॥"

সাধক, পূর্ব্বকথিত মত যে চক্র পর্য্যন্ত সাধনার ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, সেই পর্য্যন্তই তাহার সেই সাধনা এক প্রকার সিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে; সুতরাং সেই সেই সময় এক এক চক্র বা কুল অতিক্রম করিয়া কালে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। সেই পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষাভিষেক আদি যথাক্রমে অষ্টাভিষেক ও নব আচার এইভাবে সমাপ্ত হইবে। নবচক্রেই

নয়টী আচার সম্পন্ন হইবে, কিন্তু অভিষেক সম্বন্ধে আটটীই থাকিবে, কারণ নবম চক্রের ক্রিয়া-সাধনায় আর দীক্ষা বা অভিষেক-বিধি নাই; ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যেক চক্রকে এক এক কুল বলা হইয়াছে, এখন সাধক বুঝিতে পারিবে, সেই নবচক্রই নয়টী কুল, এই নয়টী কুল উত্তীর্ণ হইতে পারিলে অকুল ক্ষীরোদের কূলে উপনীত হইতে পারিবে। যে সাধক এই নবকুলের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণ কুলাচারী, কুলীন বা কৌল। সেই কারণ কৌলের নয়টী আচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ কৌলীন্য-লক্ষণও তাহার অনুকরণে সেই নবধা আচারবিশিষ্ট অর্থাৎ 'আচার' 'বিনয়' ইত্যাদি। যাহাহউক এক্ষণে কায়মনে সেই অকুলের পথচিন্তা কর—নিশ্চয়ই অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিবে। যোগ বল, সাধন ভজন বল, সকলেরই মূল সেই ভূতশুদ্ধি, সাধকমাত্রেরই এ কথা যেন সতত স্মরণ থাকে। জীবদেহের কারণভূত পঞ্চভূতের বিশুদ্ধি সাধনদ্বারা জীবাত্মাসহ পরমাত্মার যে অপূর্ব্ব সংযোগ সাধিত হয়, তাহাকে উন্নত বা শ্রেষ্ঠ ভূতশুদ্ধি বলে।

"দেহকারণ ভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং।
অব্যয়ঃ ব্রহ্মসংযোগাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা॥"

প্রাণায়াম ঃ—ভূতশুদ্ধির মধ্যে অনেকস্থলে প্রাণায়াম: করিবার বিধি আছে, সকল পূজা-পদ্ধতির মধ্যেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রাণায়াম-ক্রিয়া যোগেরও একটী প্রধান অঙ্গ। প্রাণায়াম অর্থে প্রাণ-বায়ুর সংযম বা প্রাণের সূক্ষ্ম ব্যায়াম। যোগশাস্ত্রের মধ্যে উক্ত আছে।

"চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।

যোগীস্থাণুত্ব মাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥"

দেহস্থিত বায়ু চঞ্চল হইলে, চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাণায়াম ক্রিয়াদ্বারা সেই বায়ু নিশ্চল হইলেই চিত্তের স্থিরতা উপস্থিত হয়, যোগীরা তখন 'স্থাণুর' বা শাখাপল্লববিহীন বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় সুস্থির হইতে পারেন; সুতরাং বায়ু-নিরোধ করা যোগাভিলাষী ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে 'প্রাণ ও অপান' বায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে। সেই প্রাণের সংযম করিবার বিধি অনন্ত প্রকার; কিন্তু তাহার যথার্থ ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যাঁহার যেমন ইচ্ছা তিনি সেইরূপেই ইহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহাতে সময় সময় নানারূপ বিঘ্ন, এমন কি কখন কখন উৎকট ব্যাধি উৎপন্ন হইতেও দেখা যায়। সেই কারণ এতদ্ সম্বন্ধে যাহা গুরুমণ্ডলী কর্ত্তৃক অতি গুপ্তভাবে উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহারই কতিপয় বিষয় পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইতেছে।

যে প্রাণ বা জীবনী-শক্তি, বায়ু অবলম্বনে শ্বাসপথে অহরহঃ বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহারই বিধিবদ্ধ সংযম ক্রিয়ার নাম 'প্রাণায়াম'। মূলাধার-তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, উচ্ছ্বাস অর্থাৎ প্রতি উর্দ্ধশ্বাস বা বহিঃশ্বাসে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ প্রাণ-বায়ুর ক্ষয় হইতেছে, অর্থাৎ সাধারণতঃ আমাদিগের নিম্নশ্বাস অর্থাৎ অন্তরশ্বাস বা নিশ্বাস গ্রহণ সময়ে আমরা যত বেগে বায়ু-আকর্ষণ করি, তাহার দৈর্ঘ্য বেগ-পরিমাণ (Velocity) দশ অঙ্গুল মাত্র, কিন্তু প্রশ্বাস ফেলিবার সময় তাহার দৈর্ঘ্য গতি বৃদ্ধি হইয়া দ্বাদশ অঙ্গুলে পরিণত হয়। ইহাতে প্রত্যেকবার দুই অঙ্গুলি

করিয়া প্রাণের ক্ষয় হইতেছে। ইহাই সাধারণ বা মানবমাত্রের নিত্য-হিসাব। যে কেহ কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেই এই নিয়ম দেখিতে পাইবে। কিন্তু পরিশ্রমজনক কোন কার্য্য করিলে, সেই প্রশ্বাসবেগ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া থাকে। দৌড়াদৌড়ি বা অত্যন্ত দ্রুতপদে গমনাগমন করিলেও প্রশ্বাসবেগ দীর্ঘ হয়, জীবমাত্রেই এরূপ অবস্থায় হাঁপাইতে থাকে। কিন্তু স্ত্রী-গমনকালে সেই বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে যে প্রাণের অতি সত্বর ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; যোগিগণ সাধন-ক্রিয়ার অবলম্বনে সেই প্রাণ-বায়ুর বহির্বেগ সংযত করিয়া ভিতরের দিকে তাহা বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াস করেন। তাহার ফলে জীবনী-শক্তি পুষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে আয়ুও বর্দ্ধিত হয়, এবং দীর্ঘকাল দেহ সুপুষ্ট থাকিয়া কঠিনতর সাধনার উপযোগী করিয়া রাখে; সুতরাং পাঠক এখন সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, সেই জীবন-ক্ষয়কর প্রাণ-বায়ুর বহির্গতি সংযত করাই প্রাণায়ামের প্রধান উদ্দেশ্য। নিদ্রাকালেও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সে সময় তাহার অন্তর্গতিও (Deep breath) সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে শরীরের বাহ্য যন্ত্রসমূহ বিশ্রামলাভ করে, পক্ষান্তরে অন্তরেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। নিদ্রাও মানুষের বিধিনির্দ্দিষ্ট বিশ্রামাত্মক শান্তিরূপ পরমভোগ। এ ভোগানন্দ না থাকিলে, মানুষ দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতেও পারিত না। সেই কারণ নিত্য নিয়মমত নিদ্রা যাওয়া জীবন-ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই (Deep breath) দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ দ্বারাই মানবের অন্তরেন্দ্রিয় অথবা অতীন্দ্রিয়ের

কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন হয়; আমরা সাধারণতঃ আমাদের স্বপ্ন মাত্র অনুভব করি, কিন্তু যোগিগণ তাঁহাদের সুষুপ্তি অবস্থা অনুভব করেন; জাগ্রত অবস্থায় প্রাণ-বায়ুর সেই দীর্ঘ অন্তঃপ্রবাহ বর্দ্ধিত করিতে পারিলে, সিদ্ধ সাধক বসিয়া বসিয়াই সেই অতীন্দ্রিয়ের কার্য্যাবলী অনুভব করিতে পারেন। অতএব প্রাণ-বায়ুর বহির্গতি সংযত করিয়া তাহার অন্তর্গতি বর্দ্ধিত করাই প্রাণায়ামের অন্যতম প্রধান কার্য্য।

এই প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে সাধারণতঃ যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছে। সেই ১। পূরক, ২। কুম্ভক এবং ৩। রেচক; পূজা-অর্চ্চনা, যোগ-যাগ সকল কার্য্যোপলক্ষেই সাধারণে তাহা করিয়া থাকেন। ১। পূরক অর্থাৎ নিশ্বাস বায়ুযোগে দেহমধ্যে বায়ু পূর্ণ করা; ২। কুম্ভক অর্থাৎ সেই বায়ু দেহকুম্ভ বা শরীরের মধ্যে পূর্ণ করিয়া রাখা; এবং ৩। রেচক অর্থাৎ সেই কুম্ভিত বায়ু প্রশ্বাস বায়ুপথে রেচন বা পরিত্যাগ করা। এক্ষণে বুঝিতে হইবে, সেই বায়ু সাধারণতঃ কেমন করিয়া প্রথমে পূরক, পরে কুম্ভক, তাহার পর কি ভাবেই বা রেচন করিতে হইবে। সাধারণে বলিয়া থাকেন—"চার, ষোল, আট; বা আট, বত্রিশ, ষোল; অথবা ষোল, চৌষট্টি, বত্রিশ, এইভাবে কার্য্য করিতে হইবে।" কিন্তু ইহার কার্য্য বা উদ্দেশ্য কি? সাধারণের ধারণা অথবা অনভিজ্ঞ গুরু বা উপদেষ্টারা বলিয়া থাকেন যে, "যতবার কোন মন্ত্র জপকালে সঙ্গীতের মাত্রার ন্যায় গণনা করিয়া বায়ু আকর্ষণ করিবে, তাহার চতুর্গুণ সময় বা মাত্রা পরিমাণ দেহমধ্যে বায়ু পূর্ণ করিয়া যেন দম আটকাইয়া বসিয়া থাকিবে তখন আর

বায়ু ত্যাগ করিবে না, অনন্তর দুইগুণ মাত্রা সময়ের মধ্যে বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। এই ভাবে যে ব্যক্তি যত অধিকক্ষণ দেহমধ্যে বায়ু পূর্ণ করিয়া রাখিবে, সে ব্যক্তি প্রাণায়াম-সাধনা-কার্য্যে ততই সুপারগ হইবে।"

প্রাণায়ামের গূঢ় উপদেশ—উক্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই 'দাঁত মুখ খিঁচাইয়া' যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া দম আটকাইয়া রাখিতে অভ্যাস করে। তাহার ফলে সহসা হৃদয়ের বা বক্ষঃস্থলের অথবা মস্তিষ্কের কোন কোন যন্ত্র বিকৃত হইয়া উৎকট ব্যাধিতে পরিণত হইয়া যায়; এমন ঘটনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, প্রাণায়াম করিবার উপদেশ যা'র তা'র নিকট হইতে বা যে সে পুস্তক দেখিয়া অভ্যাস করিতে আরম্ভ করা কখনই বিধেয় নহে। কি ভাবে বা কতক্ষণ ধরিয়া কুম্ভক করিলে যথার্থ উপকার হইবে, তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে কার্য্য করিবে, নতুবা তাহার ফল হয় ত মঙ্গলপ্রদ হইবে না। কোন পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিলেই যে, তাহাতে শরীর পুষ্ট হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। খুব ভাল জিনিসও অধিক মাত্রায় খাইলে হয়ত তাহাতে অজীর্ণ উৎপাদন করিতে পারে, অথবা তাহাই স্বাভাবিক। সকল জিনিসেরই মাত্রা আছে, প্রত্যেকের দেহ বা অবস্থার উপর তাহা নির্ভর করে। একব্যক্তি অকৃত্রিম গব্যঘৃত হয়ত একছটাক পর্য্যন্ত সহজে হজম করিতে পারে, তাহাকে কোন দিন সহসা একপোয়া বা দেড়পোয়া পরিমাণ ঘৃত একেবারে খাইতে দিলে তাহার কি ফল হইতে পারে তাহা ত সহজেই অনুমেয়! কুইনাইন, জ্বরের ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, দুই চারি

গ্রেণ করিয়া কয়েকবার খাইলেই জ্বর বন্ধ হয়, তাহা বলিয়া উপর্য্যুপরি দুই চারি ড্রাম বা বিশ ত্রিশ গ্রেণ করিয়া এক একবারে খাইতে দিলে, কি ফল ফলিতে পারে, তাহাও ত কাহারও অবিদিত নাই ; যে ব্যক্তি কোন দিন এক ক্রোশও পথ চলে নাই তাহাকে সহসা বিশ ক্রোশ হাঁটিতে হইলে কি দশা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয় ! সুতরাং সাধকের শরীরের ও চিত্তের অবস্থা দেখিয়া এই পরম মঙ্গলপ্রদ প্রাণায়াম-ক্রিয়ার অভ্যাসকল্পে কুম্ভকাদির স্থিতিকাল নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আবার অতি উগ্র সুরা যাহার বিন্দুমাত্র পান করিলে কেহ কেহ অজ্ঞান ও উন্মত্ত হইয়া যায়, অভ্যাসযোগে তাহাই অধিক মাত্রায় পান করিলেও, যেমন মত্ততার ভাব অনেকে অনুভব করে না, সেইরূপ প্রাণায়ামও শরীরের অবস্থা বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত না হইলে শরীরের যন্ত্র-বিশেষ সহসা 'বিকল' হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব প্রাণায়াম-শিক্ষার্থী সাধক এ বিষয়টী বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে প্রাণায়ামের কার্য্য আরম্ভ করিবে।

প্রথম শিক্ষার্থীর সেই সুবিধার নিমিত্তই সিদ্ধ-গুরুপরম্পরা-নির্দ্দিষ্ট তাহার উপদেশ এক্ষণে কিছু কিছু বর্ণিত হইতেছে। সাধনাভিলাষী, মনোযোগ দিয়া ইহা পাঠ কর, যখন সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে তখনই শ্রীগুরুর চরণ-স্মরণ করিয়া শুভক্ষণে ধীরে ধীরে কার্য্যে অগ্রসর হইবে।

'সাধনপ্রদীপে' অষ্টবিধ প্রাণায়ামের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ইতঃপুর্ব্বে সকলেই দেখিয়া থাকিবে। সে সকলের

মূলবিধি প্রায় একরূপই—সেই পূরক, কুম্ভক, রেচক সকলের মধ্যেই বিদ্যমান আছে বা ইহাই প্রাণায়াম-ক্রিয়ার সাধারণ নিয়ম। সুতরাং এই নিয়মটাই অগ্রে ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক।

প্রথম পূরক বা বায়ু আকর্ষণ বিধি—এই আকর্ষণ-কার্য্যটী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যতদূর সম্ভব সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত 'যম' ও 'নিয়মের' কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট 'আসনে' স্থির হইয়া উপবেশন করিবে। কারণ 'যম', 'নিয়ম' ও 'আসন' এই ত্রিবিধ যোগাঙ্গে কতকটা অভ্যস্ত না হইলে, প্রাণায়ামের আদৌ অধিকার হইবে না। এই ত্রিবিধ সাধনা অভ্যাসের পর সাধনার্থী ব্যক্তি যে কোনও প্রাণায়াম নিজ স্বাস্থ্য বা অধিকারের অনুযায়ী—অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশমত আরম্ভ করিবে। তখনই তাহার প্রথম কার্য্য হইবে 'বায়ু-আকর্ষণ,' অতএব স্থির ও সরলভাবে বসিয়া এমন ধীরে ধীরে অথচ অবিরত ভাবে বায়ু-আকর্ষণ করিবে যে, যদি কেহ পার্শ্বে বসিয়া থাকে, সে ব্যক্তি ত জানিতে পারিবেই না, অপিচ নিজেও সে নিশ্বাস-গ্রহণ-শব্দ কর্ণে শুনিতে পাইবে না; অর্থাৎ সাধারণতঃ যেরূপ বেগে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, প্রাণায়াম-অভ্যাসকালে তাহা অপেক্ষা যতদূর সম্ভব ধীর ও গভীর ভাবে বায়ু আকর্ষণ করিতে হইবে। অনেকে এই বিধি না জানায়, অথবা নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে আপনার বাহাদুরী দেখাইবার জন্যই বোধ হয় খুব জোরে বায়ু টানিতে থাকে। কিন্তু এরূপ ভাবে বায়ু আকর্ষণ বা পূরক ও বায়ুর রেচন বা ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। যোগশাস্ত্রমধ্যেও স্পষ্ট উপদেশ আছে—

"যেন ত্যজেত্তেন পীত্বা ধীরয়েদ অবিরোধতঃ।
রেচয়েচ্চ ততোঽন্যেন শনৈরেব ন বেগতঃ॥"

এই পূরকাদি ক্রিয়ার সময়-নির্দ্ধারণ-সম্বন্ধে '৪।৮।১৬' প্রভৃতি কত লোকে কত কথাই বলিয়া থাকেন, প্রকৃত সাধনার্থীর তাহা এখন ভুলিয়া যাইতে হইবে। অসহ্য হইলেও 'দাঁত মুখ খিঁচাইয়া' না জানি কি একটা অসাধারণ ক্রিয়া করিতেছি ভাবিয়া ক্রমাগত বায়ু টানিতেছি, এরূপ করা যে খুবই অন্যায় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তবে অবিরত বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত না কোন কষ্ট অনুভব হয়, সেই পর্য্যন্তই আকর্ষণ করিবার পর প্রাণায়ামের দ্বিতীয় কার্য্য কুম্ভক করিবে ;—তাহার স্থিতিকাল সাধারণতঃ পূরকের চতুর্গুণ সময় এবং তাহার ত্যাগ বা রেচন ক্রিয়া পূরকের দুইগুণ-ব্যাপী সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। সেই কারণ তাহার ঠিক কালনিরূপণার্থে বাম-কর-মালায় মন্ত্র জপ করিবার নিয়ম আছে। কেহ পূরকের সময় চারিবার নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া কুম্ভকের সময় ষোলবার এবং রেচন-কালে আটবার জপ করিয়া থাকেন ; ইহাই অনেকের মতে প্রাণায়ামের সাধারণ বা প্রাথমিক সময়-কল্পনা, ইহার পর পূরকে আট বার এবং কুম্ভকে বত্রিশ বার এবং রেচকে ষোল বার ; আবার তাঁহার পরই একেবারে পূরকেই ষোলবার, কুম্ভকে চৌষট্টি বার এবং রেচকে বত্রিশ বার জপ করিবার উপযোগী সময় ব্যাপী প্রাণায়ামবিধি প্রায় সকল যোগশাস্ত্রমধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ গুরুমুখে অবগত না হইয়া, অনেকেই সেই সব পুথী-দেখিয়া নিজে নিজেই প্রাণায়াম-পুষ্ট হইবার জন্য পর পর সাধারণ নিয়মত্রয় পালন করিয়া

থাকে। তাহার ফলে প্রাণায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই না, অধিকন্তু শরীর ক্লান্ত ও সহসা কোন না কোন রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

আমাদের সকল শাস্ত্র, বিশেষ তন্ত্রের বা সাধনশাস্ত্রের সাধনোপদেশগুলি সম্পূর্ণ সঙ্কেতাত্মক, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও শাস্ত্র 'অধম', 'মধ্যম' ও 'উত্তম' এইরূপ তিনটী সময়-নির্দ্দেশক সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তি, নির্দ্দিষ্ট 'একাক্ষরী-মন্ত্র' বা প্রণবমন্ত্র 'চারি বার,' অথবা 'এক' হইতে 'দুই', 'তিন' করিয়া 'চারি' গণিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে অনায়াসে 'বায়ু আকর্ষণ' করিতে পারে, সেই অনুপাতে 'ষোল বার' সেই মন্ত্র জপ করিতে বা 'এক' হইতে 'ষোল' পর্য্যন্ত গণিবার সময় মধ্যে কোনরূপ আয়াস বা ক্লেশ বিনা 'বায়ু ধারণ' করিতে পারে, অনন্তর 'আটবার' সেই মন্ত্র জপ অথবা 'এক' হইতে 'আট' পর্য্যন্ত গণিবার সময় মধ্যে বিনাক্লেশে খুব ধীরে ধীরেই যে কেহ 'বায়ু পরিত্যাগ' করিতে পারে, ইহাকে অধম অর্থাৎ সাধারণ বা প্রাথমিক প্রাণায়াম বলা যায়। ইহার পর মধ্যম ৮।৩২।১৬, তাহাও কেহ কেহ সামান্য কষ্টে সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে একেবারে ১৬।৬৪।৩২ সংখ্যক প্রাণায়াম অনেকের পক্ষেই কষ্টকর, অথচ সকলেরই মনে হয়, এইটী সম্পন্ন হইলে সিদ্ধি যেন তাহার করতলগত হইবে। কাজেই অনেকে সেই জন্য প্রাণপণে দম আটকাইয়া বসিয়া থাকে, পরে 'রেচন সময়ে' বায়ুর বেগ আর সামলাইতে না পারিয়া হু হু শব্দে বন্যার স্রোতের মত সেই

আবদ্ধ বায়ু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া পড়ে, আবার পরক্ষণেই সেই ভাবে দেহ প্রবলবেগে আপনা আপনি বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়, তখন আর সেই বাঁধা নিয়ম বা জপের কাল সম্বন্ধে কোন স্থিরতা থাকে না; কাহারও হয় ত মনে মনে মন্ত্রের গণনাই চলিতেছে, কিন্তু যথাসময় বা তাহার নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কুম্ভক ও রেচকও হইয়া যায়, অধিকন্তু আবার পূরক হইতে থাকে। ঠিক নিয়ম মত অভ্যাস করিলে, এমন হইবার কোন আশঙ্কা থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে যে প্রাথমিক নিয়ম ৪।১৬।৮ বলা হইয়াছে, সাধক সেই নিয়মেই প্রাণায়াম আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। অর্থাৎ ইহার পরবর্ত্তী মধ্যম বিধি বা একেবারে দ্বিগুণ মাত্রায় প্রাণায়াম না করিয়া, পূর্ব্ব নির্দ্দেশ হইতে এক এক মাত্রা করিয়া বাড়াইয়া, ক্রমে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণে পরিণত করিতে হইবে। সাধনার্থী যখন বুঝিতে পারিবে যে, ৪।১৬।৮ এই নিয়মে ক্রিয়া তাহার সহজ হইয়াছে; পূরক, কুম্ভক ও রেচক ক্রিয়ার জন্য একটুও কষ্ট হইতেছে না, তখন একেবারে ৮।৩২।১৬ মাত্রা অবলম্বন না করিয়া মাত্র একটী মাত্রা বাড়াইয়া অর্থাৎ ৫।২০।১০ মাত্রা গ্রহণ করিবে। তাহাতেও অভ্যাস সহজ হইয়া আসিলে, আর এক মাত্রা বাড়াইয়া ৬।২৪।১২ মাত্রা গ্রহণ করিবে; এই ভাবে এক এক মাত্রায় ক্রমে ৭।২৮।১৪ সম্পন্ন হইলে, ৮।৩২।১৬ মাত্রার প্রাণায়াম অবলম্বন করা বিধেয়। ইহাই গুরুমণ্ডলীর সিদ্ধ-উপদেশ। সাধারণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা না জানিয়া নিজেও মরেন, পরকেও মজেন। যাহা হউক এক্ষণে সাধনার্থী নিজের অবস্থা বুঝিয়া ক্রমে অতি ধীরে ধীরে এক এক মাত্রা বাড়াইয়া রীতিমত

প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, এমন অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে, যখন অনায়াসে বায়ুর বেগ-ধারণ জনিত কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করিয়া ১৬।৬৪।৩২ কি? ইহা ত সামান্য কথা! ইহা অপেক্ষা বহু দীর্ঘ অর্থাৎ একাধিক্রমে একদণ্ড কাল ধরিয়া পূরক, তাহার চতুর্গুণ বা চারিদণ্ড কাল ধরিয়া কুম্ভক, এবং পূরকের দ্বিগুণ সময় বা দুই দণ্ড কাল ব্যাপী রেচক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেও পারিবে। সাধকের সর্ব্বক্ষণ স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাধারণ বায়ুর বেগ যেন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসে। তিনি ইচ্ছা করিলে, তাহার পরীক্ষার জন্য পাখীর একটী অতি নরম পালখ বা একটু কার্পাস 'তূলা' নাসিকার সম্মুখে ধারণ করিলে, বায়ুর প্রবাহ জনিত তাহার আন্দোলন-ভাব আর বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইবে না, এমনই ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাঁধিয়া লইতে হইবে, তবেই প্রাণায়াম সিদ্ধি সহজ হইবে, নতুবা কোন কালেই ইহার দ্বারা চিত্ত স্থির হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অধিকন্তু শারীরিক ও মানসিক নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তাই যোগশাস্ত্রে স্পষ্ট বর্ণিত আছে—

"যথা সিংহোগজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ।
তথৈব সেবিতো বায়ুরন্যথা হন্তিসাধকম্॥
প্রাণায়ামাদিযুক্তেন সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ।
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বরোগ সমুদ্ভবঃ॥"

অর্থাৎ সিংহাদি বন্যজন্তুদিগকে যেমন ধীরে ধীরে বশীভূত করিতে হয়, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বায়ু সাধনা করিলেই প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইবে; এবং নিয়মিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে সাধকের

সর্ব্ব রোগ বিনষ্ট হইবে, অন্যথা বা ইহার অপব্যবহার দ্বারা নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া সাধকের জীবন সংশয় হইতে পারে। যাহাহউক প্রাণায়াম যে চিত্ত-স্থির করিবার পক্ষে একটী প্রধান অবলম্বন মাত্র তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে সেই প্রাণায়াম কার্য্যোপলক্ষে যদি তোমার চিত্ত কেবল ঐ 'মাত্রা-গণনা' করিতেই ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে স্থিরচিত্তে 'ভগবৎ-চিন্তা' করিবে কখন? সাধনাভিলাষী এ কথাটীও একবার ভাবিয়া দেখ! সঙ্গীতজ্ঞ এ কথার মর্ম্ম সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। প্রথম প্রথম গীত শিক্ষা কালে, তাঁহারা যেমন করতালি-সহযোগে মাত্রা দিয়া যে কোন রাগ-রাগিনীর অন্তর্গত স্বরের স্থিতিকাল নিয়মিত করিয়া থাকেন, কালে তাহা অভ্যস্ত হইলে, আর সেই ভাবে প্রত্যেক সময়েই মাত্রা বা তালি দিবার প্রয়োজন থাকে না। তখন তাহার একটী 'লয়' মাত্রই যেমন অভ্যস্ত হইয়া থাকে, কলাবৎ তাঁহার যে কোন রাগের সূক্ষ্মতম স্বর বা সুর-বিকাশে তখন তন্ময় হইয়া যান, কিন্তু সে কারণ তাঁহার পূর্ব্ব-সিদ্ধ 'লয়ের' বা তদন্তর্গত মাত্রার কোনরূপ কম বেশী আর হয় না, যথাকালে সঙ্গীতের 'সোমাঘাত' আপনি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ব্রহ্মস্বর-আলাপনেও সেই বিধি অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে ৪।১৬।৮ বা ঐরূপ কোন মাত্রা প্রাণায়াম-কালে ব্যবহার করিলেও, পরে সে মাত্রা বা সে কর-জপের প্রতি আর লক্ষ্য থাকিবে না, তখন সেই অভ্যাসবশতঃই যতক্ষণে 'পূরক', তাহার চতুর্গুণ সময়ে 'কুম্ভক', এবং দ্বিগুণ সময়ে 'রেচক' ক্রিয়া আপনিই হইয়া যাইবে, অথচ ভগবৎ-চিন্তা ব্যতীত গণনা-

চিন্তায় চিত্ত নিয়োজিত থাকিবে না। যোগক্রিয়ায় প্রাণায়াম একটী 'গৌণ' কার্য্য, তাহার 'মুখ্য' উদ্দেশ্য ব্রহ্মতন্ময়তা, ইহা সাধকমাত্রেরই যেন সতত স্মরণ থাকে, তাহা না হইলে পূর্ব্বকথিত যোগের বিঘ্ন-চতুষ্টয়ের মধ্যে পতিত হইয়া কেবল প্রাণায়াম লইয়াই চিরজীবন কাটাইতে হইবে। কোন কোন সঙ্গীত শিক্ষার্থীর 'সা, রে, গা, মা,' বা বাদ্য শিক্ষার্থীর 'তেরে কেটে তাক' সাধনার মত জীবন কাটিয়া যাইবে, কোন কালেই স্বাধীন ভাবে 'গান-বাজনা' করিবার সাধ পূর্ণ হইবে না, সঙ্গীতের বা সেই সাধনার বিমল আনন্দ উপভোগ হইবে না।

যাহাহউক পূর্ব্বকথিত সেই অষ্টবিধ প্রাণায়ামের মধ্যে কাহার পক্ষে কোনটী উপযোগী, তাহা এখন বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন, অথবা বহুদর্শী বিশেষজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া বিধেয়।

যাহার শরীর বেশ সুস্থ ও সবল, কোন প্রকার ব্যাধি নাই, অথচ ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট, তাহার পক্ষে ব্রহ্ম প্রাণায়াম যাহা আমাদিগের সন্ধ্যা-গায়ত্রীর সহিত প্রচলিত আছে, তাহাই উপযোগী। ('সন্ধ্যাপ্রদীপ' বা 'সন্ধ্যারহস্য' দেখ)। অন্যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্ম-প্রাণায়াম অভ্যাস করা সকলের পক্ষে হিতকর নহে। আজকাল অধিকাংশ ব্যবসায়ী (দীক্ষামাত্রেই জ্যোতিঃ অথবা ইষ্টদেবতা প্রদর্শক বা একদিনে মুক্তিদাতা) গুরুর' পাল্লায় পড়িয়া অনেকেই সেই কঠিনতম ব্রহ্ম-প্রাণায়াম বা সাধারণ সহিত-প্রাণায়াম দীর্ঘকাল বিধি-বিহীন ভাবে অভ্যাস করিবার ফলে নানাবিধ কুটিল রোগাক্রান্ত হইয়া অনতিকাল মধ্যেই তাহার সেই ব্যাধিগ্রস্ত দেহপিঞ্জর হইতে এই জীবনের মত মুক্ত হইয়াছেন। সেই

কার পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত না হইলে, কেবল নিত্যপূজা বা সন্ধ্যাগায়ত্রীর জন্য সামান্য ক্ষণমাত্র উক্ত ব্রহ্মপ্রাণায়াম ক্রিয়ার অথবা সহিত-প্রাণায়ামদির অবলম্বন ব্যতীত কদাপি বহুক্ষণ ধরিয়া উহা যোগানুষ্ঠান-ব্যাপারে নিয়োজিত করিবে না। কেবল ঋতুরক্ষা জনিত মাসে একদিন মাত্র স্ত্রীতে উপগত হইয়া যাঁহারা গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করেন, তাঁহারাই এবং আজন্ম ব্রহ্মচারিগণই এই ব্রহ্ম-প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ অধিকারী। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, স্ত্রী-সহবাসাদি বীর্য্যক্ষয়কার্য্যে কালাকালের বিচার রাখিতে অসমর্থ, তাহারা এই 'প্রাণ' জিনিসটা লইয়া যেন পাগলের মত খেলা করিতে না যায়। কোন প্রাণায়ামেই তাহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না, বিশেষতঃ ব্রহ্ম-প্রাণায়াম ও অনিয়মিত সহিত-প্রাণায়ামও তাহাদের উৎকট বিষ-ক্রিয়াই প্রদান করিবে ; সুতরাং ইহা সকলের পক্ষে দীর্ঘকাল সাধন করা কখনই হিতপ্রদ নহে।

অল্প অল্প 'শীতলী-প্রাণায়াম' অনেকের পক্ষেই শুভকর, তাহা 'সাধনপ্রদীপে' উক্ত হইয়াছে, তবে যাহাদের স্থায়ীভাবে অগ্নি-মান্দ্য পীড়া জন্মিয়াছে, ক্ষুধা কম, আহারে তেমন রুচি নাই, কোন জিনিস খাইয়াই তাহা হজম করিতে পারেন না, অথবা কফপ্রধান-ধাতু তাহাদের পক্ষে শীতলী-প্রাণায়াম তত হিতকর নহে। কারণ শীতলী-প্রাণায়ামে শরীরাভ্যন্তরস্থ নাড়ীসমূহ শীতল করে ; সুতরাং যাহাদের অগ্নিদীপ্তি আদৌ নাই, অগ্নি-নাড়ী ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, তাহাদের এ প্রাণায়ামে উক্ত নাড়ী আরও শীতল হইয়া হিমাঙ্গ হইয়া যাইবে, অতএব সম্পূর্ণ অগ্নি-মান্দ্য রোগীর পক্ষে ইহার অপকার ব্যতীত কোন উপকার হইবে

না। আবার 'ব্রহ্মপ্রাণায়ামে' বা সহিতাদি অন্যপ্রাণায়ামে যাহাদের শরীর গরম হইয়া গিয়াছে বা কোনরূপ হৃদয়-রোগ জন্মিয়াছে, অথবা যাহারা স্বাভাবিক পিত্ত-প্রধান, যাঁহাদের হাত পা, চক্ষু সতত গরম থাকে বা বৈকালে তাহাতে জ্বালার অনুভব হয়, যাঁহাদের সামান্যমাত্র অজীর্ণ-রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে 'শীতলী' অমোঘ-ঔষধস্বরূপ। ইহার অভ্যাসে তাহারা যথেষ্ট উপকার অনুভব করিবে। আবার যাহাদের দেহ কফ ও পিত্ত ধাতু-জড়িত, তাহাদের পক্ষে সায়ংকালে 'শীতলী' এবং উষাকালে 'ব্রহ্মপ্রাণায়াম' বা সহিত প্রাণায়াম হিতকর। এই সকল বুঝিয়া সুঝিয়া তবে প্রাণায়াম-সাধনায় কঠোরতা অবলম্বন করা যুক্তি-যুক্ত। এইরূপ যাহারা বায়ু-প্রধান অথবা বায়ুপিত্ত-প্রধান, তাহাদের পক্ষেও 'শীতলী' সুফলপ্রদ, কিন্তু কফযুক্ত-বায়ু হইলেই তাহাদের আধিক্য বিবেচনায় পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রাণায়াম ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভস্ত্রিকা-প্রাণায়াম অগ্নিমান্দ্য রোগযুক্ত সাধকের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এতদ্ব্যতীত ইহার অভ্যাসদ্বারা কোন রোগ বা শরীরের ক্লেশ থাকে না।

সকল-প্রাণায়ামে হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা নাসিকা চাপিয়া বায়ু-পূরণ করিবার আবশ্যক হয় না, প্রথম প্রথম এই ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেও, পরে আর এরূপ করিবার আবশ্যক হইবে না। তখন সাধক নাসিকায় হস্ত প্রদান না করিয়াও অনায়াসে পূরক, কুম্ভক ও রেচক সাধনা করিতে পারিবেন।

'ভ্রামরী' 'মূর্চ্ছা' ও 'কেবলী' অপেক্ষাকৃত উচ্চ উচ্চ অবস্থার প্রাণায়াম, তাহা সাধক অনাহত হইতে উর্দ্ধে চক্রসমূহের সাধনা

করিবার সময় নিজের অবস্থা ও গুরুর উপদেশ অনুসারে অবলম্বন করিবে, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবে। মোটকথা সকল প্রাণায়ামেই পূর্ব্বোক্ত বিধিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবে, একেবারে বহুক্ষণ ধরিয়া 'কুম্ভক' করিবে না, এবং 'পূরক' ও 'রেচক' সাধনাকালে যত ধীরে ধীরে সম্ভব বায়ু পরিচালিত করিবে ; কোন ক্রমেই যেন বায়ুর স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা দ্রুত হইয়া না যায়। এই বিষয়ে সতত সাবধান হইয়া কার্য্য করিবে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ।
অযুক্তাভ্যাস যোগেন সর্ব্বরোগ সমুদ্ভবঃ ॥
হিক্কাশ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃ কর্ণাক্ষি বেদনা।
ভবন্তি বিবিধা দোষাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ ॥"

পূর্ব্বোপদেশ মত নিয়মপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে সর্ব্ব রোগেরই ক্ষয় হয়, কিন্তু তাহার অনিয়ম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, চক্ষু, কর্ণ ও মস্তকের নানাপ্রকার পীড়া হইতে পারে। সেই কারণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যা'র তা'র নিকট হইতে 'প্রাণায়াম-উপদেশ' গ্রহণ করিয়া বা সাধারণ মুদ্রিত শাস্ত্র পাঠ করিয়া কার্য্য করিবে না।

'ভূতশুদ্ধির' সহিত প্রাণায়ামের' অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা যথাকালে উক্ত হইয়াছে। সাধক সেই ভূতশুদ্ধিব সময়েও যে প্রাণায়াম করিবে তাহাতে পূর্ব্বকথিত বিধিসকল সাধ্যমত প্রতিপালন করিবে। 'সাধনপ্রদীপে' 'পূজাতত্ত্ব' নামক অধ্যায়ের মধ্যে প্রাণায়ামের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও এক্ষণে পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিবে।

প্রত্যাহার ও মানসপূজা ঃ—ভূতশুদ্ধি-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের প্রত্যাহার-ক্রিয়া অভ্যস্ত হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধিমান সাধক সহজেই অনুভব করিতে পারিবে। সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার বিষয়-লিপ্সা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অন্তরপূজা বা মানসপূজায় নিয়োজিত করিবার নামই 'প্রত্যাহার'। পূর্ব্বকথিত ভূতশুদ্ধি দ্বারা অনাহত-পদ্মে চিত্ত স্থিত হইলে, মানসপূজার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে; তাহার পূর্ব্বে মানসপূজা কোন সাধকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে, অভ্যাস দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়। পাঠক, 'কূর্ম্মের' চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে, অথবা সামান্য 'গেঁড়ী' 'শামুকের' প্রতি লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, তাহারা আপন মনে চলিয়া যাইতেছে, সহসা কোন অপ্রত্যাশিত আশঙ্কার কারণ দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহাদের বহির্নির্গত প্রত্যঙ্গটুকু কেমন সঙ্কোচ করিয়া, তাহাদের দেহাবরণ-রূপ কঠিন 'খোলসটার' মধ্যে পুরিয়া লয়, তখন আর তাহাদের বাহিরের কোন ক্রিয়াই থাকে না। আবার যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, সে আশঙ্কার কারণ বিদূরিত হইয়াছে, অমনি তাহারা সেই 'খোলের' ভিতর হইতে তাহাদের লুক্কায়িত প্রত্যঙ্গ বাহির করিয়া চলিতে আরম্ভ করে, অথবা আহারাদি কোন বাহ্য-ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করে। সাধকের 'প্রত্যাহার' বা 'মানস-পূজাও' ঠিক সেইরূপ। সাধক আপন অবস্থানুসারে পূর্ব্বোক্ত 'ভূতশুদ্ধির' দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ নিরোধ করিয়া, চিত্তকে ঘটস্থ বা অনাহতচক্রে স্থাপন করিতে পারিলে অর্থাৎ উপরোক্ত জীবগুলির মত সাধকের কঠিনাবরণ হৃদয়ভাণ্ডের

মধ্যে মনের সকল বাহ্যক্রিয়া সঙ্কোচ করিয়া লইলেই প্রকৃত মানসপূজার ক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারিবে।

প্রত্যেক পূজাপদ্ধতির মধ্যেই মানসপূজার ব্যবস্থা আছে, বাহ্য-পূজাতেও প্রথমে মানসপূজা আবশ্যক ('পূজাপ্রদীপ' দেখ)। যোগাঙ্গীভূত প্রত্যাহার-সাধনা ব্যতীত মানসপূজা ঠিক হয় না, বাহিরের বৃত্তি সহসা নিরোধ করিতে না পারিলে, কাহাকে লইয়া মানসপূজা হইবে? সাধনাভিলাষী পূজক, বাহিরে বা সম্মুখে যে দেবতাকে পূজা করিবার অনুষ্ঠান বিস্তৃত করিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামের ক্রিয়া আদিতে সাধক কতকটা অভ্যস্ত হইলে, চিত্তের সেই সতত: বহির্মুখী ভাবসমূহকে সঙ্কোচ করিয়া অন্তরের দিকে যখন চিত্তের গতি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে, তখনই প্রকৃত মানসপূজার সূত্রপাত হইবে। বাহিরে পত্র, পুষ্প, ফল ও জলাদি-সহযোগে যেমন ভাবে দেবতার অর্চনা করিতে হয়, সাধক ঘটস্থ হইয়া সেই ভাবেই আন্তরিক ভাবসমূহ দ্বারা প্রথমে মনে মনে দেবতার পূজা করিয়া থাকে। বাহ্যপূজায় যেমন পঞ্চোপচার ষোড়শোপচার আদি পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, মানসপূজার মধ্যেও তেমনই শাস্ত্রীয় বিধিনির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও হোম-যাগাদির ব্যবস্থা আছে। সাধনার প্রথমকৃত্য হইতে ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলে সকল কার্য্যই সময়ে সহজ হইয়া যায়।

শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"অন্তর্যাগাত্মিকাপূজা সর্ব্বপূজোত্তমোত্তমা।"

সম্পূর্ণভাবে অন্তর্যাগাত্মিকপূজা সকল-পূজা অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াদি দ্বারা প্রকৃত সাধন-জ্ঞানলাভ

না হয়, সে পর্য্যন্ত স্থূলভাবেই ভক্তি-সহকারে বাহ্যপূজা করা সঙ্গত সে সম্বন্ধেও শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"বাহ্যপূজা প্রকর্ত্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ।
বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে॥"

যে পর্য্যন্ত প্রত্যাহার-জ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে পূজার বাহ্যানুষ্ঠান অবশ্যই কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংক্ষেপে ও বাহুল্য-ভেদে পূজা দ্বিবিধ। সংক্ষেপ-মানসপূজায় অভিষ্টদেবতাকে দেহস্থিত পঞ্চভূতদ্বারা পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করিতে হয়। এক্ষণে সেই সংক্ষিপ্ত-বিধির প্রথমে উল্লেখ করিয়া বিস্তৃত-বিধি-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি।

সংক্ষিপ্ত পূজা :—উভয় হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বয়ের প্রান্ত ভাগ সংযোগ করিয়া অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে "লং পৃথ্বাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ॥" এই মন্ত্রে অভীষ্ট দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া 'গন্ধতত্ত্ব' দ্বারা তাঁহাকে প্রথমে অর্চ্চনা করিবে, অনন্তর এই ভাবেই উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া স্বীয়-দেবতার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিতরূপ মন্ত্রদ্বারা পুষ্পতত্ত্বস্বরূপ 'আকাশ-তত্ত্বকে' সমর্পণ করিবে,—"হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ।" এইরূপে তর্জ্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া—"যং বায়্বাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া ধূপতত্ত্ব, মধ্যমা দুইটীর সহযোগে—"রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া দীপতত্ত্ব; অনামা দুইটীর সহযোগে—"বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া নৈবেদ্যতত্ত্ব; তাহার পর উভয় হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া বা

কৃতাঞ্জলি হইয়া "ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বূলং সমর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া তাম্বূলতত্ত্ব দ্বারা সংক্ষিপ্ত-পূজা সম্পন্ন করিতে হইবে। ('পূজা-প্রদীপে' 'মানস-পূজা' অংশ দেখ।)

বিস্তৃত-পূজা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতং।
আকাশতত্ত্ব বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধংস্যাৎ গন্ধতত্ত্বকং।
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ।
অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরণং।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকং।
নৃত্যমিন্দ্রিয় কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা।
অমায়াদ্যৈর্ভাব পুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ ভাবগোচরাং।
অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা।
অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা।
অমাৎসর্য্যম্ অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ।
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমং।
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব পুষ্পৈঃ সংপূজয়েৎ শিবাং।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যশৈলং তথৈব চ।
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকং।
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চতৎক্ষালনোদকং।

কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে।
যদ্ যৎ প্রমেয়ং তৎসর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ।
পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণো বিঘ্নকারিণঃ।
তাংস্তনপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমারভেৎ।"

এই মূল উপদেশ-অনুসারে সকলে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না, সেই কারণ নিম্নে ইহার তাৎপর্য্য ও সাধারণ বিধি বর্ণিত হইতেছে।

সাধক, পূজাসনে বসিয়া প্রাণায়ামাদি-ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক মানসপূজা আরম্ভ করিবে। মানসপূজা সকলকেই করিতে হয়, বাহ্য-পূজকের পক্ষেও মানসপূজা প্রথমে করণীয়। প্রথমে নিজ ক্রোড়ে করতলদ্বয় উত্তান ভাবে চিৎ করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া অভীষ্টদেবতার মূর্ত্তি হৃদয়ে 'ধ্যান' করিবেন। এস্থলে উত্তানকরতলদ্বয়-সম্বন্ধে সাধকের একটু জানিবার কথা আছে। সাধারণতঃ নিজ ক্রোড়ে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত রাখিয়া মানসপূজা করিবার বিধি আছে, কিন্তু দেবতা-ভেদে তাহার রীতি যে বিভিন্ন তাহা অনেকেই অবগত নহে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ক্রমদীক্ষাভিষেকের সাধনায় তারাদেবীর উপাসনা কালে, দক্ষিণহস্তোপরি বামহস্ত স্থাপন করিয়া তারামূর্ত্তি চিন্তা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ "তারা বিদ্যাসু সর্ব্বাসু ভাবনাদৌ ব্যতিক্রমঃ।" তারাসাধনায় ভাবনাদির ব্যতিক্রম করিতে হয়, কিন্তু তন্ত্রাচরণের সাধারণ নিয়ম এই যে, পুরুষ-দেবতার ধ্যান কালে, বাম-হস্তের উপর দক্ষিণহস্ত এবং স্ত্রী-দেবতার ধ্যানকালে দক্ষিণহস্তের উপর বামহস্ত রক্ষা করিতে

হইবে। আবার ধ্যান ও মানসপূজা-ভেদে এই করদ্বয় রক্ষার সামান্য পার্থক্য আছে। অর্থাৎ মানসপূজার সময়েই স্বাঙ্কে বা নিজ-ক্রোড়ে পূর্ব্বোক্তরূপে করতল রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু ধ্যানকালে সাধক আপনার হৃদয় সম্মুখে হস্তদ্বয় কূর্ম্মমুদ্রাযুক্ত করিয়া রক্ষা করিবে এবং পুং ও স্ত্রী-দেবতা-ভেদে করতলদ্বয় পূর্ব্বনিয়মেই রাখিতে হইবে।

এক্ষণে মানস-পূজাকালে সাধক উত্তানভাবে চিৎ করিয়া করতলদ্বয় পূর্ব্বোক্তরূপে উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া, নিমীলিত-নেত্রে অভীষ্টদেবতাকে স্বীয় হৃদ্‌কমলে অর্থাৎ 'অনাহতচক্রে' চিন্তা করিবে। পরে মনে মনে তাঁহাকে নিম্নোক্ত উপচারে একাগ্রভাবে পূজা করিবে। অভীষ্টদেবতার উপবেশন জন্য সাধক মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া স্বীয় হৃদয়কমল অর্থাৎ অনাহত চক্রান্তর্গত 'গুপ্ত অষ্টদল কমল' ['পূজাপ্রদীপ'-পরিশিষ্ট-(৪ক) 'অনাহত গুপ্ত কমল' দেখ] আসনরূপে পাতিয়া দিবে ; প্রকৃত পক্ষে এই গুপ্ত হৃদয়-কমলই ভগবচ্চিন্তার আধার। পূজক শাক্ত হউক, বৈষ্ণব হউক, অথবা যে কোন সগুণ দেবতার উপাসক বা সাধক হউক, তাহার অভীষ্ট দেবতা যিনিই হউন, অর্থাৎ তিনি সগুণ ব্রহ্মের যে শক্তিরই উপাসনা করুক না কেন ; এই মনোরম, পবিত্র ও অমূল্য আধারে তাঁহাকেই বসাইয়া তাঁহার রাতুল-চরণযুগল ধৌত বা পাদ্যদ্বারা অর্চ্চনা করিবার জন্য সহস্রদল-কমল-নিঃসৃত সুধাধারা চিন্তা করিবে, এবং মনে সেই অপার্থিব অম্বুরাশি সংগ্রহ করিয়া ভক্তিগদগদ-হৃদয়ে পূজক অভীষ্টদেবতার চরণে 'পাদ্য'রূপে তাহা প্রদানপূর্ব্বক মনকে 'অর্ঘ্য'-

স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহাতে অর্পণ করিবে। অনন্তর উক্ত সহস্রদল-কমল-বিনিঃসৃত অবিরত পূতধারাদ্বারাই তাঁহার 'আচমনীয়' ও 'স্নানীয়' উদক প্রদান করিবে। সাধক, এইবার নিজ সর্ব্বাবয়ব হইতে প্রথম বা আদিভূত 'আকাশ-তত্ত্বকে' চিন্তা ও 'বস্ত্র'রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার পরিধেয়রূপে তাহা প্রদান করিবে এবং এই ভাবে গন্ধ' বা চন্দনস্বরূপ ভূতপঞ্চকের অন্যতম পৃথ্বীতত্ত্ব,' 'পুষ্প'স্বরূপ নিজ 'চিত্ত', এইভাবেই 'প্রাণকে' 'ধূপ'রূপে, স্বীয় 'তেজস্তত্ত্ব' 'দীপ-রূপে, 'সুধাসাগর' তাঁহার 'নৈবেদ্য', 'অনাহতধ্বনি' পূজার সময় 'ঘণ্টাবাদ্য', 'বায়ুতত্ত্ব' দ্বারা তাঁহাকে 'চামর' করিবে ,'সহস্রদলকমল' তাঁহার উপর 'ছত্ররূপে' ধারণ করিবে , 'শব্দতত্ত্ব' তাঁহার ভজন গীত এবং ইন্দ্রিয়সমুদায়ের ক্রিয়া ও মনের চাঞ্চল্যকে যথাক্রমে তৎসমীপে 'নৃত্য'রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার অর্চনা করিবে । পরে সুষুম্না সূত্রে গ্রথিত অপূর্ব্ব 'পদ্মমালা' তাঁহাকে তাঁহার সুন্দর মেখলারূপে অর্পণ করিয়া নানাবিধ মানস্-পুষ্পের দ্বারা মনে মনে তাঁহাকে মনের মতটী করিয়া সাজাইবে । অমায়াদি ভাব-পুষ্পসমূহের দ্বারা ভাবগোচরা সেই ভগবতী ব্রহ্মশক্তিকে তদ্গত মনে অর্চ্চনা করিবে।

অমায়াদি ভাব পঞ্চদশবিধ, তন্মধ্যে দশটী সাধারণ 'ভাব-পুষ্প' ও পাঁচটী 'মহাপুষ্প'। অমায় (মায়া-পরিহার), অনহঙ্কার (অহঙ্কার-ত্যাগ), অরাগ (সর্ব্ববিষয়ে অনুরাগ-বর্জ্জন), অমদ (মদ বা গর্ব্ব-পরিত্যাগ), অমোহ (মোহ-পরিহার), অদম্ভ (দাম্ভিকতা-বর্জ্জন), অদ্বেষ (দ্বেষ-পরিত্যাগ), অক্ষোভ (কোন বিষয়ের জন্য ক্ষোভ না করা), অমাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা-ত্যাগ) ও অলোভ

(কোন বিষয়ের জন্য লোভ না করা) চিত্তের এই দশবিধ সাধারণ ভাবগুলি সাধকের সাধারণ ভাবপুষ্প, ইহাই এক্ষণে অভীষ্টদেবের চরণে অর্পণ করিতে হইবে। যাহাতে এই সকল ভাব সাধকের চিত্তকে আর কলুষিত করিতে না পারে, অভীষ্ট-চরণ-প্রান্তে মনে মনে তাহাই প্রার্থনা করিতে হইবে। অনন্তর নিম্নলিখিত 'মহাপুষ্প পঞ্চক' তাঁহার চরণে 'পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদান করিবে। প্রথম-পুষ্পাঞ্জলি—কায়মনোবাক্যে 'অহিংসারূপ' পরম পুষ্পগুচ্ছ; 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহস্বরূপ' পুষ্পরাশি—দ্বিতীয়-পুষ্পাঞ্জলি; তৃতীয়-পুষ্পাঞ্জলি—'দয়াস্বরূপ' সুমনোহর পুষ্পস্তবক; চতুর্থ—'ক্ষমারূপ' অতি সুকোমল পুষ্পসমূহের অঞ্জলি এবং 'জ্ঞানরূপ' বিচিত্র ও অসাধারণ পুষ্পগুলি,-পঞ্চম-পুষ্পাঞ্জলিরূপে তাঁহার চরণে অতীব ভক্তি-সহকারে অর্পণ করিবে। এই ভাবে 'পঞ্চদশ-বিধ ভাবপুষ্প' সহযোগে অভীষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিবেন।

এই মানসপূজা ও তদ্বিধি-নির্দ্দিষ্ট পুষ্পাঞ্জলি আদি ক্রিয়াসমূহ মুখে আলোচনা করা নিতান্তই সহজ, কিন্তু ইহাকে প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন; তবে ভক্তিমান্ সাধক একাগ্র ভাবে গুরুপাদুকা-চিন্তাপূর্ব্বক সাধননিরত হইলে, ইহা অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবে। সুতরাং প্রত্যেক সাধকেই এই সকল বিষয় অচঞ্চল বিশ্বাস ও ভক্তি-সহকারে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

সকল সম্প্রদায়ের সাধকেই এই পর্য্যন্ত সাধারণ ভাবে মানস পূজা করিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব অধিকার অনুসারে তত্ত্বাদি-সহযোগে মনে মনে বিশেষ ভাবে ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন।

শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক ভেদে দেবী-পূজায় উদ্দেশ্যে 'পঞ্চতত্ত্ব'ও প্রদান করিবে। বৈষ্ণব-

সাধকগণ তাঁহাদের স্ব-সম্প্রদায় প্রচলিত ভোগরাগাদির নিবেদন করিবে। সাধক, বাহ্যপূজায় পূজক যে যে উপচার সংগ্রহ করিয়া দেবার্চ্চনায় পরিতৃপ্ত হয়, এই মানসপূজার সময়েও মনে মনে তৎসমুদায় বা তদতিরিক্ত উপচারসমূহ সংগ্রহ করিয়া লইবে। বাহ্যপূজায় দেশ, কাল, পাত্র ও অর্থের অভাবে যাহা সহজে সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া থাকে, সাধকের অক্ষয় হৃদয়-ভাণ্ডারে তাহার কিছুরই ত অভাব নাই! সাধক কেবলতাহার অপরিসীম কল্পনার সাহায্যে তাহা এখন পূর্ণ করিয়া লইবে। যেমন ভাবে তাহার অভীষ্টদেবতাকে সাজাইলে বা অর্চ্চনা করিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, তেমনই ভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে। পূজক অতি দীন হীন ও দরিদ্র হইলেও সসাগরা পৃথিবীপতিরও রত্ন-ভাণ্ডারে যাহার অভাব আছে, মানসপূজার সময়ে কুবেরের ভাণ্ডারস্থিত সেইরূপ মহামূল্য রত্নালঙ্কারেও তিনিতাহার অভীষ্টদেবকে মনের মতটী করিয়া সাজাইয়া লইতে পারেন, বা তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া অর্পণ করিতে পারেন। বীর বা বামাচারী শাক্তেরা তাই দেবীর রহস্য-পূজার অনুষ্ঠানে 'পঞ্চতত্ত্ব' অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে, অনন্ত সুধাসাগর, পর্ব্বতাকার মৎস্য ও মাংস, রাশীকৃত মুদ্রা, ও সুভক্ত পরম উপাদেয় ঘৃতাদি সংযুক্ত পরমান্ন, কুলামৃত, পীঠ-ক্ষালন বারি এবং অধিকার ভেদে পঞ্চ কুলপুষ্প বা আতসী প্রভৃতি পঞ্চ যন্ত্রপুষ্প ও সার্ব্বকালিক কুসুমরাশি মনে মনে কল্পনা করিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। এতদ্ব্যতীত স্বীয় কামপ্রবৃত্তিকে 'ছাগ' ও ক্রোধপ্রবৃত্তিকে 'মহিষ'স্বরূপ কল্পনা করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান করিতে হইবে; অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত কাম-ক্রোধাদি রিপুসমূহ যাহাতে সাধক-হৃদয় আর স্পর্শ করিতেও না

পারে, কায়মনোবাক্যে অভীষ্ট-চরণে তাহাই প্রার্থনা করিতে হইবে। অনন্তর ভোগারতির ব্যবস্থায় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে, আকাশ, অনিল ও জলমধ্যে যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা মনোবুদ্ধি-গোচর, অথচ হৃদয়মনোমুগ্ধকর বস্তু আছে, সে সমস্তই অভীষ্ট-দেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে। এইবার সাধক মানসপূজান্তে মানসজপ করিতে বসিবে; সুতরাং তদ্বিঘ্নকারী যে কোনও জীব আকাশ, পাতাল বা ভূমিতলে পরিলক্ষিত হইবে, সকলকেই যেন সেই মহাশক্তির চরণপ্রান্তে বলি প্রদান করিয়া, চিত্তের সকল দ্বন্দ্বভাব পরিহারপূর্ব্বক সুস্থির চিত্তে 'মানসজপ' করিতে আরম্ভ করিবে।

মানসজপ—

"গ্রন্থি র্যা কুণ্ডলীশক্তির্নাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ।
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ॥
অকারাদি লকারান্তমনুলোমমিতিস্মৃতম্।
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুংজপেৎ॥
অষ্টবর্গাস্তষ্টবর্গৈ স্তথা ন্যূনমথাষ্টকম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্যপ্রণমেৎক্রিয়া॥"

জপ করিতে হইলেই একছড়া মালার প্রয়োজন হয়। তবে সে মালা রুদ্রাক্ষাদি 'জপমালাই' হউক, অথবা 'করমালা' কিম্বা 'মনোমালাই' হউক, এই ত্রিবিধ মালার মধ্যে সাধন-সৌকর্য্যার্থে যখন যেরূপ প্রয়োজন হইবে, তখন সাধককে সেইরূপই একটী সংগ্রহ করিতে হইবে। মানসজপকালে মনোমালাই একমাত্র প্রয়োজনীয়। প্রত্যাহার-যোগক্রিয়া দ্বারা বাহ্য বা বাহিরের

সকল উপকরণ ছাড়িয়া, সমস্তটাই এক্ষণে অন্তরের মধ্যে পূরিতে হইবে; তাহা না হইলে মানসজপ করা কখনই সম্ভবপর হইবে না। এখন সেই মনোমালাটী গুরুর কৃপায় সাধকের সংগ্রহ করা আবশ্যক। শাস্ত্রে তাহার ইঙ্গিতস্বরূপ যাহা বর্ণিত আছে, মূলে তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্র-বচনের তাৎপর্য্য সকলের পরিজ্ঞাত নাই, সেই কারণ নিম্নে যথাসম্ভব সরলভাবে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে।

পূর্ব্বে ষট্চক্র-বর্ণনায় যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সাধনাভিলাষী পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। এস্থলে সেই ষট্চক্র সাধনার অনুরূপভাবে গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াদ্বারা মনোমালা গ্রথিত করিতে হইবে। পাঠকের স্মরণ আছে, মূলাধারাদি ছয়টী চক্রে ('পূজাপ্রদীপে' ষট্চক্র-চিত্র দেখ) মাতৃকাবর্ণগুলি পরিশোভিত আছে, সেই এক একটী মাতৃকাবর্ণ, মানস-জপের উপযোগী মনোমালার এক একটী দানা, তাহাই কুণ্ডলিনী-সূত্রে গ্রথিত করিয়া অনুলোম-বিলোমে ষট্চক্রে অভীষ্ট-মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

কুণ্ডলিনী দুইটী প্রান্ত বা মুখ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। সেই কুণ্ডলিনী-শক্তি সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারা রূপে অবস্থিতা, তাঁহাকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানানুসারে জাগরিতা করিয়া সুষুম্নাপথে উত্থাপন করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূলাধার হইতে প্রতি চক্রে সমস্ত মাতৃকাবর্ণগুলিকে গ্রাস করাইতে হইবে। প্রথমে মূলাধারের চতুর্দ্দল হইতে তিনি যেন স ষ শ ব এই চারিটী বর্ণ গ্রাস করিয়া, স্বাধিষ্ঠানের ষড়্দলস্থিত ল র য ম ভ ব এই ছয়টী বর্ণ গ্রাস করিবেন, অনন্তর এই ভাবেই মণিপূরে

দশদল পদ্ম হইতে ফ প ন ধ দ থ ত ণ ঢ ড এই দশটী বর্ণ, অনাহতের দ্বাদশ দল হইতে ঠ ট ঞ ঝ জ ছ চ ঙ ঘ গ খ ক এই বারটী বর্ণ, বিশুদ্ধপদ্মস্থিত ষোড়শ দলের অঃ অং ঔ ও ঐ এ ৯ ঌ ৠ ঋ ঊ উ ঈ ই আ অ এই ষোলটী বর্ণ এবং আজ্ঞাচক্রেস্থিত দ্বিদলের দক্ষিণদল হইতে ক্ষ এই বর্ণের অর্দ্ধ অংশ গ্রাস করিবেন। তাহার পর কুণ্ডলিনী অন্যমুখ উত্তোলন করিয়া সেইমুখ হইতে একটী ল বর্ণ (এই 'ল'য়ের উচ্চারণ 'ড়' বলিবে) উদগীরণ করিয়া (আজ্ঞাচক্রের কর্ণিকা বা টাটীর মধ্যে এই 'ল'বর্ণ গুপ্ত কেন্দ্ররূপে সতত বিরাজিত আছে) দ্বিদলস্থিত বামদিকের দল হইতে অবশিষ্ট অক্ষর হ্ বর্ণকে গ্রাস করিবেন এবং উদগীর্ণ ল (ড়) বর্ণকে পুনরায় গ্রাস করিয়া তাঁহার ভিন্নমুখে অর্দ্ধগ্রস্ত ক্ষ বর্ণের অবশিষ্টার্দ্ধ গ্রাস করিবেন। ইহার দ্বারা অকার হইতে শেষ লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ গ্রথিত হইয়া মনোমালা প্রস্তুত হইল এবং উভয়মুখে ধৃত ক্ষ উহার মেরু হইবে। কোন কোন তন্ত্রমতে উক্ত 'ল' অক্ষরটীই মেরুবর্ণ। এক্ষণে সাধক উক্ত মেরু পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মাতৃকামালার প্রতি অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু বা অনুস্বার যোগ করিয়া অ হইতে ল পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণে 'অনুলোম' এবং 'ল' হইতে বিপরীত ভাবে অ পর্য্যন্ত 'বিলোম' জপ করিলে এক শত বার জপ করা হইবে। তৎপরে অষ্টবর্গের আটটী আদি বর্ণে বিন্দু সংযোগ করিয়া অর্থাৎ অং কং চং টং তং পং যং শং এবং ইহার প্রত্যেকটীর সহিতও মূলমন্ত্র সংযোগ করিয়া জপ করিলে সর্ব্বশুদ্ধ একশত আটবার জপ করা হইবে।

অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং

ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ল —(ক্ষ) লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং · অং কং চং টং তং পং যং শং — ১০৮।

মানস-জপকালে প্রাণায়ামোক্ত কুম্ভকযোগ-সহকারে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র একশতআটবার জপ করিতে হইবে। যদি কোন সাধক সেরূপ করিতে অসমর্থ হয়, অর্থাৎ কুম্ভকে বায়ু রক্ষা করিতে না পারে তাহা হইলে কেবল বর্ণাষ্টকের আদি বর্ণে আট বারমাত্র জপ করিবে। অনন্তর জপ সমাপ্ত হইলে, অভীষ্ট-দেবতার দক্ষিণহস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া মনে মনেই তাঁহার চরণে প্রণাম করিবে।

জপসমর্পণ মন্ত্র :—

"সর্ব্বান্তরাত্মনিলযে স্বান্তর্জ্যোতিস্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জপং 'মাতঃকুণ্ডলিনি' * নমোস্তু তে॥"

হে মাতঃ কুণ্ডলিনী, তুমি সকলেরই অন্তরাত্মায় বাস করিতেছ, তুমি সকলের অন্তর্জ্যোতি, আমি যে মানস-জপ করিলাম, তাহা তুমি গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার। সাধক মনে মনে অভীষ্টদেবতাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবে।

'পঞ্চাঙ্গ'-প্রণাম-সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জানুদ্বয় হস্তদ্বয় এবং মস্তক ভূমিসংলগ্ন করিয়া প্রণাম করার নাম পঞ্চাঙ্গ

* এস্থলে মাতঃকুণ্ডলিনী শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সাধক যখন যে দেবতার মানসপূজা করিবে, তখন সেই দেবতারই নাম উল্লেখ করিবে যথা—"মাতর্মাস্তে-কালি নমোস্তুতে॥"

প্রণাম' তন্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পদদ্বয়, জানুদ্বয় এবং হস্তদ্বয় ভূপাতিত করিয়া বক্ষঃস্থল ও মস্তক দ্বারা প্রণাম করায় নামও পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। ('পূজাপ্রদীপে'—পূজান্তে 'প্রণাম' দেখ) এ সম্বন্ধে যাহার যেমন সুবিধা তিনি সেইরূপ প্রণাম করিতে পারেন, তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তবে প্রণাম সম্বন্ধে একটী বৈজ্ঞানিক কথা এস্থলে বলিবার আছে সাধনাভি-লাষী পাঠক, তাহা একটু চিন্তা করিবে ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, প্রণাম করিবার সময় কখনই ভূমিতলে মস্তক স্পর্শ করিবে না, তাহা হইলে দেবতা শাপ-প্রদান করেন। সকলসময়েই কোন আধারে, আসনে, অন্ততঃ হস্তের উপর মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিবে। যদিও মানসপূজা-কালে মনে মনেই প্রণাম করিতে হইবে, কিন্তু অন্য সময়ে লৌকিক বা বাহ্য-প্রণামকালে যাহা কর্ত্তব্য প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা এস্থলে বর্ণিত হইতেছে। ক্রিয়াবান্ সাধক আসন ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা মস্তিষ্ক মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত করে, সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইলে, তাহা বিদ্যুতের ন্যায় এক অপূর্ব্বশক্তি-বিশেষ মাত্র, তাহাতেই সাধকের চিত্তে আনন্দ ও দেহে মত্ততার ভাব প্রকটিত হয়। শিরোমধ্যে সেই শক্তি সঞ্চিত হইবার পর সহসা পৃথিবী স্পর্শ করিলে, তাহা বিদ্যুদ্গতির ন্যায় বাহির হইয়া সর্ব্বশক্ত্যাধার পৃথিবীর সহিত সংমিশ্রিত হইতে থাকে। সেই কারণ প্রণাম-কালে কখনই মস্তক ভূমিতলে স্পর্শ করিতে নাই, তাহা হইলে, এত যত্নে সঞ্চিত সে শক্তির লোপ ত হইবেই, অধিকন্তু মস্তিষ্ক হইতে সেই শক্তি অতি দ্রুতভাবে বাহির হইয়া পৃথিবীর সহিত যুক্ত হয় বলিয়া মস্তিষ্কমধ্যে ভীষণ আঘাত লাগায় শিরঃপীড়া বা

মাথার মধ্যে সহসা বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। 'সাধনপ্রদীপে' আসন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বের বিষয় বলিয়াছি, পাঠক স্থিরচিত্তে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে, এই 'প্রণাম তত্ত্ব' সহজে বুঝিতে পারিবে। বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন সর্ব্বদা সূক্ষ্মপথেই বাহির হইয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিদ্‌মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। এ শক্তিও ঠিক সেই ভাবে কোন সূক্ষ্ম-পথেই সহজে বাহির হইয়া থাকে, কিন্তু মানবকপাল প্রশস্ত ও গোলাকার বলিয়া পৃথিবী-স্পর্শকালে কোন সূক্ষ্মপথ না পাইয়া বজ্রের ন্যায় সাধকের কঠিন কপাল-অস্থি যেন বিদীর্ণ করিয়া বাহির হয়, তাহাতেই শিরঃপীড়া প্রভৃতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এবং সেই কারণেই যোগোপদেষ্টা গুরুমণ্ডলী সাধনার পর ঐরূপ প্রণাম-ক্রিয়ায় নিষেধ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রণাম করিলে নিজ হস্ত বা করযোড় করিয়া তাহারই উপর মস্তকটী রাখিয়া প্রণাম করিবে। তবে যে সকল সাধারণ পূজক ক্রিয়া-কালে সে শক্তির সঞ্চার করিতে পারে না, তাহাদের প্রণাম কালে মস্তক ভূমিস্পর্শ করিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। মানবের মস্তক স্বর্গ হইতেও গরীয়ান্, তথায় সহস্রার মধ্যে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং সে অতি পবিত্র বস্তু, তাহা কেবল ইষ্টগুরুর চরণ প্রান্ত ব্যতীত যেখানে সেখানে নত ও স্পর্শ করাও বিধেয় নহে। কাহারও মস্তকে আঘাত অথবা সম্প্রদায় বিশেষের রীতি অনুসারে সেই মস্তকের উপর সহসা পা দেওয়া কোন প্রকারে উচিত নহে। এতদ্ব্যতীত শক্তির আধার, প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা বা লিঙ্গকে ঠিক সম্মুখীন ভাবেও কখন প্রণাম করিতে নাই; তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত বিধি অবশ্য প্রতিপাল্য, সেই

জন্যই শাস্ত্রও উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রতিমাকে স্বীয় শরীরের দক্ষিণাংশ প্রদর্শন করিয়া প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ('পূজাপ্রদীপে—' প্রণাম-অংশ দেখ)।

অন্তর্হোম, অন্তর্যাগ বা মানস-হোমঃ—অনন্তর অন্তর্হোম সম্বন্ধে কথিত হইতেছে। প্রত্যাহারের সঙ্গে মানসপূজা, মানসজপ ও মানস-হোম বা অন্তর্হোম অবশ্য করণীয়। মন্ত্রসিদ্ধি পক্ষে নিয়মিত জপ যেমন একমাত্র অবলম্বনীয়, তেমনই তাহার ফলপ্রাপ্তির জন্য বিধিপূর্ব্বক সেই মন্ত্রের হোম করাও প্রয়োজন। হোম ব্যতীত কোন মন্ত্রই ফলপ্রদ হয় না। মন্ত্রপূত অগ্নিকার্য্যের দ্বারা সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় ও সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"নাজপ্তঃ সিধ্যতে মন্ত্রো নাহুতশ্চ ফলপ্রদঃ।
বিভূতিঞ্চাগ্নিকার্য্যেণ সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি॥"

'মানসহোম'—সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে :—

"অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ব্রজেৎ।
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েৎ ততঃ॥
আত্মান্তরাত্মা পরম জ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতদ্রূপং তু চিৎ কুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ॥
আনন্দ মেখলো রম্যং বিন্দু ত্রিবলয়াঙ্কিতম্।
অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দ ময়ং ভবেৎ॥
বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নাং মধ্যতোধ্যাত্বা কুর্য্যাৎ হোমং যথাবিধি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিত্তেন প্রকল্পয়েৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেন্মুহুম্॥"

সাধনার্থী পাঠক, বুঝিতেই পারিতেছ যে, মানসপূজারই তৃতীয়-অঙ্গ এই 'মানসহোম' বা অন্তর্হোম; সুতরাং ইহারও বাহিরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; সমস্ত কার্য্যটাই সাধককে মনে মনে সম্পন্ন করিতে হইবে। এক্ষণে যথাবিধি কুম্ভক যোগদ্বারা 'ষট্‌চক্র'বর্ণিত 'মূলাধার'রূপ কুণ্ডে প্রথমে চিৎস্বরূপ অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিতে হইবে, অনন্তর তাহাতেই নিম্নলিখিত নিয়মে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। ১। আত্মা অর্থাৎ জীব বা জীবাত্মা, ২। অন্তরাত্মা, ৩। পরমাত্মা বা 'ব্রহ্মবস্তু', ও ৪। জ্ঞানাত্মা বা জীবনী শক্তি 'কুণ্ডলিনী', বা এই সকলের উপলব্ধির জন্য 'বুদ্ধি' এই চতুর্ব্বিধ আত্মাদ্বারা নির্ম্মিত চতুষ্কোণ চিৎকুণ্ড কল্পনা করিতে হইবে; অর্থাৎ মূলাধার চক্রে এই সকলের একত্র সমাবেশ ভূত চিন্ময় 'চতুরস্রকুণ্ড' চিন্তা করিতে হইবে। সাধকের অবশ্যই স্মরণ আছে, মূলাধারের কর্ণিকামধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপ 'বিন্দু' ও যোনিমণ্ডলরূপ 'ত্রিকোণ-যন্ত্র' বিদ্যমান আছে, ইহা আবার সেই 'কামকলায়' বর্ণিত নিম্ন অংশ অর্দ্ধমাত্রারূপ 'যোনিপীঠ' ও তাহার উর্দ্ধ-অংশ 'বিন্দু' বলিয়া উক্ত হওয়ায় এই মণ্ডলই ৺ বা ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং ইহাই ব্রহ্মানন্দময়স্বরূপ অপূর্ব্ব বস্তু। সাধক, এই ব্রহ্মানন্দময় চিৎকুণ্ডের বামভাগে—ইড়া, দক্ষিণভাগে—পিঙ্গলা, এবং মধ্য বা তৃতীয়ভাগে—সুষুম্নানাড়ীর * ধ্যান বা চিন্তা করিয়া হোম করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এই হোমের হবিঃস্বরূপ 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্মকে' 'ঘৃত' কল্পনা করিয়া মনে মনে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে নিম্নলিখিত শ্লোকার্থ চিন্তা করিয়া

---

* 'পূজাপ্রদীপে'—'পরিশিষ্টঅংশে'—ষট্‌চক্র (কুণ্ডলিনী) বর্ণনা দেখ।

প্রথম আহুতি প্রদান করিবে।

"ওঁ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসাস্রুচা।

জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্য অক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ "স্বাহা"। ১।

অর্থাৎ নাভিচৈতন্যরূপ অগ্নিতে .মনোময় স্রুক্ বা যজ্ঞের আহুতি পাত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ হবিঃ অর্থাৎ ঘৃতাদি হোম দ্রব্য পূর্ণ করিয়া নিত্য-জ্ঞানপ্রদীপ্ত করিবার জন্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমুদায়কে আহুতি প্রদান করিলাম। (১ম আহুতি)

পুনর্ব্বার মনে মনে 'মূলযন্ত্র' উচ্চারণ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকার্থ চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করিবে।

"ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসাস্রুচা।

সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যম্ অক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ স্বাহা" ।২।

অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবিঃ দ্বারা সমুদীপ্ত আত্মাগ্নিতে মনোময় স্রুক্ বা যজ্ঞের আহুতি পাত্র দ্বারা সর্ব্বদা সুষুম্না-পথে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিতেছি। (২য় আহুতি)

ইহার পর পুনরায় মনে মনে 'মূলমন্ত্র' উচ্চারণপূর্ব্বক নিম্ন-লিখিত শ্লোকটীও মনে মনে উচ্চারণ ও উহার তাৎপর্য্য চিন্তা করিয়া তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে।

"ওঁ প্রকাশাপ্রকাশহস্তাভ্যাং অবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা।

ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহ পূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্। স্বাহা" ।৩।

অর্থাৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ হস্তদ্বয় দ্বারা 'উন্মনী'রূপ (পরে মুদ্রাপ্রকরণ মধ্যে ৪।ক 'উন্মনীমুদ্রা' দেখ)। স্রুক্ অবলম্বন-পূর্ব্বক তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম স্নেহ বা মায়াবিকাশরূপ হবিঃ পূর্ণ করিয়া সেই প্রজ্জলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছি। (৩য় আহুতি)

অনন্তর পূর্ব্ববৎ মনে মনেই 'মূলমন্ত্র' এবং নিম্নলিখিত শ্লোক উচ্চারণ ও চিন্তা করিয়া 'চতুর্থ আহুতি' প্রদান করিবে।

"ওঁ অন্তনিরন্তরনিরিন্ধনমেধমানে।
মায়ান্ধকার পরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ ॥
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূমৌ।
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানম্ ॥ স্বাহা" ।৪।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে অদ্ভুত দিব্য জ্যোতিঃ (জগৎ প্রপঞ্চ) প্রকাশ হইতেছে যিনি মায়ারূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমার অন্তরে ইন্ধন ব্যতীতও নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত ও উদ্দীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই অনির্ব্বচনীয় সম্বিৎস্বরূপ অগ্নিতে আমি বসুধা হইতে শিব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ও সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চ আহুতি প্রদান করিতেছি। (৪র্থ আহুতি)

এইভাবে মনে মনে চারিবার আহুতি প্রদত্ত হইলে, পূর্ব্ববৎ 'মূলমন্ত্র' ও নিম্নলিখিত শ্লোকসহ 'পঞ্চমবার' পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া মানসহোম সম্পন্ন করিতে হইবে।

"ওঁ ইদন্ত পাত্রভরিতং মহাতাপপরামৃতম্।
পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্ ॥" স্বাহা ।৫।

অর্থাৎ আমার এই মনোময় পাত্রে মহাতাপ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার মহাতাপ) রূপ হবিঃ পূর্ণ করিয়া সেই প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক মানসহোম সম্পন্ন করিলাম (৫ম বা পূর্ণাহুতি)। অনন্তর অভীষ্ট দেবতার চরণপ্রান্তে প্রণাম করিবে। এইভাবে পূর্ব্বকথিতরূপ পূজা, জপ ও হোম এই ত্রিবিধ মানসিক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, সাধকের সমগ্র মানস-পূজা সম্পন্ন হইবে। প্রত্যাহারসহযোগে

যখন সাধক ইহাতে অবিচলিত চিত্তে চিন্তা বা ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তাহার উচ্চতর যোগাঙ্গক্রিয়া অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সহজ-লভ্য হইবে।

অতএব সাধনাভিলাষী পাঠক, নিত্য কায়মনোযত্নে প্রকৃত মানসপূজায় মনোযোগী হইবে। যোগীদিগের পক্ষে ইহাই 'শ্রেষ্ঠ অন্তরের পূজা,' ইহা হইতে উচ্চতর পূজাবিধান আর নাই। ইহা প্রত্যেক সাধকেরই অবলম্বনীয়।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—অষ্টাঙ্গ-যোগ-প্রক্রিয়ার মধ্যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ৭ম ও ৮ম অঙ্গত্রয়, তাহা "সাধনপ্রদীপেও" উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহা সাধারণের অধিগম্য নহে, যোগাভিলাষী উচ্চ সাধকগণেরই ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ পূর্ব্ববর্ণিত যোগের অন্যান্য ক্রিয়াগুলির সম্পূর্ণ অভ্যাস ব্যতীত এই সিদ্ধির কোনও উপায় নাই। উচ্চসাধনাভিলাষী সেইরূপ উন্নত সাধকদিগের সুবিধার নিমিত্ত এস্থলে সংক্ষেপে উক্ত বিষয় তিনটীর উল্লেখ করিতেছি। আশা করি উপযুক্ত সাধক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সাধনায় নিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে।

যোগের কোন একটী সাধনা যে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে, তাহার আভাস ইতঃপূর্ব্বে অনেক স্থলেই প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ধারণা, ধ্যান বা সমাধিক্রিয়াও পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, অথবা যম ও নিয়মাদি ক্রিয়ার বহির্ভূতও নহে। ধারণাদির অভ্যাস করিতে হইলে, সেই যমাদির অবলম্বনেই তাহা যথাবিধি সম্পন্ন করিতে হইবে। সেই কারণ শাস্ত্র তদ্বিষয়ে সামান্য পূজককেও প্রথম হইতে

ধ্যানক্রিয়ার অনুশীলন জন্য সাধারণভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"যমাদিগুণযুক্তস্য মনসঃ স্থিতিরাত্মনি।
ধারণেত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদিভিঃ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিৎ সাধকগণ 'যম' ইত্যাদি যোগাঙ্গ-পুষ্ট মন ও আত্মার একীভূত অবস্থাকেই 'ধারণা' বলিয়া উল্লেখ করেন। মূলশাস্ত্রে ধারণার সূত্ররূপে বহু উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। তবে এক কথায় বলিতে হইলে,—পরব্রহ্মের আলয়স্বরূপ এই দেহমধ্যে যে হৃদয়াদি—পদ্ম বিদ্যমান আছে তাহার অভ্যন্তরে অন্তর্ভূতশুদ্ধির ফলে ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চ—দেবতার ধারণা করিতে হইবে। ইহাকেই যোগিগণ 'পঞ্চাঙ্গ—ধারণা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষট্‌চক্রবর্ণিত মূলাধার হইতে 'লং' আদি পঞ্চভূতের 'বীজপঞ্চক' চিন্তা-সহযোগে সাধককে যথানির্দ্দিষ্ট স্থলে চিত্তে ধারণা করিতে হয় যখন যে স্থলের বিষয় সাধক চিন্তা করিবে, সেই স্থলেই চিত্তে অচঞ্চল-ভক্তি রক্ষা করিবার নাম 'ধারণা'। সাধককে প্রাণপণে চিত্তের এই স্থিরতা বা একাগ্রতার ভাব আনয়ন করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ণিত ভূতশুদ্ধিই ইহার মূল। তাহা সম্পন্ন হইলেই 'ধ্যান' ও 'সমাধি' সাধকের করতলগত হইবে। পঞ্চভূতাত্মক দেহ যে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতু-সমন্বিত, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সাধকের অবস্থা বা বাতাদির ন্যূনাধিক্য-নির্ব্বিশেষে প্রাণায়ামের ন্যায় ধারণারও ব্যতিক্রম প্রয়োজন হইয়া থাকে, গুরুমুখে সাধককে তাহাও বুঝিয়া লইতে হয়। যাহাহউক সাধক ধারণা বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিলেই 'ধ্যানক্রিয়ার'

অগ্রসর হইবে। শাস্ত্র বলেন—

"ধ্যানমেব হি-জন্তু-নাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।"

ধ্যানই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ স্বরূপ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ ধ্যানমধ্যে বিন্দু বা ব্রহ্মধ্যানই মোক্ষের শ্রেষ্ঠতম উপাদান অবিশিষ্ট ত্রিবিধ ধ্যান তাহার সহায়কমাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকাও কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। যথারীতি তাহা সম্পন্ন করিয়া না যাইলে, যোগ-ক্রিয়া আবার বন্ধনেরই কারণ হইয়া উঠে। অতএব সাধক, তদ্গতচিত্ত হইয়া ক্রমোন্নত-ধ্যান অর্থ্য অভ্যাস করিবে। কারণ একাগ্রভাবে চিত্তদ্বারা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির নামই 'ধ্যান'—

"ধ্যানমাত্মস্বরূপস্য বেদনং মনসা খলু।"

এই ধ্যান সগুণ ও নিগুণ ভেদে দ্বিবিধ। সগুণ-ধ্যান—বহুপ্রকার তন্মধ্যে আর্য্যসন্তানের নিত্য আরাধ্য পঞ্চদেবতার ধ্যানই প্রধান; কিন্তু নিগুণ-ধ্যান সাধারণতঃ একই প্রকার; সাধকের স্ব স্ব অবস্থা ও গুরুর উপদেশ অনুসারে বিভিন্ন সগুণ-ধ্যান অবলম্বন করিয়া ক্রমে নির্ব্বাতদীপকলিকাসদৃশ আত্মার ধ্যান বা তাঁহার দর্শন হইলে, সেই আত্মজ্ঞানদ্বারা প্রথমে জ্যোতির্ম্ময়-দেবতা; অনন্তর অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত আকাশ-সদৃশ নিশ্চল, নিত্য, অপ্রমেয় ও আনন্দময় সচ্চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মের পরমাণুরূপ পরমাত্মা বা তাঁহার কেন্দ্রস্বরূপ ব্রহ্মস্থানে ব্রহ্মবিন্দুর ধ্যান করিতে হইবে; ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা নিগুণ বা বিন্দু ধ্যান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধক, যোগী-সিদ্ধগুরুর কৃপায় ও আপনার ঐকান্তিক কর্ম্মের ফলেই তাহা যথাসময়ে উপলব্ধি করিবে, সুতরাং সে সকল বিষয় বৃথা লিপিবদ্ধ করিয়া

কোন ফল নাই। এখন সাধ্যমত কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া নিত্য যমাদি পূর্ব্ববর্ণিত ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান সহযোগে ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে। স্বীয় অধিকার অনুসারে দেহাভ্যন্তরে সগুণ বা নিগুর্ণভাবে পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে হইবে। পূর্ব্বক্রিয়া ধারণার সহিত তাহা সিদ্ধ হইলেই অনায়াসে যথাযথরূপ সমাধি হইতে আরম্ভ হইবে।

সমাধি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ।
তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে॥
যদা সংক্ষীয়তে প্রাণো মানসং চ প্রলীয়তে।
তদা সমরসত্বং চ সমাধিরভিধীয়তে॥
তৎসমং চ দ্বয়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
প্রনষ্টসর্ব্বসংকল্পঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ যেমন জলে সৈন্ধব-লবণ মিশ্রিত হইলে, সমতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মা ও মনের ঐক্য হইলেই তাহাকে সমাধি বলে। প্রাণক্ষয় ও মনোলয় হইলেই এক আত্মা সর্ব্বময়রূপে বিরাজ করেন; সাধুগণ সেই অবস্থাকেই উচ্চ 'সমাধি' বলেন। জীব ও পরমাত্মার ঐক্যকেও 'সমাধি' বলে। সে অবস্থায় চিত্তের সকল প্রকার সংকল্প বিনাশ প্রাপ্ত হয়; যোগিগণ তাহাকেও সমাধি আখ্যা প্রদান করেন। মন্ত্র হঠ, লয় ও রাজযোগভেদে সমাধির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে তাহা 'জ্ঞানপ্রদীপে' বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যাসা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমভাব অবস্থার নাম সমাধি, যখন জীবাত্মা কেবল ব্রহ্মবস্তুতেই অবস্থান করেন, সিদ্ধ—সাধকের সেই অবস্থাকেই সাধারণতঃ শাস্ত্র 'সমাধি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যে ভাবে সেই পরমাত্মাকে একাগ্রভাবে চিন্তা বা ধ্যান করেন সে ব্যক্তির সেই ভাবেই সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই ধ্যান-সংযোগে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংস্থাপন বা লয়করণ ব্যতীত সাধকের পরমাত্মাকে আয়ত্ত করা বা সমাধিলাভের অন্যতর উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধকের সম্পূর্ণ চিত্তস্থির ব্যতীত যোগাঙ্গের অষ্টম বা শেষ-ক্রিয়া সমাধি-সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। চিত্তস্থির সম্বন্ধে পূর্ব্বে যমাদি-ক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে, সাধক তাহা পুনঃপুনঃ স্মরণ করু। 'জ্ঞানপ্রদীপ' ও 'পূজাপ্রদীপ' মধ্যেও তাহার সুবিস্তার বর্ণনা আছে চিত্তের সেই বিভিন্নমুখী বৃত্তিসমূহের নিরোধ করিবার জন্যই শাস্ত্র সর্ব্বদা উপদেশ দিয়াছেন :—

"অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাংতন্নিরোধঃ।"

সতত যমাদি-ক্রিয়ার অভ্যাস এবং তৎসহ সংসার-বৈরাগ্যের তীব্র ইচ্ছা ও যত্ন দ্বারাই চঞ্চল চিত্তের বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়। যাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রিয়াদির ফলে চিত্তে বৈরাগ্যের সূচনা হইয়াছে, তাহারাই বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ ভাব ধারণা করিতে পারেন; এবং তাহাতেই চিত্তের পূর্ব্ব সংস্কার-পুষ্ট ভাব পরিশূন্য হইয়া সাধকের অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি সমুৎপন্ন হয়। "সাধনপ্রদীপে" সমাধি বর্ণন কালে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত এই উভয়বিধ সমাধির কথা বলা হইয়াছে। তাহা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। সেই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিমূলক বিদেহ-

লয় কিম্বা সমস্ত প্রকৃতি লয়, এই উভয় অবস্থাই সম্পূর্ণ মুক্তির কারণ নহে। যিনি শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও অতুল প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই বিদেহ-লয় ও প্রকৃতি-লয়ের অতীত প্রকৃত যোগসিদ্ধ মুক্ত-পুরুষ। নতুবা শুদ্ধ ভক্তি-সংস্কারে ঈশ্বরের প্রণিধান করিলেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অধিকার জন্মে; তাহাকে 'ভক্তি-সমাধি' বা 'ভাব সমাধি' বলে। এরূপ সমাধি কেবল চিত্তের উত্তেজনা দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবানের কোন ভাব দেখিয়া বা চিন্তা করিয়া অথবা তাঁহার নাম-সংকীর্ত্তনাদিকালে সহসা ভক্তের এক প্রকার ভাবোন্মত্ততা উপস্থিত হয়; ক্ষণিক বাহ্যেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া যেন তখন লুপ্ত হইয়া যায়, সে সময় তাহার চিত্ত সহসা ভগবদানন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। ইহা নিম্ন-অঙ্গের সমাধি বলিয়া সিদ্ধ-যোগিগণ বর্ণনা করেন। প্রথম প্রথম এইরূপ সমাধিই অনেকের হইয়া থাকে। উচ্চ সমাধি অতুল প্রজ্ঞা সমুদ্ভূত বস্তু, তাহা যমাদি সমস্ত যোগাঙ্গের সমষ্টিফল। তাহা লাভ করিতে হইলে, সমাধির অন্তরায়মূলক বস্তুসমূহ হইতে দূরে থাকিতে হইবে, এবং তাহার প্রতিষেধের জন্য বিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরের ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাতে ক্রমে 'অধ্যাত্মপ্রসাদ'রূপ ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা অর্থাৎ যথাস্বভাব বা তাহার সত্যজ্ঞান স্ফুরিত হইবে; অনন্তর তাহারই ফলে সমস্ত পূর্ব্বসংস্কার এককালীন বিনষ্ট হইবে; এবং তাহা হইতেই সর্ব্বনিরোধক ভাববর্জ্জিত নির্বীজ সমাধির আবির্ভাব হইবে। জীবনী-শক্তি-পুষ্ট জীবাত্মা পূর্ব্ব-বর্ণিত সকল চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারস্থিত ব্রহ্মবিন্দু বা পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইবে। তখনই সকল ভাবাতীত মহাভাব ব্রহ্মানন্দ লাভ

হইবে; জীব সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা রোগ-শোক বিবর্জ্জিত হইবে ও দেহ জীব স্বইচ্ছায় মুক্ত হইয়া পবিত্র ব্রহ্ম-পথের মধ্য দিয়া পরম-সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাকে যোগিগণ জ্ঞান-সমাধি বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহাই সাধকের চরম লক্ষ্য। সে দিনেও 'রামপ্রসাদ,' 'তৈলঙ্গ স্বামী' প্রভৃতি সিদ্ধ-সাধকগণ এই চরম-সাধনায় বিমুক্তাত্মা হইয়া পরমাত্মায় বিলীন হইয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যায় অভীজ্ঞ গুরুমণ্ডলী সেই কারণেই বলিয়া থাকেন, যিনি যে ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মদর্শন করিতে অভ্যাস করিবেন, তিনি সেই ভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকেন, আবার অন্তকালে যে ভাব আশ্রয়পূর্ব্বক সাধক জীবদেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাব-লোকই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"শরীরং সন্ত্যজেদ্ বিদ্বাননেনৈব দ্বিজোত্তমঃ।
যস্মিন্ সমভ্যসেদ্ বিদ্বান্ যোগেনৈবাত্মদর্শনম্।
যমেব সংস্মরেদ্বিদ্বান্ ত্যজনভাবং কলেবরম্।
তং তমেবৈত্যসৌভাবমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥"

যাহাহউক যোগসিদ্ধসাধক সেই পরম জ্ঞান বা সমাধি লাভ করিয়া অর্থাৎ পরব্রহ্মে পরমানন্দরূপে সুসংস্থিত হইয়া প্রণবরূপ একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র স্মরণ-সহযোগে সেই অব্যক্ত সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হন ও সেই অবস্থাতেই স্থূল পঞ্চভূতাত্মক জীব-দেহ-লীলা পরিত্যাগ করেন।

অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট এই যোগের যথাসাধ্য বর্ণন হইল, ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বিষয় যোগাভিলাষী সাধকের অবিরত ক্রিয়া-সাধনা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ঐকান্তিকতার ফলে গুরুকৃপায় যথাসময়ে উপলব্ধ হইয়া থাকে। সাধারণ সাধক এই যোগাখ্যান ভক্তি

সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিলেও সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত হইয়া নরোত্তমরূপে পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। যে যোগামোদী সাধক ভক্তি ও আনন্দসহযোগে জ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তিকে এই সকল বিষয় শ্রবণ করান বা শিক্ষা প্রদান করেন, তিনি জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

"য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং যোগাখ্যানং নরোত্তমঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভবেদিতি॥
যশ্চৈতচ্ছ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ নিত্যং ভক্তিসমন্বিতঃ।
সর্ব্বজন্মকৃতংপাপং সর্ব্বংসদ্যঃ প্রণশ্যতি॥"

অতএব যে পর্য্যন্ত এ দেহ জীবাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে নিত্যকর্ম্মের ন্যায় যোগানুষ্ঠান করা যেমন কর্ত্তব্য এবং ভবভীরু ব্যক্তিদিগকে আবশ্যকমত উপদেশ দেওয়াও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

যোগসিদ্ধির উপায়—যোগাভিলাষী সাধক 'মহাসাম্রাজ্যাভিষেকের' সকল ক্রিয়া অর্থাৎ তন্নির্দ্দিষ্ট পুরশ্চরণাদি সমস্ত সম্পন্ন করিয়া যোগী-গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে ও তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক বন্দনা করিবে;—প্রথমে তিনবার গুরুদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া, তাঁহার চরণ স্পর্শপূর্ব্বক পুনরায় ভক্তিসহকারে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে; অনন্তর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে। তখন গুরু, যোগ-দীক্ষাভিলাষী জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান ও আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্যকে অতীব স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিষেকের অনুরূপ যোগদীক্ষাভিষেকের সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করাইবেন। অনন্তর ঘটস্থাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীযোগেশ্বরের

যথাবিধি অর্চনা করিয়া ঘটস্থিত সিদ্ধ-সলিল-সহযোগে শিষ্যের মস্তকে অভিসিঞ্চন করিবেন, এবং তাহার উপযুক্ততা বোধে তাহাকে মন্ত্র, হঠ, লয় বা রাজ, অথবা এই সকলের যথাসম্ভব সংযোগ ও পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাথমিক কোন ক্রিয়া-বিধির উপদেশ দিবেন।

ইতঃপূর্ব্বে অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে, এই সকল উপদেশ 'গুরুমুখাগত হওয়া আবশ্যক,' তাহা না হইলে কোন বিদ্যা বা ক্রিয়াই বীর্য্যবতী হইতে পারে না; পক্ষান্তরে গুরূপদেশ ব্যতীত সেই সাধনা ক্রিয়া বীর্য্যহীনা ত হইবেই অপিচ তাহা দুঃখ-দায়িনী হইয়াও থাকে। সেই কারণ সদাশিব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্র সমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যাচাতি দুঃখদা।"

অতএব যে ব্যক্তি গুরুভক্তি-বিহীন মিথ্যাবাদী, আত্ম-প্রবঞ্চক, অহঙ্কারী ও অনাচারী, তাহার পক্ষে যোগসিদ্ধি কখনও সম্ভবপর নহে। সেই কারণ যোগশাস্ত্রে উপদেশ আছে—

"যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা যোগবিদং গুরুম্।
গুরূপদিষ্ট বিধিনা ধিয়ানিশ্চিত্য সাধয়েৎ॥"

অর্থাৎ সাধক যোগজ্ঞ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বিধি-পূর্ব্বক যোগদীক্ষা গ্রহণ করিবে, অনন্তর তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। 'অবশ্যই সিদ্ধ হইবে,' চিত্তে এমনই দৃঢ়-বিশ্বাস রাখিয়া কার্য্য করিলে কখনই বিফল-মনোরথ হইতে হইবে না। ইহা কেবল মাত্র আশার

কথাই নহে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং শঙ্করসদৃশ গুরুমণ্ডলীর সিদ্ধ-উপদেশ। সুতরাং বিশ্বাসই যে সিদ্ধির মূল-সোপান বা প্রথম-অবলম্বন, তাহা অনেক স্থলে বলা হইলেও, সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে পুনঃ পুনঃ তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এইরূপ যোগ-সিদ্ধির 'দ্বিতীয় সোপান' বা স্তর—এই সাধনকার্য্য সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অবলম্বন করা; 'তৃতীয়'—ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীগুরু-পাদুকা পূজা; 'চতুর্থ'—সমতাভাব বা সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ উদারভাব, অর্থাৎ সকলকে সমান চক্ষে দেখিতে প্রয়াস করা; 'পঞ্চম'—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা সাধ্যমত ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্ন করা, এবং 'ষষ্ঠ'—পরিমিত সাত্বিক আহার, অর্থাৎ দুগ্ধ, ঘৃত ও মিষ্টান্নাদি পরিমিত-রূপে ভোজন করা আবশ্যক; এ সময় অধিক লবণাক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে; হিঞ্চা, নটীয়া, পুনর্ণবা ও বেতোশাক ব্যতীত অন্য কোন শাক খাওয়াও এ সময় ভাল নয়। এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। যাহাহউক এই ছয় প্রকার বিধান ব্যতীত যোগসিদ্ধির পক্ষে সপ্তম ক্রিয়া আর কিছুই নাই। কোন প্রকারে এই ষড় বিধ-বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গুরূপদেশমত কার্য্য করিলে, সে সাধকের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, ইহাও শ্রীশ্রীযোগেশ্বর সদ্‌গুরুর উপদেশ।

ইতঃপূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি ও ষট্‌চক্রাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, সাধক স্বীয় অবস্থা অনুসারে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়চিত্তে তাহা অবলম্বন করিবে। এক্ষণে যোগ সম্বন্ধে কতিপয় বিশেষ উপদেশের উল্লেখ করিতেছি, আশাকরি সাধনাভিলাষী পাঠক, তাহাও মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবে।

যোগসম্বন্ধে বিশেষ কথা—অষ্টাঙ্গ-

যোগের যমাদি সাধারণ ক্রিয়াগুলি কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত হইলেই, কোন কোন বিশেষ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। পূর্ব্বে অনেকস্থলে বলা হইয়াছে,—মনস্থির না হইলে, যোগসাধনার কোন কার্য্যই হইবে না, অথবা মনস্থির করাই যোগের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই কারণ তাহাই সর্ব্বপ্রথমে অবলম্বনীয়। সংযতেন্দ্রিয় ও নিয়মপর সাধক বেশ নিরুদ্বেগ অবস্থায় রাত্রিকালে উত্তরাস্য এবং দিবসেও উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া যে কোন 'নির্দ্দিষ্ট আসনে'; উপবেশনপূর্ব্বক মনস্থির করিতে যত্ন করিবে। এতদুদ্দেশে কোন্ কোন্ 'আসন,' 'মুদ্রা' ও 'প্রাণায়াম' বিশেষ উপযোগী। যোগাভিলাষী সাধকগণের অবগতির জন্য 'হঠ' ও লয়াদি যোগসূত্র হইতে তাহার কিছু কিছু বর্ণন করিতেছি।

শাস্ত্রীয় পঞ্চবিংশতি প্রকার মুদ্রাপ্রকরণের মধ্যে দশটীই প্রধান। যথা—১। মহামুদ্রা, ২। মহাবন্ধ, ৩। মহাবেধ, ৪। খেচরী, ৫। উড্ডান, ৬। মূলবন্ধ, ৭। জালন্ধরবন্ধ, ৮। বিপরীতকারিণী, ৯। বজ্রোলী ও ১০। শক্তিচালন। ইহার অভ্যাসদ্বারা জরামৃত্যুকেও পরাজিত করিতে পারা যায়। স্বয়ং আদিনাথ মহাদেব এই দশবিধ মুদ্রার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অনধিকারীকে ইহার উপদেশ দেওয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। সাধনাভিলাষী যোগী, গুরুর আদেশ ক্রমে নিজ অধিকার অনুসারে যেটী প্রয়োজনীয় কেবল সেইটাই যথারীতি অভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

১। **মহামুদ্রা**—ইহার আচরণ করিলে, মন্দভাগ্যও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, ইহাদ্বারা সকল বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়, বীর্য্যধারণ ও ইন্দ্রিয় দমনাদি বিবিধ বিষয় ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া

থাকে। এই মুদ্রা কামধেনুস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

দক্ষিণ পাদমূল বা গুল্‌ফ (গোড়ালী) দ্বারা দক্ষিণ-যোনি-প্রদেশ অর্থাৎ গুহ্য ও উপস্থের মধ্যবর্ত্তী স্থান দৃঢ়রূপে নিপীড়িত করিবে৷প্রথমে বাম-পদটী ঊর্দ্ধজানু করিয়া জানুর উপর করতলদ্বয় রাখিয়া নিমীলিত- নেত্রে পূরক ক্রিয়া সহযোগে কুণ্ডলিনী চিন্তা করিবে৷পরে ঐ বাম পদটী সত্বর দণ্ডাকারে প্রসারিত করিয়া ভূতলে সংলগ্ন করিতে হইবে। অনন্তর উভয় হস্ততল বা উভয় হস্তের তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা সেই প্রসারিত বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠদেশ সম্পূর্ণ জালন্ধরবন্ধ অর্থাৎ কণ্ঠ আকুঞ্চন করিয়া বক্ষ-প্রদেশে দৃঢ়ভাবে চিবুক-সংস্থাপন-পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রেই কুম্ভক-সহযোগে কুণ্ডলিনীকে চিন্তা ও হূঁকার দিয়া মূলাধার আকুঞ্চনাদি ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে ক্রমে জাগরিতা করিতে হইবে, এবং গুরুর উপদেশ অনুসারে সুষুম্না-পথে তাঁহাকে উত্থাপন করাইতে হইবে। তৎপরে পদাঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিবে ও জালন্ধরবন্ধ শিথিল করিয়া, একটু মুখ তুলিয়া অতি ধীরে ধীরে পূর্ব্ববর্ণিত প্রাণায়ামের বিধান অনুসারে বায়ু-রেচন করিবে, তাহাতে তখন অনুমাত্রও বেগ প্রদান করিবে না।

সাধক, প্রথমে বামাঙ্গে এই মহামুদ্রা অভ্যাস করিয়া পরে উক্তরূপে দক্ষিণাঙ্গেও অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ সংযতভাবে বামপদের গুল্‌ফ দ্বারা বামযোনিমণ্ডল সংপীড়িত করিয়া, দক্ষিণ পদটী প্রথমে ঊর্দ্ধজানু করিয়া জানুর উপরে করতলদ্বয় রাখিয়া নিমিলিত নেত্রে পূরকক্রিয়া সহযোগে পুনরায় কুণ্ডলিনী চিন্তা করিবে, পরে ঐ বামপদটী সত্বর দীর্ঘ করিয়া, পূর্ব্ববৎ উভয়

হস্ত বা উভয় হস্তের তর্জ্জনীদ্বয়দ্বারা দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়ভাবে ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সমস্ত ক্রিয়া করিবে। এই ভাবে উভয়-অঙ্গে সমান সংখ্যক কুম্ভক সম্পন্ন হইলে এইবার উভয় জানু উত্তোলন করিয়া উভয় হস্তদ্বারা জানুদ্বয় আবরণপূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে কুণ্ডলিনী চিন্তা, পরে উভয় পদ প্রসারণপূর্ব্বক উভয় পদাঙ্গুষ্ঠ উভয় করের তর্জ্জনীদ্বয়দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া মহামুদ্রা 'বিসর্জ্জন' করিবে। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, পূরক ও রেচক কালে জালন্ধরবন্ধ শিথিল করিয়া অর্থাৎ কণ্ঠের আকুঞ্চনভাব পরিত্যাগ করিয়া চিবুকও বক্ষদেশ হইতে উত্তোলন করিয়া ক্রিয়া করিবে। ইহাই গুরূপদিষ্ট মহামুদ্রা; ইহা অতি সাবধানে ও গুপ্তভাবে সম্পন্ন করা বিধেয়। মহামুদ্রা সাধনার সময় উন্নত ক্রিয়াবান সাধক ক্রমে কুণ্ডলিনী উত্থাপন দ্বারা চক্রে চক্রে তাঁহার ধ্যান বা দর্শন করিতে করিতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত আসিয়া জ্যোতির্ধ্যানের ক্রিয়া অভ্যাস করিয়া থাকেন। তাহা প্রয়োজনমত গুরুর উপদেশ সহ সম্পন্ন করিতে হয়।

২। **মহাবন্ধ**—ইহাতে মহামুদ্রার অনুরূপ সমস্ত ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ অবলম্বন করিয়া কেবল প্রসারিত পদটীর তলদেশ যোনিপ্রদেশে রক্ষিত পদের উরুর উপর স্থাপন করিবে এবং মূলাধারাদি আকুঞ্চন পূর্ব্বক ও পশ্চাৎতান অর্থাৎ উদরাংশ মেরুদণ্ডের দিকে আঁতমারিয়া অপান বায়ুকে উর্দ্ধগামী করিয়া নাভিমণ্ডলে সমান বায়ুর সহিত প্রাণবায়ুকেও সংযুক্ত করিবে অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়ামদ্বারা হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুকেও নিম্নমুখে নাভিমণ্ডলে আনয়ন করিয়া কুম্ভক সহযোগে উক্ত বায়ুদ্বয়ের

সহিত সংবদ্ধ করিবে, অনন্তর ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে। ইহাতেও প্রথমে বামপদ পরে দক্ষিণ পদ দ্বারা যথাক্রমে উভয় অঙ্গে ক্রিয়ার অভ্যাস করিবে।

এই মহাবন্ধ আবার মহামুদ্রায় সহায়ক। কারণ মহাবন্ধ ব্যতীত মহামুদ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। ইহার অভ্যাসের ফলে যোগীর দেহস্থিত রসসমূহ উর্দ্ধগামী হইয়া নাড়ী সমুদায় নির্ম্মল হয়, অস্থিপঞ্জর দৃঢ় হয়, সুষুম্না-পথে বায়ু চলাচল পক্ষে সহায়তা করিয়া চিত্তে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। সাধকের প্রয়োজন মত গুরুর উপদেশক্রমে এক সঙ্গেই মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ অবলম্বন করা যাইতে পারে অর্থাৎ মহামুদ্রায় চরণ প্রসারিত করিয়া যথারীতি কুম্ভকের পর জালন্ধর বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে; পরে মহাবন্ধ-নির্দ্দিষ্ট প্রসারিত পদটী সঙ্কোচিত করিয়া উরুর উপর রাখিবে ও পূর্ব্ববৎ প্রাণায়ামদ্বারা কুম্ভক করিবে। এই সময় ক্রোড়ের উপর করতলদ্বয় উত্তানভাবে রক্ষা করিয়া অল্প পরিমাণে লিঙ্গমূল বা যোনিদেশ চাপিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে অপান বায়ু কিয়ৎকাল স্থির থাকিবে; ফলে পরবর্ত্তী 'মহাবেধ' সাধনা সহজসাধ্য হইবে।

৩। **মহাবেধ**—শাস্ত্রে কথিত আছে, রমণীগণের রূপ-যৌবন ও লাবণ্য যেমন পুরুষ বা স্বামী ব্যতীত সম্পূর্ণ বৃথা, সেইরূপ মহাবেধ ব্যতীত, মহামুদ্রা ও মহাবন্ধের অনুষ্ঠান উভয়ই বৃথা। সেই কারণ 'একত্র এই তিনটী প্রক্রিয়া' শাস্ত্রে 'বন্ধত্রয়-যোগ" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ত্রিতয়ের সাধনা দ্বারা যোগী মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপ হইতে পারেন, অর্থাৎ দেহ নিব্যাধি হইয়া

থাকে। সাধকের অবস্থানুসারে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে ও নিশা-সময়ে বিধিপূর্ব্বক অতি গোপনে এই 'বন্ধত্রয়-যোগ' সাধনা করা বিধেয়। প্রথমতঃ মহাবন্ধের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক একাগ্রমনে নাসাপুটদ্বয়ে বায়ু আকর্ষণ করিয়া দেহভাণ্ড পূর্ণ করিবে, পরে জালন্ধর মুদ্রাদ্বারা প্রাণাদি বায়ুর গতি রুদ্ধ করিয়া যথাসাধ্য নিশ্চল ভাবে কুম্ভক করিবে ও উভয় বাহুর মধ্যস্থল বা কূর্পর দ্বারা উদরের উভয় পার্শ্বে পাঁজরার উপর অল্প অল্প চাপ দিবে। কোন কোনও যোগী এই সাধনায় করতলদ্বয় উভয় পার্শ্বে ভূমিসংলগ্ন করিয়া তাহারই উপর ভর দিয়া ভূতল হইতে ঈষৎ উন্নত হইয়া বাহুমধ্য দ্বারা কোটীতে মৃদু মৃদু তাড়না করিতে উপদেশ দেন। এই অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাণবায়ু ইড়া ও পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সুষুম্নাপথেই সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এই মহাবেধের অনুষ্ঠান ফলে সুষুম্নাগ্রন্থি বিদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ষট্চক্রবর্ণিত ব্রহ্মগ্রন্থি, পরে বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদপূর্ব্বক কুণ্ডলিনী 'সহস্রারে' গমন করিতে সমর্থা হইয়া থাকেন। পূর্ব্ববর্ণিত 'অন্তর্ভূতশুদ্ধির' সময় এই সকল মুদ্রার অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশ ব্যতীত কোন কর্ম্মই করা বিধেয় নহে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৪। **খেচরীমুদ্রা**—যে কোন নিরুপদ্রবস্থানে বজ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ দুইজঙ্ঘা বজ্রাকৃতি করিয়া পদদ্বয় গুহ্যদেশের উভয়পার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টি স্থাপন করিবে, এবং জিহ্বামূলের ঊর্দ্ধে তালুপ্রদেশে যে অমৃত-

কূপ আছে, তাহাতে জিহ্বাকে বিপরীত দিকে সমুখিত করিয়া সযত্নে সংযুক্ত করিবে। ইহাকেই খেচরীমুদ্রা কহে। ইহা সর্ব্বসিদ্ধির কারণস্বরূপ। প্রত্যহ ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা সহস্রার-বিগলিত-সুধা পান করিতে পারিলে, সাধকের কিছুই অসিদ্ধ থাকে না। সমস্ত যোগশাস্ত্রে ও সিদ্ধযোগিমুখে ইহার অসংখ্য প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। গুরূপদেশ অনুসারে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, পরমগতি লাভ হইতে পারে এই মুদ্রাসাধনের জন্য জিহ্বার ছেদন, চালন ও দোহন করিতে হয়; কিন্তু সাধকের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে, সে সকল অনুষ্ঠান না করিয়াও গুরুর কৃপায় খেচরীমুদ্রা সিদ্ধ হইতে পারে, ইহাই আবার তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট পঞ্চ-মকারের মাংস-সাধনা।

'খেচরীমুদ্রায়'—মৌনীভাবে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া পরমাত্মায় চিত্তলয় করাই প্রধান কার্য্য। ইহারই প্রকারভেদে শাস্ত্রে "শাম্ভবীমুদ্রার" উল্লেখ আছে। কেবল চিত্তের অবস্থিতিভেদে খেচরী ও শাম্ভবীমুদ্রার ভেদ হইয়া থাকে। 'শাম্ভবীতে—বাহ্য-দৃষ্টিতেই চিত্তের অবস্থিতি করিতে হয়। প্রকারভেদ বশতঃ দেশ, কাল ও পরিচ্ছেদশূন্য অথবা স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ বর্জ্জিত, চিদানন্দময়, পরমাত্মাতে চিত্ত লয় জন্য আনন্দ জন্মে। শাম্ভবীমুদ্রায—বাহ্যপদার্থে চক্ষুর সম্বন্ধমাত্রই থাকে, 'নিমেষ-উন্মেষ' থাকে না। ফলতঃ উক্ত মুদ্রাদ্বয়ে চিত্ত-লয় জন্য আনন্দের কোন ভেদ থাকে না। এই অবস্থায় যোগী অনাহতাদি পদ্মে অন্তর্লক্ষ্য রাখিয়া 'অহংব্রহ্মাস্মি' ভাবিয়া মন প্রাণ বিলীন করিতে থাকেন।

৪।ক **উন্মনীমুদ্রা**—চক্ষুর তারকাদুটীকে প্রকাশ-

মান জ্যোতিতে সংযোজিত করিয়া ভ্রূদ্বয়কে ঈষৎ উন্নীত করিতে হয় এবং পূর্ব্বের ন্যায় অন্তর্লক্ষ্য ও বহির্দৃষ্টি হইয়া মনের যোগসাধন অবস্থাকে যোগিগণ "উন্মনামুদ্রা" বলিয়া বর্ণনা করেন।

৫। **উড্ডীয়ানবন্ধ**—এই বন্ধের সাধনায় প্রাণবায়ু সুষুম্নারূপ আকাশে গমন করে, এই জন্যই যোগোপদেষ্টা মহাত্মগণ ইহার 'উড্ডীয়ান' বা 'উড্ডানবন্ধ' নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাহউক উহার প্রক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপে করিতে হইবে। নাভিদেশের উপর ও নিম্ন অংশ "পশ্চিমতান" করিবে অর্থাৎ পশ্চাৎ বা মেরুদণ্ডের দিকে উদরাংশ আকর্ষণ করিবে বা "আঁত মারিবে"। কোন কোন মহাত্মা কেবল নাভির উপর অংশই পশ্চাৎ দিকে প্রায় মেরুদণ্ড অবধি উদরের চর্ম্ম আকর্ষণ করিতে পরামর্শ দেন। যে কোন পবিত্র স্থানে প্রত্যহ চারিবার করিয়া অতি গোপনে গুরু‍নির্দ্দিষ্ট কুম্ভকসহযোগে এই উড্ডানবন্ধের অনুষ্ঠান করিলে ছয় মাসের মধ্যে সাধকের নাভি ও বায়ুশুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা মুক্তির দ্বারস্বরূপ।

৬। **মূলবন্ধ**—পাঞ্চি বা পাদমূলদ্বারা যোনিপ্রদেশ প্রপীড়িত করিয়া গুহ্য-সঙ্কুচিত করিবে এবং অধঃস্থ অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিবে। ইহারই নাম "মূলবন্ধ"। এই প্রক্রিয়াদ্বারা অধোগমনশীল অপান বায়ুকে মূলাধার-সঙ্কোচনযোগে সবলে ঊর্দ্ধগামী করা যায়। তাহাদ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর মিলন হয়, এই নিমিত্তই যোগিগণ ইহাকে মূলবন্ধ বলিয়া থাকেন। পাঞ্চিদ্বারা গুহ্য-পীড়নপূর্ব্বক যাহাতে বায়ু সুষুম্নার মধ্যে ঊর্দ্ধগামী হইতে পারে, এই প্রকার মুহুর্মুহু সবলে বায়ু আকুঞ্চন করিবে।

ইহাদ্বারা 'যোনিমুদ্রা' সিদ্ধ হয়। এই মূলবন্ধের প্রসাদেই জিতেন্দ্রিয় সাধক যোগিগণ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কুম্ভক সহযোগে ভূতল পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইতে পারেন। সাধনার সময়ে পাঞ্চিদ্বারা যোনি প্রপীড়িত করিবার কথা বলা হইল, পরন্তু ক্রমে ইহাতে সিদ্ধ হইলে, আর যোনি প্রপীড়নের প্রয়োজন হইবে না। তখন স্বস্তিকাসন বা পদ্মাসনে বসিয়াই কুম্ভক ও মূলবন্ধ দ্বারা অপান উত্তোলন করিলে, যোগী শূন্যমার্গে উত্থিত হইতে পারিবেন। ইহাদ্বারা বৃদ্ধও যুবার ন্যায় হইতে পারেন। এই সাধনাদ্বারা অপান বায়ু উর্দ্ধগামী হইলে, ইহা নাভিনিম্নস্থ বহ্নিমণ্ডলে উপস্থিত হয়। তখন ঐ অগ্নিশিখা বায়ুদ্বারা আহত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তৎপরে ঐ বহ্নি ও অপান বায়ু উষ্ণস্বরূপ প্রাণকে লাভ করে। এইরূপে ঐ তিনের একত্র মিলন হইলেই দেহস্থিত বহ্নি প্রবর্দ্ধিত হয় এবং তাহা দ্বারা সন্তপ্ত হইলে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী সন্তাপিতা ও জাগরিতা হইয়া প্রশ্বাস বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ঋজুতা প্রাপ্ত হন এবং সুষুম্নার মধ্যে গমন করেন। এইজন্য নিত্য এই মূলবন্ধের অনুষ্ঠান করা যোগিগণের কর্ত্তব্য।

৭। **জালন্ধরবন্ধ**—কণ্ঠ আকুঞ্চনপূর্ব্বক গলদেশের শিরাসমূহের চাঞ্চল্য রোধ করিয়া বক্ষঃপ্রদেশে দৃঢ়ভাবে চিবুক-সংস্থাপন করিলেই 'জালন্ধরবন্ধ' হইয়া থাকে। ইহা জরা ও মৃত্যু নাশক। ইহার অনুষ্ঠান কালে কপাল-কুহরস্থ 'সোম-চক্র' হইতে গলিত অমৃত বা 'সোমরস' নাভিমণ্ডলস্থিত সর্ব্বসংহারক বহ্নিমুখে পতিত হইতে পারে না এবং বায়ুও কুপিত হইতে পারে না। দৃঢ়রূপে কণ্ঠ-সঙ্কোচন দ্বারা ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়িদ্বয়

স্তম্ভিত হয়। কণ্ঠে 'বিশুদ্ধ' নামে যে চক্র আছে, তাহার আর একটী নাম মধ্যচক্র; উক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা এই চক্রে ষোড়শাধারের বন্ধন হয়। এই সকল কারণে 'মহামুদ্রা' প্রভৃতি সাধনার সহিত 'জালন্ধরবন্ধের' এত অধিক প্রয়োগ আছে।

এই 'জালন্ধরবন্ধ' এবং পূর্ব্ববর্ণিত 'উড্ডিয়ান' ও 'মূলবন্ধ' একত্র অভ্যাস করাকে "বন্ধত্রয়-যোগসাধনা" বলে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গুরুদেব পূজ্যপাদ গোবিন্দপাদাচার্য্য দেবের উপদেশ ক্রমে 'হঠ যোগ' মূলক এই 'বন্ধত্রযযোগ' সাধনাদি দ্বারা সত্বর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'যোগ-তারাবলী' গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট করিয়াই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্যক্‌রূপে মূলাধার আকুঞ্চনপূর্ব্বক নাভির সমীপবর্ত্তী উদর পশ্চিমতানবন্ধদ্বারা উড্ডীয়ান বন্ধ, পরে জালন্ধরবন্ধ দ্বারা প্রাণ-বায়ুকে সুষুম্নাতে প্রবাহিত করিবে। এইরূপ বন্ধত্রয় দ্বারা প্রাণবায়ুর লয় হয়। প্রাণ এইরূপে স্থিরভাব ধারণ করিলে জরা বা অন্য কোন রোগ দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। মহাসিদ্ধগণসেবিত এই তিনটী বন্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে হঠ-যোগ-সাধনের যে সকল উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, যোগিগণ এই সাধনাকেই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গননা করেন।

৮। **বিপরীতকারিণী-মুদ্রা**—দেহ-পিণ্ডের মধ্যে 'সূর্য্য' নাভির উর্দ্ধে, এবং সুধাত্মক 'চন্দ্র' তালুর নিম্নে সতত অবস্থিত। বিশেষরূপ কোন যোগানুষ্ঠানের দ্বারা কখন কখন তাহার বৈপরীত্য-সাধনের প্রয়োজন হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয় যোগিগণ তাহাকে বিপরীতকারিণী মুদ্রা

বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহাও গুরুর উপদেশ ক্রমে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ইহাতে জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়, দেহের বলি-পলিতাদি বিদূরিত হয়। ইহার অনুষ্ঠানকল্পে উর্দ্ধগত চন্দ্রকে নিম্নে এবং নিম্নগত সূর্য্যকে উর্দ্ধগামী করিতে হইলে, প্রতিদিন গুরুপদেশ মত চিৎ হইয়া শয়নপূর্ব্বক ক্রমে উর্দ্ধপাদ ও অধঃশির হইয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে। প্রথম দিনে এক ক্ষণ কাল, দ্বিতীয় দিনে দুই ক্ষণ, তৃতীয় দিনে তিন ক্ষণ, এইভাবে প্রত্যহ এক এক ক্ষণ বৃদ্ধি করিয়া এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। ইহাই হঠ-যোগে-নির্দ্দিষ্ট 'বিপরীতকারিণী'-মুদ্রার সাধারণ নিয়ম। লয়-যোগে বিপরীতকারিণীর স্বতন্ত্র নিয়ম আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ ষট্‌চক্রের মধ্যে নিম্নমুখী কমল-সমূহের বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে।

৯। **বজ্রোলী-মুদ্রা**—যোগ-শাস্ত্রের মধ্যে এই বজ্রোলীমুদ্রা-সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। ইহাতে ভোগমার্গে থাকিয়াও যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ইহার স্থূল প্রক্রিয়া এই যে, স্ত্রী-যোনিবিবর হইতে যথাবিধি রজঃ আকর্ষণ করিয়া আপন-শরীরে প্রবেশিত করিয়া, স্বীয় বীর্য্যও তাহার সহিত সম্মিলিত করিয়া বা স্খলনোন্মুখ বীর্য্যকে আকর্ষণ করিয়া স্ব-দেহেই রক্ষাকরা ইত্যাদি। হঠ-যোগের মধ্যে ইহার সাধনা-কল্পে বহুবিধ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সকল কথা গুরুমুখেই অবগত হওয়া ভাল। তবে স্থিরচিত্ত ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষী সাধকের এ সকল সাধনার কোনই প্রয়োজন নাই।

এই বজ্রোলীরই অনুরূপ আরও দুইটী সাধনা আছে,

তাহাকে যথাক্রমে 'সহজোলী' ও 'অমরোলী'—মুদ্রা বলে। নিম্নাধিকারী তান্ত্রিকদিগের মধ্যেই এই সকলের প্রচলন অধিক। অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রীসংসর্গাদি পরিত্যাগ করিতে অপারগ তাঁহাদের পক্ষেই এই মুদ্রার অনুষ্ঠান প্রশস্ত। ফলতঃ যে কোন প্রকারে বিন্দুধারণই এই সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। যাঁহারা 'ব্রহ্মচারী' ও 'জিতেন্দ্রিয়' তাহাদের এ সকল মুদ্রার অনুশীলনে আদৌ প্রয়োজন নাই।

গৃহস্থ ও বীরাচারী সাধকদিগের মধ্যে এই ক্রিয়া অত্যন্ত তামসিক ও বীভৎসভাবে এখনও যথেষ্ট প্রচলিত আছে। বাঙ্গলার কোন কোন সিদ্ধ-গুরুর বংশে তাহার সেই বিকৃত ব্যবহার ও উপদেশপ্রণালী দেখিয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইতে হয়। সাত্ত্বিকাচারী সাধকদিগের পক্ষে তাহা নিতান্তই অশ্রাব্য; যাউক সে সকল কথা। বীর্য্যধারণ বা স্ব-শরীরে বীর্য্যরক্ষাই এই ক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সপ্ত-ধাতু-পরিপুষ্ট-বীর্য্য যে মহা শক্তিশালী বস্তু, তাহা কাহারই অবিদিত নাই। তাহার বিন্দুমাত্র হইতেই রজঃ বা রস-সহযোগে নূতন জীবের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। সেই তেজঃপুঞ্জ সার-সামগ্রীকে বৃথা বিনষ্ট না করিয়া ক্রিয়া-বিশেষদ্বারা স্বীয় দেহে আকর্ষিত ও সঞ্চারিত করিতে পারিলে, গৃহস্থ সাধকের দেহ নূতন বলে বলীয়ান হইয়া নব নব সাধনায় নিয়োজিত হইতে পারে। জীব, জন্তু ও উদ্ভিদ, সকলের মধ্যেই এ বীর্য্য স্বাভাবিক-ভাবে সমুৎপন্ন হয়। আম্রাদি বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই বজ্রোলী প্রভৃতি সাধনা-ফলের আভাস সকলেই সহজে উপলব্ধি

করিতে পারিবে। যে সময় বৃক্ষে মুকুল ধরে, যদি কোন কারণে সেই মুকুল ঝরিয়া যায় বা তাহা ফলে পরিণত হইতে না পারে, তাহা হইলে দেখা যায়, সে বৎসর বৃক্ষটী অপেক্ষাকৃত সতেজ হইয়া উঠে, তাহার শাখা-প্রশাখা নব নব পল্লবে পূর্ণ হইয়া যায়। গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে 'কচিয়ে যাওয়া' বলে। তাহার কারণ বৃক্ষের সেই বীর্য্য, সে বৎসর তাহার অঙ্গেই আকর্ষিত ও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ মানব সতত স্ত্রী-সংসর্গে থাকিয়া কামাকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেই তাহার শুক্রস্থলীতে সেই শুক্রবীর্য্য সঞ্চিত হইয়া থাকে, সে সময় যদি তাহা কোনরূপে অর্থাৎ ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া স্বীয় রস ও রক্তের সহিত সম্মিলিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উক্ত বৃক্ষের ন্যায় মানব-দেহেও পুষ্টিলাভ করিতে পারে। পূর্ব্বকালে এই রীতি কোন কোন বিশিষ্ট নর-নারীর মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে মোসলমান নরপতি ও সামন্তদিগের মধ্যেও এই ক্রিয়া অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। সেই কারণ তাঁহারা শত শত নারী-সহবাস ও অহরহঃ মৈথুনাশক্ত থাকিয়াও রণক্ষেত্রে প্রভূত বল-বিক্রমের পরিচয় দিতে পারিতেন। যাহাহউক সাধনার বস্তু ক্রমে ব্যসনে পরিণত হইয়াছিল, কালে তাহার বিকৃত ব্যবহারে তামসিক সাধকগণের মধ্যে অতি জঘন্য ও কুৎসিত ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে। সাত্ত্বিক-সাধনাভিলাষী ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ-উদ্দেশেই 'বজ্রোলী মুদ্রার' এই সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদত্ত হইল। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুমুখব্যতীত এই ক্রিয়া কেহ যেন আধুনিক নামধারী সিদ্ধবংশ-সম্ভূত তামসিকাচারী গুরুর নিকট কখনও গ্রহণ না

করে। হায় হায়! কালের গতিকে সাত্ত্বিক-সাধনমার্গের কি ভীষণ পরিণাম! স্মরণ করিলেও আজ শরীর যেন শিহরিয়া উঠে।

১০। **শক্তিচালন-মুদ্রা**—জীবের জীবনী-শক্তি কুণ্ডলিনী মূলাধারপদ্মে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ষট্‌চক্রের বর্ণনায় তাহা বিস্তৃত ভাবেই বলা হইয়াছে। সাধক 'অপানবায়ুর' অকুঞ্চন-সহযোগে বলপূর্ব্বক সেই কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগরিত করিয়া সুষুম্না-পথে পরিচালিত করিবে। ইহাকেই শক্তিচালন-মুদ্রা কহে। প্রতিদিন এই 'শক্তিচালন' অভ্যাস করিলে, সাধক 'অনিমা-লঘিমা' আদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

মুদ্রা সিদ্ধিকর প্রক্রিয়াসমূহ অন্তর্ভূতশুদ্ধি-ক্রিয়া-পরায়ণ সাধক, গুরুর কৃপায় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। এই সকল মুদ্রার মধ্যে সাধকের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে গুরুর আদেশক্রমে যে কোনও একটী মুদ্রার যথাবিধি অবলম্বনেই সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়।

ব্রহ্মচর্য্যরত, নিত্য হিতকর ও পরিমিত ভোজী, ঈশ্বরানুগত এবং শক্তিচালনাদি যোগাভ্যাসে নিরত এইরূপ সাধক, অনতিকালমধ্যে সর্ব্বোচ্চ প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিলে, তাঁহার প্রাণবায়ু সুস্থির হয়, দেহ ক্রমে চন্দ্রের ন্যায় অমৃতপূর্ণ হয়, তাঁহার শমন-ভয় বিদূরিত হয় এবং অন্তিম দেহত্যাগ তাঁহার স্বাধীন হয়, অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেই দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারেন; অথবা বহুদিন এক দেহে বা দেহান্তরে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইয়া যোগরত হইয়া থাকিতে পারেন।

যোগশাস্ত্রোক্ত 'হঠ-প্রধান মুদ্রা-প্রকরণ' এক প্রকার বর্ণিত হইল। 'জ্ঞানপ্রদীপে' যোগের অন্যান্য বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে এস্থলে 'লয়-যোগের' কতিপয় সহজ সঙ্কেত বর্ণিত হইতেছে।

লয়যোগ সঙ্কেতঃ—জগৎ-প্রপঞ্চ সমস্তই জ্ঞেয় এবং মনই জ্ঞান, কারণ সমস্তই মনের সঙ্কল্পমাত্র। এই জ্ঞান ও জ্ঞেয়, মনের সহিত সম্বন্ধ জড়িত; সুতরাং মনের লয়ে জ্ঞান জ্ঞেয় কিছুই থাকে না। যদি জ্ঞান ও জ্ঞেয় দুইই নষ্ট হইল, তবে মনের দ্বিতীয় অবস্থা আর কি থাকিতে পারে? তখনই তাহার দ্বৈতভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে—

"জ্ঞেয়ংসর্ব্বং প্রতীতং চ জ্ঞানং চ মন উচ্চতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং নষ্টং নান্যঃপন্থা দ্বিতীয়কঃ॥
মনোদৃশ্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসোহ্যুন্মনীভাবাদ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥
জ্ঞেয়বস্তুপরিত্যাগাদ্বিলয়ং যাতি মানসম্।
মনসোবিলয়েজাতে কৈবল্যমবশিষ্যতে॥"

লয়প্রধান মন্ত্রযোগে এই সর্ব্বসঙ্কল্পধার মনের লয় সাধনই প্রধান কার্য্য। বাহ্য ও অন্তর ভেদে লয় দ্বিবিধ। বাহ্যবস্তুতে দৃষ্টিস্থাপন দ্বারা মনের যে লয়, তাহাকে বাহ্যলয় যোগ এবং অন্তরে ধ্যেয়বস্তুতে মনের যে লয়, তাহাকে অন্তর্লয় যোগ বলা যায়। পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে, পূর্ব্বে 'ত্রিলক্ষ্য' ও 'ষোড়শাধার' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, সাধনার্থীর অবস্থানুসারে গুরুমুখগত হইয়া

লয়-যোগ সাধনায় তাহারই এক একটী সাধনা করিতে হয়। পূর্ব্বকথিত নাভি-চিন্তাসহ বাহ্যভূতশুদ্ধি ও অন্তর্ভূত-শুদ্ধিও, সেই লয় তথা আংশিক 'রাজ-যোগ' সাধনার প্রধান অথচ প্রথম অনুষ্ঠান। সাধক গুরুপদিষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে কার্য্য করিলে, সমস্তই সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং এতদ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই, এস্থলে তাহার দুই একটী উল্লেখমাত্র করিতেছি।

নির্জ্জন স্থানে নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর শবের মত চিৎ হইয়া শুইয়া স্বীয় দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠের উপর লক্ষ্য রাখিয়া মনে ধ্যান করিবে, অর্থাৎ তখন সেই অঙ্গুষ্ঠের উপরই চিত্ত রহিয়াছে, একাগ্র ভাবে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। লয়-যোগ-নির্দ্দিষ্ট চিত্তকে লয় করিবার পক্ষে ইহা একটী সহজ ও উৎকৃষ্ট উপায়। ইহা আবার পূর্ব্বোক্ত ষোড়শাধারের প্রথম আধার। সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ষট্‌চক্রবর্ণিত 'মনশ্চক্রে' চিত্তকে স্থাপনা করিয়া পরক্ষণেই 'ভ্রূমধ্যে' চিত্তকে আনয়ন করিবে, পুনরায় 'মনশ্চক্রে', এই ভাবে ক্রমাগত চিত্তকে স্থাপনা বা লয় করিতে অভ্যাস করিলে অনতি-কাল-মধ্যে 'নাদানুভূতি' হয়। ইহাও লয় যোগান্তর্গত 'অবণি-সাধনা নামক একটী উৎকৃষ্ট বিধান। ('জ্ঞানপ্রদীপ'—(১মভাগে লয়যোগের বিস্তৃত বিবরণ দেখ)।

মিশ্রযোগ সঙ্কেতঃ—'হঠ' ও 'লয়'-যোগের সমাহারেও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ক্রিয়ার ব্যবহার আছে, সেগুলিকে লয়-যোগন্তর্গত ক্রিয়া বলিয়া যোগিগণ বর্ণনা করেন।

সাধনার্থীর অবগতির জন্য সে সম্বন্ধেও দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি।

নাসিকাগ্রে বা নাসিকার উপর শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত বা পীত বর্ণ বিশিষ্ট দশাঙ্গুল জ্যোতির ধ্যান করিবে, তাহাতেও চিত্ত লয় হয়। ('পুরশ্চরণপ্রদীপে'—তত্ত্বাদি বিচার অংশে জ্যোতির গুণ ও রহস্য দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে।)

নাসিকার উপর অষ্টাঙ্গুলি বিশিষ্ট রক্তবর্ণ জ্যোতিঃ অথবা দ্বাদশ অঙ্গুলি বিশিষ্ট পীতবর্ণ পৃথ্বীতত্ত্ব ধ্যান করিবে।

মস্তকের উপর সপ্তদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ পীতবর্ণ পৃথ্বীতত্ত্ব ধ্যান করিবে। ললাট অথবা হৃদয়ের মধ্যে চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যের তেজ-স্বরূপ ঈশ্বরের চিন্তা করিবে।

এই মিশ্র-লয়-যোগ-নির্দ্দিষ্ট যে কোন একটীর অভ্যাস করিলেই সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়। এমন কি, ইহাতে কুষ্ঠাদি রোগ পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়া, দেহ বলি-পলিত-বর্জ্জিত হয়, এবং সাধক দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। ('পুরশ্চরণপ্রদীপে'--'পরিশিষ্ট' মধ্যে এইরূপ ব্যাধিনাশক ক্রিয়া দেখ।)

গুরুর উপদেশ ক্রমে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে এই সকলের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থ দেখিয়া স্ব-ইচ্ছায় কোন কার্য্যই করা উচিত নহে।

আত্মদর্শন ও নাদানুভূতিঃ—

জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মলিঙ্গই পরমাত্মা। যে সাধক গুরূপদিষ্ট পূর্ব্ববর্ণিত কোন ক্রিয়া-সংযোগে হৃদয়-স্থানে আত্মজ্যোতিঃ ধ্যান করিতে সমর্থ হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

সুতরাং কায়মনে সেই জীবনমুক্তির উপায় 'আত্মদর্শন' করিতে করিতে সাধকমাত্রেরই যত্ন করা বিধেয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"আত্মদর্শনমাত্রেণ জীবন্মুক্তের্নসংশয়।
তস্মাৎসর্ব্ব প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং স্বাত্মদর্শনম্॥"

এই আত্মদর্শন করিবার বিবিধ উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত যোগানুষ্ঠানও এই আত্মদর্শনের উপায়স্বরূপ। নিত্য প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্নে ও মহানিশায় গুরূপদিষ্ট বিধানানুসারে কুম্ভকযোগে নাভি বা অগ্নিস্থানে অথবা মধ্যশক্তি বা ষষ্ঠাধারে বায়ু ধারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যে 'আত্মশক্তি-কুণ্ডলিনী', যথাস্থানে উপনীত হইয়া সমুজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় আত্মালোকের প্রকাশ করিবে, ও সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নাদানুভূতি হইতে থাকিবে।

"নাভ্যাধারো ভবেৎষষ্ঠস্তত্র প্রাণংসমাভ্যসেৎ।
স্বয়মুৎপদ্যতে নাদোনাদতো মুক্তিদস্ততঃ॥"

প্রাণবায়ু সন্তাড়িত নাভিস্থিত অগ্নিদ্বারা উদ্দীপিত হইয়া কুণ্ডলিনী, হৃদয়মধ্যে অনাহত-পদ্মে, পরে যোগহৃদয় আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত হইলে, সাধক অন্তরাত্মাকে ধ্যান করিবে। তাহা হইলেই সাধক ললাটমধ্যে সেই জ্ঞানময়ী শক্তিরূপা প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার সমুজ্জ্বল প্রভা দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। এই সময় চিত্ত আজ্ঞাচক্রে একেবারে লীন হইয়া যাইলে, জিহ্বামূলে অমৃতাস্বাদ হইতে থাকে। এবং তখন অপার্থিব ও অলৌকিক বিষয়ের অনুভূতি হইতে থাকে।

এ সমস্ত ক্রিয়াই যে যোগাঙ্গীভূত, তাহা আর পুনঃ পুনঃ বলিবার নাই। সিদ্ধ গুরুর মুখে তাহার উপদেশ লাভ করিয়া

দৃঢ়-বিশ্বাস ও ভক্তি-সহকারে কার্য্য করিলেই সম্পন্ন হইবে।

'নাদ'সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা সাধকের পূর্ব্বাহ্নে জানিয়া রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে সময়ে সহজেই তাহার পরিচয় হইতে পারিবে। 'নাদ' প্রকৃত পক্ষে চতুর্ব্বিধ যথা—'পরা', 'পশ্যন্তী', 'মধ্যমা' ও 'বৈখরী'। ১। সহস্রার মধ্যে মূল বা অব্যক্ত আদিনাদকে—'পরানাদ' বলা হয়। তাহা রাজ-যোগের সাধনাফলে যোগীর অন্তিম সাধনদশায় অনুভাব্য, সুতরাং তাহা রাজ-যোগেরই অন্তর্গত সাধনাঙ্গ। ২। 'পশ্যন্তিনাদ'—আজ্ঞাচক্রের মধ্যে যোগিবরবৃন্দই তাহা অনুভব করেন বা সেই নাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। ৩। 'মধ্যমানাদ'—'অনাহতেই' যোগিগণের সদা অনুভাব্য। এ স্থলে উপস্থিত তাহাই উল্লেখ করিব। ৪। 'বৈখরীনাদ'—তাহা মূলাধার হইতেই সতত প্রকাশিত হয়। ('পুরশ্চরণপ্রদীপে'—ইহার বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক বর্ণনা দেখ।) এ স্থলে 'নাদ' অর্থাৎ সাধারণতঃ 'অনাহতনাদ' ইহা কোন বস্তুর পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত জাত শব্দ নহে! ইহা সাধকের ক্রিয়া ও অবস্থা অনুসারে যথাক্রমে 'মূলাধার' হইতে 'নাভি' 'অনাহত' অথবা 'আজ্ঞাচক্রে' অনুভূত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা দশবিধ। তবে সকলেই যে, দশপ্রকার নাদ একেবারে শ্রবণ করিবে, তাহা নহে; সাধনা ও অবস্থাভেদে এক এক সাধকের এক প্রকার বা দুই চারি প্রকার নাদ শ্রুত হইতে পারে।

১ম—'চেকিতান' বা ছোট পাখীর 'চুঁ চুঁ' শব্দের মত অথবা গভীর নিশায় 'ঝিঁ ঝিঁ পোকার' শব্দের অনুরূপ বলিয়া

মনে হয়। ২য়—পূর্ব্বোক্ত শব্দের মতই, তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। ৩য়—'টুং টাং' ছোট ঘণ্টার শব্দের ন্যায়। ৪র্থ—'ভোঁ ভোঁ' যেন 'শঙ্খের নিনাদ,' শুনিলে যেন মাথা ঘুরিয়া যায়, সামান্য ভয়ও হয়, 'বুঝি বা মাথার অসুখ হইল,' এরূপ মনে হয়। এ সময় 'মনশ্চক্রে' মধ্যে মধ্যে চিত্তকে রক্ষা করা প্রয়োজন। ৫ম—বহু দূরাগত বীণার 'ঝুন্ ঝুন্' ঝঙ্কারের ন্যায় অনুভূত হইতে থাকে, তাহাতে পূর্ব্বনাদহেতু শিরোঘূর্ণাদি বিদূরিত হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ—এই সময় সেই 'বীণার ঝঙ্কার' যেন খুবই নিকটে বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে, শরীর স্নিগ্ধ হয়। ৭ম—'পোঁ পোঁ' বাঁশীর স্বর। ৮ম—'গম্ গম্' মৃদঙ্গ-শব্দ। ৯ম—'ভর্ ভর্' শব্দ এবং ১০ম—মেঘ গর্জ্জনের মত 'গুড়্ গুড়্' শব্দ। এই সকল নাদ অনুভব সময়ে সাধকের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। পরে চিত্ত ক্রমে তাহাতেই লীন হইয়া যাইবে। তখন আর সে শব্দ শ্রুত হইবে না, অপিচ চিত্ত স্থির হইয়া তখন ধ্যেয় ও ধ্যাতা যেন একীভূত হইয়া যাইবে। ইহা যে, লয়াদি যোগের ফল তাহা বলাই বাহুল্য।

যোগ-সমাহারই তন্ত্রের বৈচিত্র্যঃ—পূর্ব্বে বলিয়াছি, যোগ সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ—মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ। এই চতুর্ব্বিধ যোগই শ্রীসদাশিবমুখকমল বিনিঃসৃত ও সাধকের মুক্তিপ্রদ। অনেকেই যোগ-চতুষ্টয়কে অধম ও উত্তম ভেদে নানা ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয় সত্যাদি-যুগে সেরূপ স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে তাহার বুঝি তেমন আর আবশ্যক নাই! শ্রীশ্রীসদাশিব-

প্রোক্ত কলির প্রকট সিদ্ধশাস্ত্র সমুন্নত ও সম্পূর্ণ তন্ত্রের মধ্যে সেই চারিপ্রকার যোগই সিদ্ধগুরু পরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া এমন সহজ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে, তাহা সামান্য ধীর ভাবে লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।

এই যোগ-সমন্বয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, ইহাদের মূলীভূত পার্থক্য যে কি, অতি সংক্ষেপে তাহাও বলা কর্ত্তব্য। উহাদের অধিকার সম্বন্ধে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাঠকের নিশ্চয়ই তাহা স্মরণ আছে, এই অংশ পাঠ করিবার পূর্ব্বে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

মন্ত্রযোগ—ইহা কেবল 'নাম' ও 'রূপের' অবলম্বনে অর্থাৎ 'মূর্ত্তি' এবং তদন্তর্গত বা তৎপ্রতিপাদক 'মন্ত্র' কিম্বা যন্ত্রের ধ্যানাত্মক শব্দ সহযোগে চিত্তস্থির করিবার সাধনা মাত্র। শাস্ত্রে ইহা ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত বলিয়া বর্ণিত আছে। পূর্ব্ববর্ণিত ধ্যান-চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা স্থূলধ্যানের অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে ভক্তিযোগও বলা যায়। 'জ্ঞানপ্রদীপে' মন্ত্রযোগের ষোড়শাঙ্গ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

হঠযোগ—পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহের ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা চিত্তের বহির্মুখী বৃত্তি সকলের নিবৃত্তিপূর্ব্বক জ্যোতিঃ-দর্শনাদি পূর্ব্ববর্ণিত সাধনার উদ্দীপনা মাত্র। শাস্ত্রে ইহা আবার সপ্তঅঙ্গে বিভক্ত। ইহা জ্যোতির্ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত। ইহাকেই ক্রিয়াযোগও বলা যাইতে পারে। 'জ্ঞানপ্রদীপের' ১ম ভাগের মধ্যে বিস্তৃত সপ্ত-অঙ্গের বর্ণনা পাঠ করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে।

লয়যোগ—নানাভাবে বিক্ষিপ্ত বৃত্তিসমূহের মধ্যে সতত ভ্রাম্যমান চঞ্চল চিত্তকে কুণ্ডলিনী-শক্তি-সহযোগে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কোন কোন বিন্দুতে বা নবচক্রে * লয় করিবার উপায় মাত্র। ইহা শাস্ত্রে নবঅঙ্গে বিভক্ত বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহা চক্র বা বিন্দুধ্যানের অন্তর্গত। ইহাকেও লয়-ক্রিয়াযোগ বলিতে হইবে। 'জ্ঞানপ্রদীপ' ১ম ভাগে সেই নব-অঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে।

রাজযোগ—যোগ-চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ইহা মনের পুনঃ পুনঃ বিচারদ্বারা চিত্তনিরোধের প্রণালীমাত্র। পূর্ব্বোক্ত যোগত্রয়ের পর সাধক এই রাজযোগের অধিকারী হইতে পারেন। ইহাকে 'জ্ঞানযোগও' বলা যায়। ইহা মন্ত্রযোগের ন্যায় ষোড়শ অঙ্গেই বিভক্ত বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। (জ্ঞানপ্রদীপ ১ম ভাগে রাজযোগের বিস্তৃত ষোড়শ অঙ্গের বর্ণনা দেখ)। ইহা যেন কোন বিন্দুর পরিধিস্বরূপ, আবার প্রতিলোম ভাবে তাহারই কেন্দ্রস্বরূপ—ব্রহ্ম-ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদ্বারাই সাধকের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উন্নত তান্ত্রিক-সাধনায় এই চতুর্ব্বিধ যোগই যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সিদ্ধ ও সাত্ত্বিক

* নবচক্রে কুণ্ডলিনী-পরিচালনা-সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা গুরুমুখেই বিশদ ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। শারীরিক-জ্ঞান বিশেষ তদন্তর্গত নাড়ী-তত্ত্বের সহিত ইহা এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে, কেবল মুখে বলিয়া দিলেই সকলে ইহা ঠিক ধারণা করিতে পারিবে না; ক্রমোন্নত সাধনামার্গে অগ্রসর হইলে, তাহা কেবল যোগরত সাধকেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সে সকল কথার আভাবমাত্র ষট্‌চক্র বর্ণন কালে উক্ত হইয়াছে, অধিকতর সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিষয় সে স্থলে আলোচিত হয় নাই। তাহা গুরুমুখেই জ্ঞাতব্য।

গুরু-পরম্পরার উপদেশক্রমে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে এই যোগ-চতুষ্টয়ের যেন সমাহার হইয়াছে। শিব-নির্দ্দিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্রের ইহাই বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তন্ত্রমার্গেরই কোন কোন সাধারণ অধিকারমাত্র পাইয়া, অনেকে আত্মসিদ্ধির ভ্রমে পড়িয়া, তন্ত্রনিন্দুক হইয়া গিয়াছেন।

সমগ্র যোগশাস্ত্রই যে, অনাদি বেদ-বিজ্ঞানের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ বা সাধনশাস্ত্র অথবা 'তন্ত্রমার্গের' বিমল উপদেশমাত্র, তাহা জানিয়া হউক বা না জানিয়াই হউক, অথবা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার অভি-লাষেই হউক, অনেকে জানিয়া শুনিয়াও এই সকল তত্ত্বোপদেশ শিষ্যের নিকট গোপন করিয়া চিরকালের জন্য শিষ্য পরম্পরায় তন্ত্রের উপর এক ঘৃণার ভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। অনেকেই 'যোগী' বলিয়া পরিচয় দেন, যোগের উপদেশ দিয়া শিষ্যের নিকট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন না যে, ইহা অনাদি কাল হইতে অতি গোপনে 'তন্ত্রমার্গ' বা শাম্ভবী-বিদ্যা বলিয়াই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। স্বয়ং স্বয়ম্ভূ শিব যাহার উপদেষ্টা সাক্ষাৎ যোগমায়া জগজ্জননী যাহার মূলীভূতা এবং ত্রিলোক-প্রতিপালক ভগবান বিষ্ণু যাহার অনুমোদন বা রক্ষাকর্ত্তা, সেই তন্ত্রই সমগ্র যোগ-শাস্ত্রের সমাহার-ক্ষেত্র; ইহা বিক্ষিপ্ত বা সাধারণ-শাস্ত্র-নিবদ্ধ বিষয় নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা 'শাম্ভবী-বিদ্যা', ইহা চিরদিন গুরুমুখ-পরম্পরায় গীত ও উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে। কেবল অনধিকারী অনভিজ্ঞ বা অল্পাভিজ্ঞ গুরুর হস্তে ইহার শিক্ষা-ভার পড়িয়া ক্রমে ইহা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্ররূপে পর্য্যবসিত

হইয়া গিয়াছে, উপাসক ও সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উপদেশ-ক্রমে সর্ব্বত্র এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। ফলতঃ এরূপ গণ্ডগোল ও বিতণ্ডার কোনই কারণ নাই। সিদ্ধ গুরুর কৃপায় তন্ত্রোপদেশ-মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ দীক্ষা ও শিক্ষা-প্রদান-প্রথা এখনও অতি গোপনে প্রচলিত আছে।

সেই শাক্ত ও পূর্ণাভিষেক, ক্রম, সাম্রাজ্য, মহাসাম্রাজ্য ও যোগদীক্ষাভিষেকের মধ্যে এবং জ্ঞানপ্রদীপে পরবর্ত্তী ক্রিয়া-ভিষেক প্রসঙ্গে যথাযথ ভাবে তাহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বিশ্বাস, ভক্তি ও যত্ন সহকারে তাহার অনুষ্ঠান করিলেই সাধকের অনায়াসে সমস্তই বোধগম্য হইবে।

অভিষেকান্তে বাহ্যপূজা-অর্চ্চনার সময় হইতেই যে সকল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, সে সমস্তই মন্ত্রযোগের অন্তর্গত : প্রয়োজনমত কোন কোন আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি যাহা শ্রীগুরুদেব সময় সময় উপদেশ দেন, সেগুলি হঠযোগের অন্তর্গত; বাহ্য-ভূতশুদ্ধি তথা অন্তর্ভূতশুদ্ধি, অরণি-সাধনা প্রভৃতি ক্রিয়া, লয়যোগের অন্তর্গত। এ সকল কথা ক্রিয়াবান সাধকমাত্রেই কার্য্যকালে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। অনন্তর যোগদীক্ষাভিষেকের পরিসমাপ্তি হইলে, 'জ্ঞানপ্রদীপোক্ত' পূর্ণ ও মহাপূর্ণদীক্ষাভিষেকের ব্যপদেশে উর বা রাজযোগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানানুভূতি হইয়া থাকে। সুতরাং তান্ত্রিক—সাধনায় মধ্যে মন্ত্র, হঠ, লয় বা রাজযোগের স্বতন্ত্রভাবে উপদেশ গ্রহণের আর প্রয়োজন হয় না। ফলতঃ সিদ্ধ-গুরূপদিষ্ট অষ্টাভিষেকের রীতিমত সাধনার দ্বারাই যে, যোগ-চতুষ্টয়ের

সমাহার এবং সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই পরমারাধ্য সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীর চরণপ্রান্তে অবনত-মস্তক হইয়া পুনরায় বলিতেছি—তন্ত্রোক্ত যোগমার্গের অপেক্ষাকৃত গুহ্য উপদেশসমূহ পূজ্যপাদ গুরু-মুখেই অধিগম্য, তাহা আর ভাষায় এখন প্রকাশ করা অসম্ভব, বিশেষ ক্রিয়া-সাধনায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া-সম্বন্ধে কয়টা কথাই বা মুখে বলা যায়? যাহা কেবলমাত্র সাধনা-যোগেই অনুভবনীয় তাহা বাক্যে প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তবে অভিজ্ঞ শ্রীগুরুর কৃপা হইলে, ভক্তিমান সাধকের পক্ষে কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। ইহাই যোগেশ্বর শ্রীশ্রীশঙ্করের অব্যর্থ আদেশ ও সিদ্ধ উপদেশ। ওঁ সদাশিব ওঁ॥

'শ্রীরাগ" অথবা 'ইমনকল্যাণে' গেয়।

"আর কি মা এ পাগল ছেলে
তোর মহামায়ার মায়ায় ভোলে।
তোর আদি অন্ত সব জেনেছি,
সে শুধু তোরই কল্পনা-বলে।
তুমি আদিতে অনন্ত একটী,
পরেতে তেত্রিশ কোটী,
যে যেমন তারে সে'টী,
দেখায়ে তারে ভারিলে॥
'কালী' 'তারা' 'ত্রিপুরাতে'
সাধকে তন্ময় করে,
'অর্দ্ধ-নারীশ্বর' 'যোগে',
সার 'ব্রহ্মবিন্দু' তাও দেখালে।

পাগল, গুরুর চরণ করে স্মরণ,
জোর করে ভাই তোরে বলে—
এখন সদানন্দ-সঙ্গে মিলে,
সচ্চিদানন্দে নাও মা কোলে ॥"

ওঁ হংসঃষট্শ্রীমদ্ গুরু ব্রহ্মানন্দদেব ও পরম-গুরু বশিষ্ঠানন্দ-দেবের আদেশক্রমে "গুরুপ্রদীপ" নামক সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্যের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইল। ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥